পাঁচশো
বছরের
হাওড়া

পাঁচশো বছরের হাওড়া

হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ পরিবেশক ॥
ওরিয়েণ্ট বুক এম্পোরিয়াম
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

PANCHSO BACHHARER HOWRAH / HEMENDRA BANDYOPADHYAY
First Edition : February, 1992

প্রকাশ করেছেন :
ভাস্বতীর পক্ষে
কে. ব্যানার্জী
১৪/১, পেসকার লেন
সালকিয়া, হাওড়া-৬

প্রচ্ছদ : কানাই পাল

মুদ্রাকর :
পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য
লক্ষ্মী প্রেস
৯/২ বি, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৬

হাওড় জেলার ইতিহাস রচনার কাজে যাঁরা
ইতিপূর্বে অগ্রণী হয়েছিলেন সেইসব
পূর্বসূরীদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হল।

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হাওড়া জেলার ইতিহাস বিষয়ক এই গ্রন্থের ভূমিকার প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বে 'শালিখার ইতিবৃত্ত' এবং হাওড়া সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তিনি দক্ষ ঐতিহাসিক রূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্যই এই ভূমিকাটুকু যোগ করতে চাই। হাওড়া জেলা ও শহরের প্রামাণিক ও বিস্তারিত ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি, সে ত্রুটি আমাদেরই। এই শহরে বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের বাস, কিন্তু হাওড়ার ইতিহাস রচনার দিকে কেন যে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি, বিস্ময়ের বিষয়। সম্প্রতি এ-বিষয়ে কেউ কেউ সচেতন হয়েছেন এটি আশার কথা। কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করি।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' পুস্তিকার পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন, "সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীণ্‌লণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে বৈষ্ণবচরিত ও গীত-গোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।" সত্যই ইংরেজ আমলের পূর্বে বাংলা-দেশের কোনো ইতিহাস বাংলা ভাষায় লেখা হয় নি। মুসলমান সুলতান-সুবা-দারের বেতনভুক 'ওয়ারিয়ানবিশ' গণ ফারসি ভাষায় বাংলাদেশের ইতিহাস লিখেছেন বটে, তবে তাতে প্রতি ছত্রে বিজয়ী জাতির ঔদ্ধত্য ফুটে উঠেছে, তাঁরা হতভাগ্য এ দেশবাসীর ভালে ভীরুতার কলংক তিলক এঁকে দিতে কুণ্ঠিত হন নি। সে যাইহোক, মিনহাজ উদ্দীন, গোলাম হোসেন তাঁদের রচনায় বাংলাদেশের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার বাইরেও বাংলার ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের কথা কে লিখবে? বঙ্কিমচন্দ্রই তার উত্তর দিয়েছেন, "তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে, একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে" (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ)। বাংলার প্রকৃত ইতিহাস লেখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই মনে মনে সংকল্প করতেন। বিদ্যাসাগরও এদেশের ইতিহাস রচনার জন্য অনেক উপাদান সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে সেকাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি।

ইতিহাস জাতির জীবনচর্যার প্রধান উপকরণ। মুসলমান যুগে বাংলার যথার্থ ইতিহাস লেখা হয় নি। পরবর্তীকালে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত বিপুল

আয়তনের ভারত-সম্পর্কিত ইতিহাস লিখেছেন তার পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ এবং উপনিবেশ শিকারীর প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য লোভ। মিথ্যাচার তার অঙ্গের ভূষণ। মিল, স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান—কেউ-ই এ দোষ থেকে মুক্ত নন। কৌতুকরসের লেখক মার্ক্ টোয়েন একবার পরিহাস করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ইতিহাসের সংজ্ঞা হচ্ছে 'lies, damn lies, statistics'—এ ব্যঙ্গ ভারতের ইতিহাস-লেখক ইংরেজ ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে কিছুটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই জন্যই Cambridge History of India-কে নতুন ভাবে সাজাতে হচ্ছে। বাংলাদেশকে নিয়ে ইতিহাস রচনা যথাযথভাবে শুরু হয়েছে এই শতকের গোড়ার দিক থেকে, অবশ্য স্কুলপাঠ্য ইতিহাস-পুস্তিকা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ছাত্রসমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তার অধিকাংশ উপাদান 'কুম্ভীলক' বৃত্তির সাহায্যে ইংরেজী বই থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। হাওড়া জেলার ইতিহাস সংকলনের কাজে অনেক পরে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে (১৯০৯) যখন সরকারী প্রবর্তনায় জেলা গেজেটিয়ার লেখা হচ্ছিল, তখন তার মধ্যে হাওড়া জেলার কথাও ছিল—অবশ্য একটু সংক্ষেপ ও সংকুচিতভাবে। কারণ তখনও হাওড়ার জেলাগত কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। অতি প্রাচীনকালে হয়তো তাম্রলিপ্তর (দামলিপ্তি, আধুনিক তমলুক) সঙ্গে হাওড়া জেলার কোনো অংশের কিছু সম্পর্ক ছিল। দ্বাদশ শতকে রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী তাঁর 'পবনদূতে' সুপ্রসর গঙ্গাবিধৌত সুহ্মভূমির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন, তা হয়তো হাওড়ার অংশবিশেষের বর্ণনা। দক্ষিণের তাম্রপর্ণী নদী তীর থেকে যে মলয়পবন রাজকন্যা কুবলয়বতীর কাছ থেকে লক্ষ্মণসেনের কাছে বার্তা বহন করে আসছিল—অনেকটা কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শে সে 'দখিনা পবন' হয়তো হাওড়ার ভূভাগের উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছিল—কল্পনা করতে বাধা নেই।

বাংলার মানচিত্রে হাওড়ার অবস্থান খুবই ছোট, ক্ষুদ্রতম জেলা। মোট পরিমাপ ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ৫৬০ বর্গমাইল। কিন্তু এই হাওড়াই সমগ্র ভারতবর্ষকে ধারণ করে আছে। ভাগীরথী প্রবাহ ভারতের পণ্য বহন করে কলকাতার তটভূমিতে পৌঁছে দেয়, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড স্থলপথে যোগাযোগ রক্ষা করে, হাওড়া রেল স্টেশনের সঙ্গে সারা ভারতের মানুষের সংযোগ। হাওড়া শহরের কলকারখানায় কত অবাঙালির অন্নসংস্থান হয় তার হিসাব নিলে বিস্ময় জাগবে। হাওড়া হচ্ছে কলকাতার সিংহদুয়ার, কিন্তু দীর্ঘ দিন এই শহর ও জেলা বিদেশী শাসক ও স্বদেশী নেতাদের কাছ থেকে শুধু অবহেলাই লাভ করেছে। বহুদিন হাওড়া জেলার কোনো পৃথক অস্তিত্বই ছিল না। কখনো বর্ধমান, কখনো হুগলী, কখনও চব্বিশ পরগণা, কখনো-বা কলকাতার সঙ্গে ছিল এর বিচার ব্যবস্থা, রাজস্ব ও শাসনবিভাগের গোত্র বন্ধন। পাশেই কলকাতার অবস্থানের জন্য হাওড়া স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। অবশ্য একালে

কেউ কেউ এ জেলার ও শহরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনশ বছরের প্রাচীন কলকাতার উৎসব অনুষ্ঠানের আলোকমালা এ শহরে পৌঁছায় না। মনে হচ্ছে, এ অঞ্চল যেন নব-খনিত কোনো মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ। কে বলতে পারে, এই 'হাবড়' ভূমির তলায় কোন্ গোপন স্তরে কর্ণসুবর্ণ, বেড়াচাঁপা, বল্লাল ঢিপির মতো কোনো সমৃদ্ধ জনপদ মুখ লুকিয়ে আছে। তবু আশার কথা, হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কোনো কোনো উৎসাহী গবেষক আলাপ আলোচনার দ্বারা হাওড়াকে অবহেলার কৃপাদৃষ্টি থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। প্রয়াত অচল ভট্টাচার্য দুখণ্ডে হাওড়ার ইতিহাস উপহার দিয়েছেন, আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেল। হাওড়া জেলা ও শহরের প্রামাণিক ইতিবৃত্ত রচনার জন্য ১৯৮৯ সালে 'হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি' গঠিত হয়েছে। হাওড়ার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, অধ্যাপক ও সাহিত্যিকেরা এই প্রকল্পে যোগ দিয়ে শহরের ইতিবৃত্তের মোটামুটি একটা খসড়া করে ফেলেছেন। এই শহরের ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী-জলাশয় খালবিলের জরিপ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, পুরাতন ইতিহাসকেও মূলস্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই সম্পর্কে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ—'শালিখার ইতিবৃত্তের'র রচনাকার হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাওড়া জেলার ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ। বহুদিন ধরে আমরা এই ধরনের একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন বোধ করছিলাম। হেমেন্দ্রবাবু আমাদের আশা অনেকাংশে পূর্ণ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে তিনি শুধু শালিখার বৃত্তান্তই লেখেন নি, হাওড়া জেলা ও শহরের সম্পর্কে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে হাওড়া জেলার ইতিহাস লেখার ভূমিকা প্রস্তুত করেছেন। বৃত্তিতে তিনি শিক্ষক ও সাংবাদিক। সেই সমস্ত নিত্যকর্মের দায়দায়িত্ব মিটিয়ে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করেছেন। ভূরিপরিমাণ উপাদানকে যথাযথ ব্যবহার করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য কাজ। হাজার খানেক বছর আগে কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কল্হণ তাঁর 'রাজতরঙ্গিনী'-র প্রারম্ভে ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "অর্থকথনই" ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। 'অর্থকথন' অর্থাৎ ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই ইতিহাস। ঘটনার বিবরণ, রাজা রাজড়ার বংশ পরিচয়—এসব প্রকৃত ইতিহাস নয়, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র সব্যঙ্গে বলেছেন, সে ইতিহাস হচ্ছে, রাজ-মহারাজা, বাদশাহ-সুলতানদের "জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র।"

অতীতে হাওড়ার ইতিহাস রচনার কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু তার পিছনে গবেষণার অতন্দ্র পরিশ্রম ছিল না, ছিল না ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধান। ১৯০৯ সালে সরকারী প্রচেষ্টায় ও'ম্যালি এবং মনোমোহন চক্রবর্তীর (দু জনেই সরকারী কর্মচারী) উদ্যোগে 'Bengal District Gazetteers : 'Howrah' প্রকাশিত হলে হাওড়া জেলার প্রথম পরিচয় লিপিবদ্ধ হল। অবশ্য তারও পূর্বে

১৮৭২ সালে সি. এন. ব্যানার্জি প্রণীত 'An Account of Howrah, Past and Present' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থটি এখন লোকলোচনের বাইরে চলে গেছে বলে এ-সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষ কোনো সংবাদ জানেন না। ১৯৭২ সালে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তিনিও আই. এ. এস. পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) সম্পাদনায় ডক্টর ও'ম্যালি ও মনোমোহন চক্রবর্তীর প্রবর্তনায় প্রকাশিত 'Bengal District Gazetters : Howrah' গ্রন্থটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে পরিবেশনা হাওড়া জেলার সামগ্রিক পরিচয় বহন করছে। কিন্তু এটিতে যে সমস্ত পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তা ১৯৬১ সালের আদমশুমারির তালিকা থেকে সংগৃহীত। তারপর এই জেলা ও শহরের সীমা, রাজস্ব শাসন ও পৌর-নিগমের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে সেগুলি যথাযথভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের (তিনি হাওড়া জিলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন) 'হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাসে' হাওড়া জেলা সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্যের কিছু অভাব আছে। এ জেলার লোক-উৎসব ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা মূল্যবান গবেষণা করেছেন। বিনয় ঘোষের 'পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতি'-তে হাওড়া জেলার উল্লেখযোগ্য পরিচয় আছে। তবে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডক্টর অলোক মুখোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থ—'নগর হাওড়া'। এই গ্রন্থে ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বনে হাওড়ার নগর-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাওড়া যে প্রান্তশ্রায়ী অনুল্লেখ্য মফঃস্বল শহর নয়, পরন্তু এটি একটি পুরো মাপের আধুনিক শহর, তা ডক্টর মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন সচিব শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Jitendriya Banerjee) 'Howrah Civil Companion' (১৯৫৫ সালে প্রকাশিত, দু'খণ্ডে সমাপ্ত)। হাওড়া শহরের বিবর্তনের ইতিহাস এই গ্রন্থে তথ্যসহ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা হাওড়া জেলার আনুপূর্বিক ইতিহাসের অভাব ছিল। হেমেন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের এই গ্রন্থ সে অভাব অনেকটা পূরণ করবে।

সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায়, যিনি যে-জেলার অধিবাসী, তিনি যখন সেই জেলার ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হন, তখন প্রায়ই সেই জাতীয় উচ্ছ্বাসের বশীভূত হন যাকে ইংরেজিতে বলে chauvinism অর্থাৎ উৎকট স্বাদেশিকতা। এক সময়ে প্রবল বিতর্ক চলেছিল, চণ্ডীদাস কোথায় জন্মেছিলেন, বীরভূমের নানুর, না বাঁকুড়ার ছাতনায়, সেই দ্বন্দ্বে এই chauvinism-এর চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া গেছে। তাই নিজ অঞ্চল গৌরবে ভূষিত করার জন্য কিছু পক্ষপাতিত্ব আমাদের রচনায় ঘটে যায়। কোনো কোনো সময়ে আমরা নিজেরাই আমাদের পূর্ব ঐতিহ্য ভুলে থাকি। হাওড়াবাসীরা অনেক দিন কেন্দ্রশাসন ও প্রদেশশাসনের অবহেলার শিকার হয়েছেন, এতগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভালোয়মন্দয় মিশিয়ে পার

হয়ে গেল, কলকাতা সম্পর্কে ইন্দ্রপ্রস্থের বজ্রমুষ্টি কিছু শিথিল হল, তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গৌরীসেনের বহু অর্থ অপচয় করে, উনিশ শতকের ফসিল 'বাবু-কালচার'-কে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি চড়িয়ে কলকাতার রাজপথে শোভাযাত্রায় বার করা হল, বহু সভাসমিতি হল, কত পুস্তক-পুস্তিকায়, পত্র-পত্রিকায় রঙ্গমঞ্চে কলকাতা নাম্নী রঙ্গনটীর নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হল। আমরা অর্থাৎ হাওড়া-বাসীরা মহোৎসাহে তাতে যোগ দিলাম। কিন্তু আমরা কি আমাদের জেলার ইতিহাস ও বিবর্তন সম্বন্ধে একটুও সচেতন হয়েছি? হেমেন্দ্রবাবু হাওড়া জেলার ইতিহাস লিখে আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, হাওড়া শহর ও তার চারপাশের পল্লীগুলি (শালিখা, রামকৃষ্ণপুর, কাসুন্দিয়া, শিবপুর, ব্যাটরা, বেতড়) কলকাতার পূর্বেই নাগরিক গৌরবের পাদপীঠ স্পর্শ করতে পেরেছিল। হাওড়া জেলার ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী, গ্রামজনপদ, শিক্ষাসংস্কৃতি ও শিল্পকলা, কৃষিব্যবস্থা, কলকারখানা প্রভৃতি সম্পর্কে এ রকম নিশ্ছিদ্র গবেষণা কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। আমরা, যারা এই জেলা ও শহরকে ধাত্রীভূমি বলে মেনে নিয়েছি, তারা হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকুন্ঠ অভিনন্দন জানাতে সংকুচিত হব না। শুধু হাওড়া জেলার অধিবাসীরাই নয়, এ গ্রন্থ অন্য জেলার কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার কাছে সানন্দে গৃহীত হবে। কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপ-লক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান চলুক, তাতে আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু যে শহরের পুনর্গঠনের উপর কলকাতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে (কারণ ভূ-তাত্ত্বিক কারণে কলকাতার আয়তন বৃদ্ধির কোনো উপায় নেই), সেই হাওড়া জেলা ও শহরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে লেখক একটি গুরুতর দায়িত্ব পালন করলেন, এটি ভবিষ্যৎ আলোচনার দলিল হিসেবে গণ্য হবে তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

২৫.১.৯২

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি
হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি

ভূমিকা

আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আধুনিককালে সবদেশেই স্বীকৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক শহরগুলির একাধিক ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলি সম্বন্ধেও ভারতীয় এবং বিদেশী ঐতিহাসিকেরা গবেষণা করেছেন ও করছেন। নানা কারণে মহানগরী কলকাতা তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেকখানি হারিয়ে ফেললেও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে এই শহরের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা মহানগরীর তিনশত বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ঐতিহাসিকদের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আর কেবলমাত্র ঐতিহাসিকরা কেন, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরাও কলকাতা শহরের নানা দিক নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করছেন। তুলনামূলক ভাবে নদীর এপারের হাওড়া শহর সম্বন্ধে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য অনেক কম। স্বভাবতই হাওড়ার মানুষ এই 'উপেক্ষার জন্য কিছুটা ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত। ক্ষোভ বা অভিযোগ-অভিমান তীব্রতর হয়েছে তার এক প্রধান কারণ হল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘকাল ধরে হাওড়ার প্রতি মনোযোগ দেননি, বরং উপেক্ষা করেছেন।'

হাওড়াবাসীর ক্ষোভ ও বঞ্চনার অভিযোগ সোচ্চার হয়ে উঠেছে কলকাতার তিনশো'কে কেন্দ্র করে যে উদ্যোগ-উৎসব হয়েছে তার পরোক্ষ-প্রতিক্রিয়া রূপে যুক্তিতথ্য দিয়ে গবেষকরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হাওড়ার ইতিহাস আরো প্রাচীন। কম করে হলেও হাওড়ার পাঁচশো বছর বয়স হয়ে গেছে। কলকাতা মহানগরীর মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-সচেতন হাওড়ার মানুষের মনে হয়েছে যে উভয় শহরের স্বার্থেই হাওড়ার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। হাওড়াকে উপেক্ষা করে, বঞ্চিত রেখে কলকাতার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তারই সঙ্গে হাওড়ার বিদ্বজ্জন মহলে অনুভূত হয়েছে যে হাওড়ার সুপ্রাচীন ইতিহাস ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির কথা তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন। এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে মূলত এই শহর ও জেলার প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের। যাঁরা এই কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান গ্রন্থটি ঐ উদ্যমের সুফল।

ইতিপূর্বেই শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শালিখার ইতিবৃত্ত' পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গত একদশকের মধ্যে হাওড়া সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল প্রয়াত অচল ভট্টাচার্যের একাধিক গ্রন্থ ও পুস্তিকা। শ্রীঅলোক মুখোপাধ্যায়ের 'নগর হাওড়া' ও অধ্যাপক অসিত-

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।' হাওড়া শহর ও জেলার ইতিহাস রচনার প্রয়াস কিন্তু সাম্প্রতিক নয় যদিও ইতিহাস-চেতনা গত কয়েক বছরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। যে সব গ্রন্থগুলি হাওড়ার ইতিহাস জানার জন্য অপরিহার্য তার মধ্যে রয়েছে Bengal Gazetteers (Howrah) 1909, Howrah District Gazetteer, Howrah Civic Companion, J. Bonnerjee, C. N. Banerjee' on Howrah Past and Present, বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের Municipal Administration in Bengal, Part I (Howrah), শতবর্ষের আলোকে হাওড়া জেলা পরিষদ, দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ সাঁতরার 'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি' ও আরও অনেক গ্রন্থ ও পুরানো প্রতিষ্ঠানের স্মারক গ্রন্থ। শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের তথ্য এইসব গ্রন্থ থেকেই শুধুমাত্র সংগ্রহ করেন নি, তিনি ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেছেন। সাহিত্যগ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, চিঠিপত্র, স্মৃতি কথা, সরকারি-কাগজপত্রও দেখেছেন। তথ্য সংগ্রহ করা শ্রমসাধ্য, সংগৃহীত তথ্য যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ ভাবে পরিবেশন করা শ্রম ও বুদ্ধির সার্থক সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে, সেই পরীক্ষায় শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সফল হয়েছেন।

শ্রী হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া শহরের ইতিহাসের ও জনজীবনের এক সার্বিক পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। কবিগান ও যাত্রা, শিক্ষা, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্মজীবন, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক জীবনের উদ্যোগ ও বিকাশ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি তথ্য দিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। অল্প পরিসরে এতগুলি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করলে, ইতিহাসের রূপরেখা দিলে কিছু অসম্পূর্ণতা, কিছু ভ্রান্তি অনিবার্য। বর্তমান গ্রন্থেও পাঠকরা সেইরকম কিছু কিছু হয়তো খুঁজে পাবেন। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে এইরকম একটি কঠিন কাজ এককভাবে করার জন্য তাঁরা শ্রীবন্দ্যোপাধায়কে সাধুবাদ জানাবেন, তাঁর গ্রন্থকে স্বাগত জানাবেন এই প্রত্যাশা অন্যায় নয়।

পরিশেষে একটি বিষয়ে বোধহয় সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চা ও গবেষণা একান্তভাবেই কাম্য। কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস যেন আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় না দেয় সেই বিষয়ে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। হাওড়া শহর কলকাতা মহানগরীর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সম্পূরক। কলকাতা মহানগরীর উন্নতি হাওড়ার স্বার্থের অনুকূল। তেমনি হাওড়া শহরের উন্নতি কলকাতার স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন। হাওড়ার ইতিহাস চর্চা কলকাতা মহানগরীর ইতিহাস চর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র মাত্র। যেমন, কলকাতা-হাওড়ার ইতিহাস সমগ্র বাংলার ইতিহাসের অংশ। ভারতের প্রতিটি ঐতিহাসিক শহরের ইতিহাস, বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস ও

তার বৈচিত্র্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায় ছাড়া অন্য কিছু নয়।

অন্য একটি বিষয় সম্পর্কেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যে কোনো স্বার্থে বা উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাসের বিকৃতি বা ভাবপ্রবণতার প্রকাশ কাম্য নয়। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করে পারছি না। ১৭১৪ সালে মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা সহ আটত্রিশটি গ্রামের সনদ পেয়েছিলেন। এই গ্রামগুলির মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলের পাঁচটি গ্রামও ছিল—শালিখা, হারিয়ারা, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর ও বাট্টার (বেতোড়)। হাওড়ার এই গ্রামগুলির জমিদাররা সম্রাটের ঐ ফরমান মেনে নিয়ে ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে সহজে সহযোগিতা করতে চান নি। ফরমান কার্যকরী করতে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। হাওড়ার কিছু বিদ্বজ্জন এই ঘটনায় হাওড়ার মানুষের মধ্যে 'জাতীয়তাবোধের' ইংগিত লক্ষ্য করেছেন ও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ঐ কারণেই কলকাতার উন্নয়ন হলেও বিদেশী শাসকরা হাওড়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করেছিলেন। শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঐ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক বিশ্বের কোথাও 'জাতীয়তাবোধ' বলতে বর্তমানে যা বোঝায় তার উন্মেষ হয়নি। সুতরাং ঐ যুগে হাওড়ার পাঁচটি গ্রামের জমিদারদের আচরণে নিজের স্বার্থরক্ষার প্রয়াসের দৃঢ়তা লক্ষ্য করলেও তার মধ্যেই হাওড়ার প্রতি অবহেলার কারণ সন্ধান করা বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবেনা।

শ্রীহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের '৫০০ বছরের হাওড়া' গ্রন্থটি হাওড়ার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনাক্ষেত্রে এক উল্লেখজনক সংযোজন।

নিমাইসাধন বসু

লেখকের কথা

১৯৮২ সালে 'শালিখার ইতিবৃত্ত' নামে একটি আঞ্চলিক ইতিহাসের বই প্রকাশ করি। তারপর থেকে মনে প্রবল ইচ্ছা ছিল যে যদি সম্ভব হয় পুরো জিলারও একটি বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হব। কিন্তু একার পক্ষে একটি পুরো জেলার ইতিহাস রচনা করা আমার মত এক সাধারণ লেখাপড়া-জানা লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কয়েকজনের পরামর্শে ও উৎসাহে যৌথ প্রচেষ্টায় কাজটি সহজ ও দ্রুত হবে ভেবে 'হাওড়া জেলা ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠনের চিন্তা মাথায় আসে। মাত্র জনা আটেক উৎসাহী মানুষ মিলে... শালিখা বিষ্ণুপদ পাঠাগার গৃহে কর্তৃপক্ষের সহৃদয়তায় প্রথম সভা করি। পরবর্তী সময়ে আরও অন্যান্য অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে ঐ ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য সভা করা হয়। পরিশেষে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে লেখককে মনোনীত করে একটি বড় কমিটিও করা হয়। সেই কমিটির উদ্যোগেই হাওড়ার বিদগ্ধ নাগরিকদের উপস্থিতিতে ১৯শে আগষ্ট ১৯৮৯ সাল, হাওড়া টাউন হলে হাওড়া শহরের পাঁচশ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হয়। সকলের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে মনে হয়েছিল যে সত্যি বুঝি এবার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে চলেছে। কিন্তু পরবর্তী কালের কার্যধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ায় সে কাজ আর যৌথভাবে হবার পথে যেন বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো। তখন আমার 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র কথা মনে পড়ল। উৎসাহী ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে দীঘাপতির সদাশয় জমিদার ঐ সমিতির কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দান করেছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ ও রাধাগোবিন্দ বসাকের ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিকরাও সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু আসলে বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন গৌরবের বিলুপ্ত তথ্যাদি উদ্ধার করার কাজ অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাই সখেদে বলেছিলেন —'দল বেঁধে রাজনীতি করা যায়, ইতিহাস চর্চা হয় না।' সেই কথা স্মরণ করেই জেলার ইতিহাস রচনার কাজে একাই অগ্রসর হই। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ব্যক্তি ও পাঠাগারে গিয়ে যথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করি। জেলার প্রাচীন ইতিহাসের কিছু বইপত্র থাকলেও গত একশ থেকে দেড়শ বছরের 'সার্বিক ইতিহাসের ফিরিস্তি কোথায়ও তেমন পাওয়া যায় না। তাই এই কাজে কয়েকটি আঞ্চলিক ইতিহাসের পুস্তিকা, স্মরণী ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত সংবাদাদি থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে সময় লাগে। সংগৃহীত তথ্যের যাথার্থ্য যাচাই করতেও অধিক সতর্কতা অবলম্বনে প্রচুর সময় দিতে হয়েছে। দীর্ঘ চার বছর ধরে যতদূর

পেরেছি তথ্য সংগ্রহ ও ঝাড়াই বাছাই করে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টাও যে অসম্পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাস হচ্ছে একটি চলমান বিষয়। যতই অনুসন্ধান করা যাবে ততই নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে। তথাপি কাজটি যদি শুরুই না হয় তবে তার ভালমন্দ নির্ণয় হবে কি করে! তাই এই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। এ ব্যাপারে আমি কয়েকজনের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে সহকর্মী হিসাবে শিক্ষক প্রমথনাথ সেনগুপ্তের কথাই বলি। প্রমথবাবুর কাছে আমি যখন যে বই, মাসিক পত্রিকা চেয়েছি তিনি বিনা দ্বিধায় ও বাক্যব্যয়ে সেই সব বই সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে লজ্জা দেব না, তবে আনন্দের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নানা ব্যাপারে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। আমার লিখিত পাণ্ডুলিপি-গুলি পরিমার্জিত করে আমাকে সহায়তা করেছেন বন্ধুবর অশোক দাস (দেশ) ও সহকর্মী অশোক মৈত্র। এই বই হয়তো কোনদিনই প্রকাশ হত না যদি আমার সহকর্মী শিক্ষক ও প্রকাশক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় না এগিয়ে আসতেন। দেড়মাসের মধ্যে এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ :বিষয়ের বই সুন্দর করে ছাপানো একেবারেই অসম্ভব; তিনি তাকে সম্ভব করে যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন তা অভাবনীয়। পরিশেষে আমার বিনম্র প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাই ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ নিমাইসাধন বসুর চরণে। তাঁদের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে আমার বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন এটা আমার যে কি পরম সৌভাগ্য—তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। প্রচ্ছদপট ও ফটো বিনা পারিশ্রমিকে করে দিয়ে কানাই পাল ও ডাঃ সীতাংশু মিত্র আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সকলই আমার পরম আপনার জন বলে মনে করি।

পরিশেষে হাওড়াবাসী যদি তাদের জেলার অতীত ইতিহাসের গৌরবময় কাহিনী জানতে পেরে কিঞ্চিৎমাত্র মর্যাদাবোধ করেন তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

২৮শে জানুয়ারী, — বিনীত
১৯৯২ সাল — লেখক

দু'চার কথা

কলকাতা ৩০০ বছর নিয়ে খুবই সোরগোল। কাগজে, রেডিও, টি. ভি.-তে প্রচারকার্য চলেছে জোর কদমে। এই উপলক্ষ্যে অনেকে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি এবং চিন্তাধারা অনুযায়ী অনেক প্রবন্ধ লিখে ফেললেন, যার অনেকগুলি ছাপা হল দৈনিক পত্রিকায়, অনেকগুলি আবার বই আকারে ছেপেও বেরোল। আর হবে না-ই বা কেন? কলকাতা যে মহানগরী!

এই সময় একদিন হেমেনবাবু আমাকে বললেন—'কলকাতা নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে—হোক, কিন্তু গঙ্গার আর এক পাড়ে হাওড়ার যে ৫০০ বছর হয়ে গেল সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না কেন? আমার কাছে অনেক নথিপত্র আছে যা প্রমাণ করবে হাওড়া কলকাতা থেকেও পুরোন শহর। আমি হাওড়া সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করে বই আকারে প্রকাশ করতে চাই। এবিষয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে।'

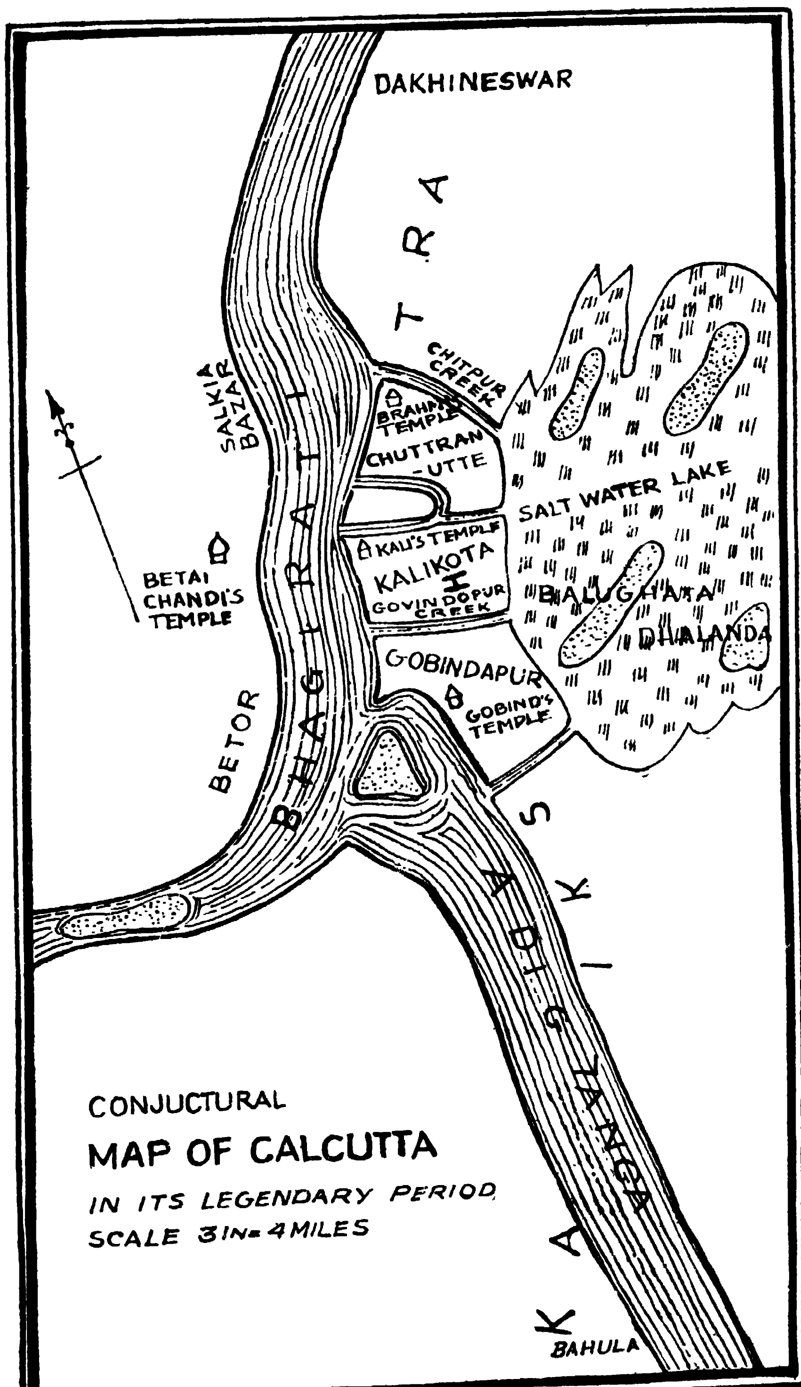
হেমেনবাবুর কথা প্রথমে বিশ্বাস করি নি। ভাবলাম, কি এমন তথ্য পাওয়া যাবে যাতে হাওড়ার ৫০০ বছরের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা যাবে? আবার এও ভাবলাম, লোকে বলে "কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়" তাই না হয়। সত্যিই তাই হল। ৫০০ বছরের পুরোন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে হাওড়া জেলার ইতিহাস রচিত হল। পাণ্ডুলিপি পড়ে মনে হল—এটা দ্রুত বই আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিৎ এবং সে ব্যাপারে হাওড়াবাসী হিসেবে বিশেষ করে একজন প্রকাশক হিসেবে আমারও দায়িত্ব রয়েছে।

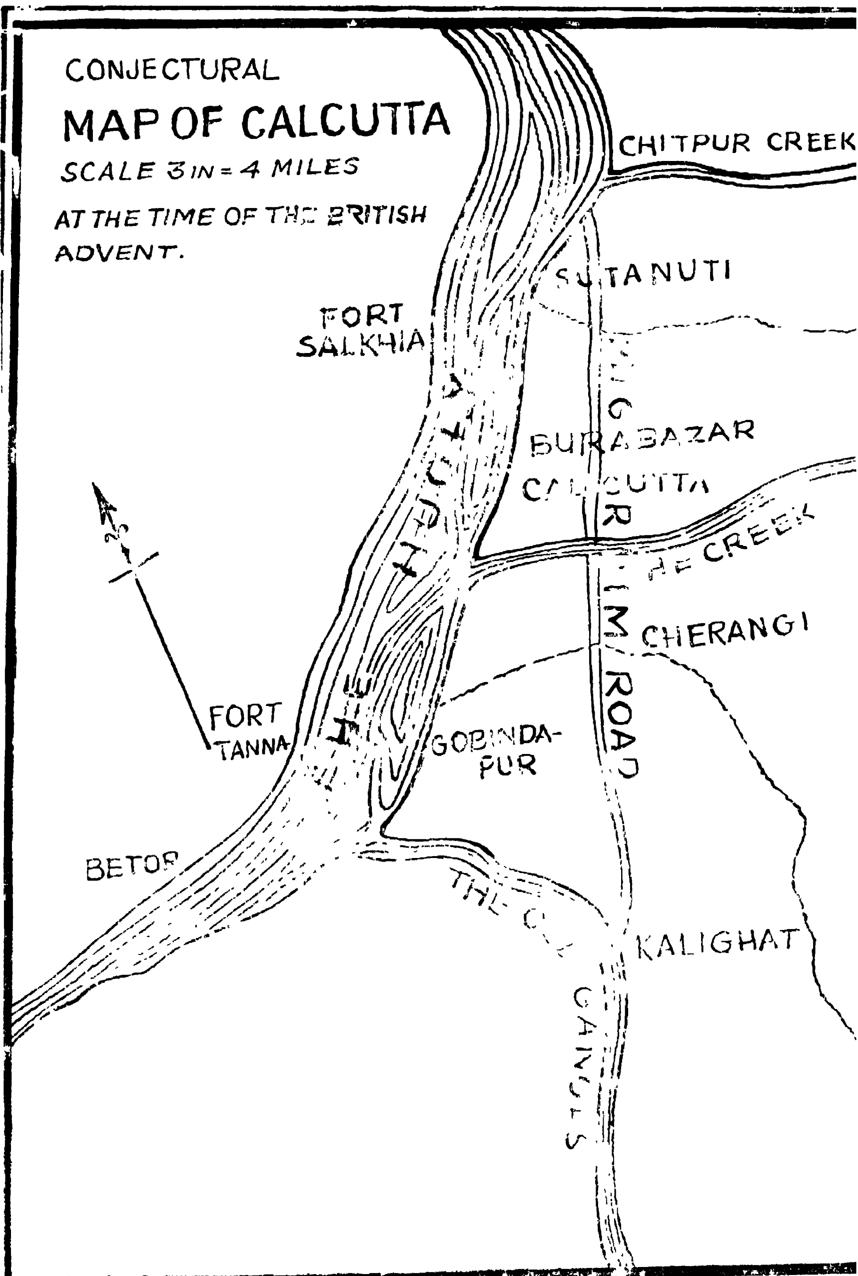
এই বই-এর নানা তথ্য প্রমাণের সাহায্যে লেখক যেমন হাওড়া শহরের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেছেন তেমনি উল্লেখ করেছেন বিপ্লবী আন্দোলনে, অসহযোগ আন্দোলনে, কৃষক আন্দোলনে, শিল্পে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, ক্রীড়া চর্চা, প্রভৃতি বিষয়ে হাওড়ার অবদানের কথা। কেবলমাত্র হাওড়বাসী নয় পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যেকেই এই বইটি পড়লে উপকৃত হবেন, কারণ একটা জেলার ইতিহাস তাদের জানা হয়ে যাবে। আমার মনে হয় বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস প্রকাশিত হলে তবেই পূর্ণাঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস রচনা সম্ভব।

এই পুস্তক রচনায় যাঁরা তথ্য দিয়ে, ছবি দিয়ে লেখককে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে প্রকাশক হিসেবে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আর আবেদন জানাই পাঠককে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানাবার জন্য। দ্রুত মুদ্রণের জন্যে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়েছে তার জন্যে দুঃখিত। পরবর্তী মুদ্রণ যাতে আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হয় তার জন্যে আমরা সচেষ্ট থাকব এবং এ ব্যাপারে আমরা পাঠকদের সহযোগিতা প্রত্যাশী।

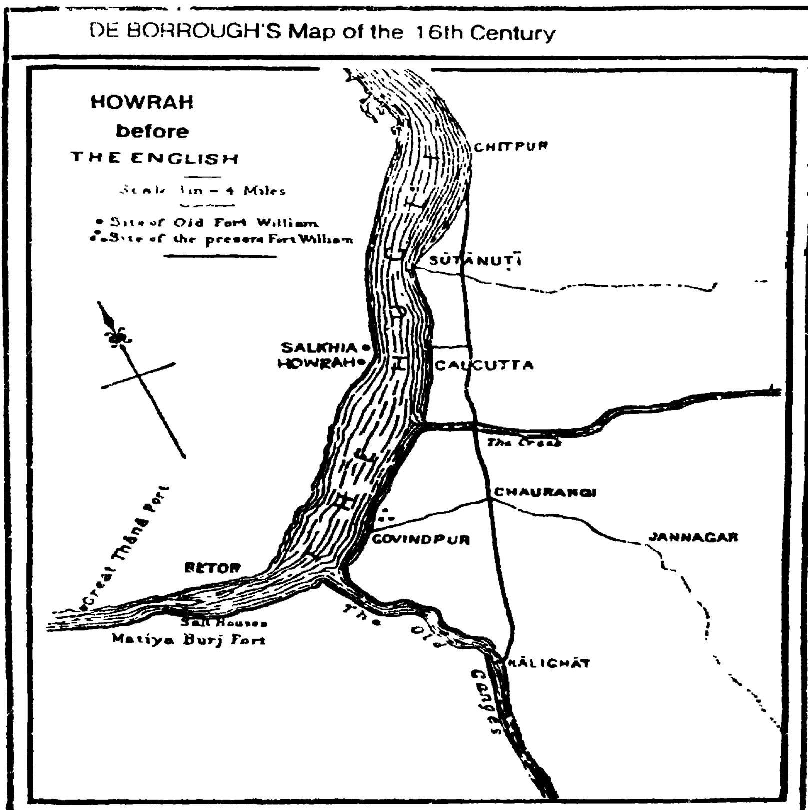
প্রকাশক

কোন পাতায় কি আছে


DAKHINESWAR
CHITPUR CREEK
SALKIA BAZAR
BRAHMA TEMPLE
CHUTTRAN -UTTE
SALT WATER LAKE
KALI'S TEMPLE
KALIKOTA
GOVINDOPUR CREEK
BETAI CHANDI'S TEMPLE
BALUGHATA
DHALANDA
GOBINDAPUR
GOBIND'S TEMPLE
BETOR
BHAGIRATI
ADIGANGA
BAHULA
CONJUCTURAL
MAP OF CALCUTTA
IN ITS LEGENDARY PERIOD
SCALE 3IN=4MILES



জোব চার্নকের সময়ে কলকাতা ও চারিদিকের স্থানসমূহ।



ষোড়শ শতাব্দীতে ডি. ব্যারোজের মানচিত্র।



হাওড়া জেলার মানচিত্র

Excerpt from
THE FRIEND OF INDIA
Serampore
10th August 1854

The Railway is to be opened at last. An advertisement in another column informs the public that the Railway will be opened to Hooghly on the 15th instant, and to Pundooah on the 1st September. Every day, except Sundays, a morning and evening train will leave Howrah at half past ten, and half past five, and will reach Serampore at eleven, and six o'clock. The down trains will leave Hooghly at 8-19 in the morning, and 3-38 in the evening, reaching Howrah at half past nine and five. The fares will be

UP.

Howrah to	1st Class.			Second.			Third.		
	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A	P.
Bally, ...	0	12	0	0	6	0	0	1	6
Serampore, ...	1	8	0	0	9	0	0	3	0
Chandernagore, ...	2	8	0	0	15	0	0	5	0
Hooghly, ...	3	0	0	1	2	0	0	7	0

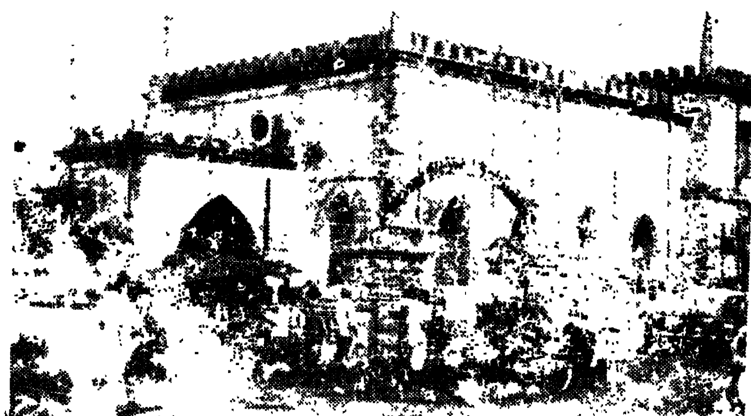
হাওড়া থেকে হুগলীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রেলের ভাড়া।



নির্বাক যুগের সিনেমায় 'শ্রীকান্তের' নায়ক কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ও সবাক-যুগের 'শ্রীকান্ত' ও রাজ লক্ষ্মী'তে নায়ক উত্তম কুমার (বামে)।



লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর ডোমে শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর আঁকা 'চন্দ্রগুপ্ত প্রাতে নারী প্রহরিণীদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন।'



হাওড়া জেলার প্রথম ব্যাপটিস্ট চার্চ (১৮২১)



চাঁদ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম উপাসনালয়



শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় মঠ—বেলুড়।

ফটো—ডাঃ শীতাংশু মিত্র

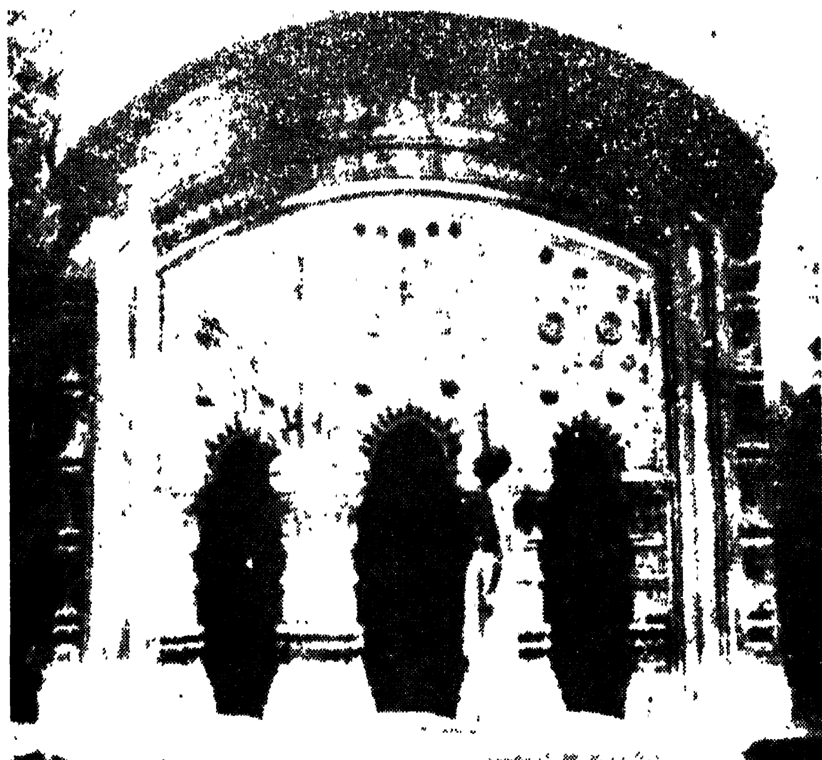




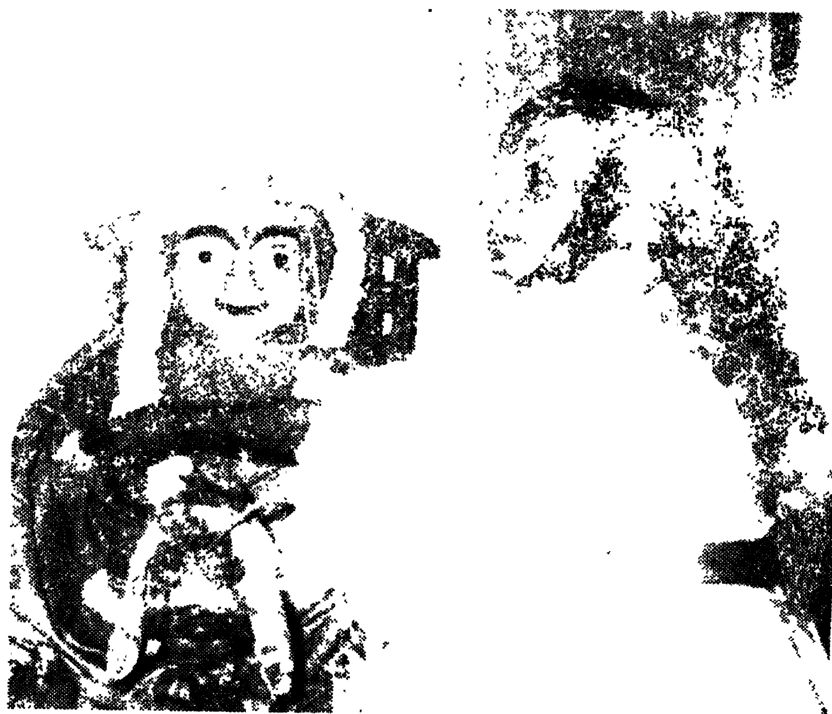
'বুড়ো সাহেব' পীরের মাজার—কল্যাণপুর   অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে



গড় চণ্ডী মন্দিরে রক্ষিত প্রাচীন পাথরের মনসা মূর্তি।—রসপুর অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে



গড়ভবানীপুরের মণিনাথ শিব মন্দির। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে



শালকিয়া কয়াল বাগানে কয়েলেশ্বরী মা শীতলার পাথরের মূর্তি। ফটো—অনুজ দাস



গালকিয়ার ধর্মতলায় ধর্মঠাকুরের পূজায় রত পূজারী। ফটো — অনুজ দ



খালনায় কৃষ্ণ রায় জিউর আট চালা মন্দির। তারাপদ সাঁতরার সৌজন্যে



পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দুই তীরে দুটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে। একটি মহানগরী কলকাতা—অপরটি হাওড়া শহর। এই দুয়ের মধ্যে সংযোজক অব্যয় হিসেবে কাজ করছে ঝুলন্ত হাওড়া ব্রীজ। এই হাওড়া ব্রীজ আজও অগণিত দর্শকের সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। কেউ কেউ আবার এই শহর দুটিকে বঙ্গমাতার যমজ সন্তান রূপেও আখ্যা দিতে আগ্রহী। শহর-কলকাতা পত্তনের ব্যাপারে ইংরেজ বণিকরা তাদের সুবিধামত তারিখ সাল ঠিক করে জোব চাণকের সুতানটিতে পদার্পণের দিনটিকেই (তৃতীয়বার) তার জন্মকাল বলে ঘোষণা করে দিল। সেই হিসেবটা ধরেই রাজ্য সরকার ১৯৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট থেকেই কলকাতা প্রতিষ্ঠার তিনশো বছর পূর্তি উৎসব পালনে লেগে গেলেন। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ঘোড়ায় টানা ট্রামে চড়ে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা সমিতি এমনকি একশ কোটি টাকার একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাও (যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ ৫০ কোটি) রচনা করলেন। প্রথমে না থাকলেও সংশোধিত পরিকল্পনায় হাওড়া শহরের উন্নয়নের ব্যাপারটাও (কুড়ি কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রশ্ন উঠেছে ঔপনিবেশিক শাসকের প্রয়োজনে গড়ে উঠা কলকাতা শহরের তিনশ বছর পূর্তি উৎসব পালনে রাজ্য সরকারের এত আড়ম্বর বা হৈ চৈ কেন ? অপর পক্ষে পাঁচশো বছরেরও অধিক প্রাচীন হাওড়া শহর সরকারী সমাদর লাভেই বা বঞ্চিত কেন ? কেউ কেউ আবার এ প্রশ্নও তুলেছেন এটা কি কলকাতার তিনশ বছরের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই 'হাওড়া—৫০০'—এই রব তোলা হয়েছে !

এটা ঠিক যে কলকাতার মত হাওড়া শহরের প্রতিষ্ঠকালের সাল তারিখের কোন ঠিকুজি কেউ তৈরি করে রাখেনি। তবে প্রাচীন শিলালেখ ও কাব্যাদি থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পেঁছতে কোনই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে হাওড়া শহরের বয়স পাঁচশো বছরের বেশি বই কম নয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে রাঢ় ভূমি একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। এই রাঢ় আবার দু'ভাগে বিভক্ত—যথা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। অজয় নদের উত্তরাংশে মগধ অবধি উত্তর রাঢ় এবং অজয় নদের দক্ষিণে সমুদ্রকূল পর্যন্ত দক্ষিণ রাঢ় নামে অভিহিত। স্বাভাবিকভাবে হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের দক্ষিণাংশ দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই দক্ষিণ রাঢ়ে একদা 'ভূরী শ্রেষ্ঠীক' নামে একটি অঞ্চল ছিল। আজ তার নাম হয়েছে ডিহি ভূরশুট। ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদের রাজত্বে ব্রাহ্মণ্য-

কৌলীন্য ও জ্ঞান-গরিমা খুবই তুঙ্গে উঠেছিল। তাঁদেরই গুণকীর্তন করে 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নামে এক নাটকও রচনা করেছিলেন কবি কৃষ্ণ মিশ্র। 'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি' নামক গ্রন্থের লেখক তারাপদ সাঁতরা লিখছেন—'খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের চান্দেলরাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র তাঁর বিখ্যাত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁদেরই আদলে অঙ্কিত করেছিলেন।' ঐ ভূরিশ্রেষ্ঠীক-ই আজকের ডিহি ভূরশুট—যা হাওড়া জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের শেষ সীমা। পাঠক জেনে হয়তো খুশি হবেন যে এই নাটকটি একদা হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল।[১]
তারও দু'শতাব্দী আগে এই ভূরিশ্রেষ্ঠীকের উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীধরাচার্যের 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থে। তাতে বেশ ভালভাবেই লেখক নিজ পরিচিতি দানে উল্লেখ করেন—

'আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়ং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠীজনাশ্রয়ঃ ॥[২]

তবে এই ভূরিশ্রেষ্ঠী অঞ্চলসহ হুগলীর মান্দারণ অঞ্চল খ্রীষ্টীয় বারো শতকে উড়িষ্যার প্রতাপশালী রাজা অনন্তবর্মন পালবংশের অন্যতম রাজা রাম পালের পুত্র কুমার পালের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেখানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। সেই মান্দারণই আজকের হুগলী গড়মান্দারণ নামে খ্যাত। প্রকৃতপক্ষে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল উড়িষ্যার রাজাদের অধীনে ছিল। তার সময়কাল হচ্ছে মুসলমান আগমনের আগে পর্যন্ত।

বাংলায় সেন রাজাদের রাজত্ব নানা কারণে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বিজয় সেন। দক্ষিণ ভারত থেকে এসে তাঁরা বাংলা দেশ বিজয় করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয় সেন হুগলীর মান্দারণের রাজকন্যা বিলাস দেবীকে বিবাহ করেন। বৈবাহিক সম্পর্কে মান্দারণের শূর রাজাদের কর্তৃত্ব হাওড়া জেলায়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বংশেরই শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা লক্ষ্মণ সেন। 'বর্ধমানভুক্তি' যে সেন রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূভাগ ছিল তার প্রমাণ মেলে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটি গ্রামে প্রাপ্ত বল্লাল সেনের তাম্রশাসন থেকে।[৩] ভুক্তির স্তর বিন্যাস হত 'বিষয়' 'মণ্ডল' 'খাটিক' 'চতুরক' এবং 'গ্রাম' পর্যায়ে। ২৪ পরগনার গোবিন্দপুর গ্রামে লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত এক তাম্রশাসনে দেখা যায় যে তিনি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত 'বেতড্ড চতুরকের' অধীন 'বিড্ডর শাসন' নামে একটি গ্রাম ব্যাসদেব শর্মা নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। ঐ গ্রামের সীমা চিহ্নিত করতে গিয়ে বলা হয়েছে—পূর্বে জাহ্নবী বা ভাগীরথী পর্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল। এই 'বেতড্ড চতুরক'ই বর্তমান হাওড়ার বেতোড় বা বেতাইতলা অঞ্চল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' পুস্তিকায়

ইতিহাসবিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিত প্রবন্ধ 'লক্ষ্মণ সেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ'—(সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৩৯) আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের শাসনাধীন অঞ্চল উত্তরে সরস্বতী থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারও পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩৪১ সালের সংখ্যায় কালিদাস দত্ত লিখেছেন—"গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দারা তিনি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরকের অধীন 'বিড্ডর শাসন' নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভূমির নিম্নলিখিতরূপে চতুঃসীমা দেওয়া আছে—উত্তর-ধর্মনগর সীমা, পূর্ব-জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা, দক্ষিণ—লেংঘদেব মণ্ডপী সীমা, পশ্চিম—ডালিম্ব ক্ষেত্র সীমা। এই চতুঃসীমা বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড—চতুরক নামক বিভাগ পূর্বদিকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড—চতুরক বর্তমান হাওড়া (শিবপুর) অন্তর্গত বেতোড় নামক স্থান এবং উহারই নামানুসারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।"
খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তুর্কি মুসলমান আক্রমণকারী ইখতিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ারুদ্দিন খলজি হঠাৎ বাংলাদেশ আক্রমণ করলে লক্ষ্মণ সেনকে রাঢ়ভূমি ফেলে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যেতে হয়। এরপর ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার হিন্দুরাজা মুকুন্দদেব হরিনন্দনকে পরাজিত করে সুলতান সুলেমান করনানী সমগ্র উড়িষ্যা অধিকার করেন। তাঁরই নামানুসারে হাওড়া জেলার এক বিরাট অংশকে করনানীর রাজস্ব আদায়ের এক্তিয়ারে আনা হয়। যার জন্য সেই বিস্তীর্ণ অংশকে সুলেমানের নামানুসারে সুলিয়ামানাবাদ বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

এবারে ইতিহাসের নজির বা সাক্ষ্য প্রমাণ সরিয়ে রেখে মধ্য যুগের কাব্যাদি কি বলে তা আলোচনা করা যাক। সমসাময়িক সাহিত্যেও হাওড়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম বার বার উল্লেখ হতে দেখা যায়—তার মধ্যে শালিখা, ঘুষুড়ী, বেতড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা বিজয়' কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'ডাহিনে কোতরবাহি কামারহাটি বামে।
পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষীড়ি পশ্চিমে॥
চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড় চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥

এখানে চিৎপুর ও কলকাতার সঙ্গে ঘুষুড়ি এবং বেতড়ের নাম পরিষ্কার ভাবে

উচ্চারিত হয়েছে। এর আরও পরে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে[৪] (মতান্তরে ১৫৭৭) কবি-কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও ভাগীরথীর পূব পাড়ের নামের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের গ্রামের নামও সমানভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন—

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুটিনাস।
দুই কূলে বসাইয়া বাট ॥
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট।
কিঙ্করে বসায় নানা হাট ॥
ত্বরায় বহিয়ে তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায় ॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥

এ ছাড়া 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর মতে নীলাচল যাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরের কাছে ভাগীরথী পার হয়ে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা ও কুলীনগ্রাম অতিক্রম করে দামোদর পার হবার আগে হাওড়া-হুগলীর সীমানায় অবস্থিত শিয়াখালায় উপস্থিত হন।[৫]

শুধু কাব্যে বা সাহিত্যেই নয়—বিদেশীদের প্রাচীন মানচিত্রেও বিশেষ করে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ডি. ব্যারোজের (De Barros) ও গ্যাসটালডি (Gastaldi) ১৫৬১ খ্রীঃ অঙ্কিত মানচিত্রেও শ্যামপুর থানার একটি স্থানকে যথাক্রমে পিছলতা (Pisolta) এবং পিছলদা (Picalda) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজিটিয়াসে'র (হাওড়া, ১৯০৯ খ্রীঃ) লেখক ও'ম্যালি ও মনোমোহন চক্রবর্তী লিখছেন—Pisolta has been identified with the modern village of Pichhaldaha, 2 miles north—north West of Fort Mornington Point in the extreme south of the Uluberia sub-division. তাঁরা আরও লিখেছেন—Here boats used to cross Rupnarayan. It is mentioned in the 17th century—biographies of Chaitanya.

কিংবদন্তী আছে মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার পথে এখানে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তারাপদ সাঁতরা আরও লিখেছেন—"কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র মধ্য লীলায় বলা হয়েছে যে তিনি পানিহাটি থেকে নদী পথে পিছলদায় আসেন। যদিও অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে গ্রামটি আসলে মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কাছাকাছি অবস্থিত। অবশ্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত—খ্রীষ্টের জন্মের চৌদ্দশত কি পনের শত বৎসর পরে যে সকল মনসার ও চণ্ডীর গান, গাওয়া যায় তাতে তমলুকের নাম নাই। সে সময়ে লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সমুদ্রে যাইত।"

কবি কঙ্কনের অব্যবহিত পরে আরও উদাহরণ পাওয়া যায় ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসের রচিত 'মনসা মঙ্গলে'।[৬] তাতেও বলা হয়েছে,

কালীঘাটে কালী বন্দ বেতোড়ে বেতাই।
সুরটে ঠাকুর বন্দো আমতায় মেলাই ॥

এই বেতোড়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 'শিবপুর কাহিনী'র লেখক অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—১৫৪০ (মতান্তরে ১৫৫৩) খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ দেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডি. ব্যারোজ (De Barros) বঙ্গের যে মানচিত্র অংকিত করেন এবং যে মানচিত্রের প্রতিলিপি এখনও কলিকাতার 'মেটকাফ হল' বা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে—সেই মানচিত্রেও সরস্বতী ও যমুনা ভাগীরথীর দুইটি বৃহৎ শাখারূপে বিরাজমানা দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই, গঙ্গা ও সরস্বতীর সংযোগস্থলে এবং গঙ্গার উপকূলেই বেতোড়ের নাম বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় ঐ মানচিত্রে বেতোড়ের সান্নিধ্যে গঙ্গার উভয় পারে কলিকাতা অথবা হাওড়ার অন্য কোন গ্রামের নাম পর্যন্ত নাই। ইহা হইতেই তদানীন্তন কালে বেতোড়ের প্রসিদ্ধি অনুমিত হইতে পারে।'

আসল কথা মোঘলদের সময় থেকেই বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের অবনতি হতে থাকে। কারণ সেই সময় থেকেই সরস্বতীর নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে বড় বড় বাণিজ্য পোত আর সপ্তগ্রামে যেতে পারত না। কাজেই জাহাজগুলি নঙ্গর করতো ভাগীরথীর অপর পার গার্ডেনরীচে। সেই সুবাদে বেতোড়ে পর্তুগীজরা বড় হাট গড়ে তুললো। এই সম্বন্ধে সি. আর. উইলসন সাহেবের মন্তব্যও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখছেন—In the 16th century, the Stream (Sarwassati) became shallower and less accessible to the seagoing vessels but when the Portuguese began to frequent the river about 1530, difference made itself felt. The foreigners sent their goods by boats to Satigaon. Meanwhile their ship lay at anchor in Garden Reach and an important market sprang up on the west side of the river at Betor, close to Shibpore.

প্রকৃতপক্ষেই পর্তুগীজরা বেতোড়ে হাট বসিয়ে ছোট ছোট নৌকো দিয়ে সপ্তগ্রামে পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচা করতো। মরশুম শেষ হলে ছাউনিগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিত। পরের বছর আবার এসে নূতন করে ছাউনি তৈরি করতো। এ সম্বন্ধে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৭৮) ভিনিসীয় পর্যটক সিজার ফেডরিক (Ceasre Fedirici) লিখেছেন—'The merchants gather together for the trade from Buttor. Buttor has an infinite number of ships and Bazars while the ships stay in the season, they erect a village of straw houses which they burn when the ships leave and built again in the next season.' (Cal. Review vol.VI. p. 402)

এরপর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার স্টুয়ার্ট রচিত মানচিত্রে এবং তারও পরে ১৭৭৯-৮০-তে রেনেলস্ ম্যাপ-এ (Rennel's Atlas) অবশ্য শালিখা, শিবপুর ও

বেতোড়েরও উল্লেখ আছে। ১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আপজোন'স ম্যাপ অব ক্যালকাটাতে (Upjhon's Map of Calcutta) রামকৃষ্ণপুর ঘাট, শালকিয়া ঘাট এমনকি হাওড়া ঘাটেরও উল্লেখ আছে।

কিন্তু এই পর্তুগীজরা নিজ দোষে মোঘলদের বিরাগ ভাজন হয়। ফলে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোঘল শাসকের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তাদের (পর্তুগীজদের) হুগলী ত্যাগ করতে হয়। শুধু হুগলী কেন—নদীবক্ষে দস্যুবৃত্তি করার অপরাধে বেতোড় বন্দর থেকেও তাদের বিতাড়িত করা হয়। পরে তারা আরাকানবাসীদের অর্থাৎ মগদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বালক বালিকাদের চুরি করে দাস হিসেবে বিক্রী করতে লাগল। এভাবে হাওড়াতে তারা দাস ব্যবসা বেশ ফলাও করে করতে লাগল। C. N. Banerjee তাঁর An Account of Howrah Past and Present গ্রন্থে লিখেছেন—**Slavery was in vogue in Howrah. Public advertisement appeared in those days giving a minute description of the boy and girl to be sold or bought.**

পর্তুগীজদের এই অত্যাচার বন্ধ করা এবং বঙ্গদেশে মোঘল শাসকদের আধিপত্য প্রতিরোধ করার জন্য বার-ভূঁইয়াদের চূড়ামণি যশোহর অধিপতি প্রতাপাদিত্য ভাগীরথীর দুই তীরে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন—তার মধ্যে থানা দুর্গটি অন্যতম*। এটি ছিল বেতোড়েরই সীমানায়। শুধু তাই নয়—এই দুর্গে রাজা প্রতাপাদিত্য রডা (Rudda) নামে জনৈক পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতিকে নিয়োগ করে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, মোঘল নৌবহর বার বার তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিল। পরে অবশ্য রাজা মানসিংহ প্রতাপকে পরাজিত করে থানা দুর্গ অধিকার করেন। এইভাবে ষোড়শ শতকের শেষদিকে যে থানা দুর্গ বেতোড়ে তৈরি হয়েছিল তার বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে—এবং নদীর অপর পারে তখন বাণিজ্য কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সেই ব্যবসা কলকাতার শেঠ ও বসাকদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ঐতিহাসিক উইলসন তাঁর **Early Annals of the English in Bengal** গ্রন্থে তাই লিখেছেন **—Its (Batore) trade had now passed to the other side of the river and was in the hands of the Setts and Bysacks. In the 17th century, Batore disappeared from history, its name changed into the village of great Tanna.** এই থানাই হচ্ছে আজকের থানা মাকুয়া গ্রাম।

এরপরই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁর মনোমালিন্য দেখা দিল। জোব চার্ণক ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী থেকে বিতাড়িত হলে মোঘল সৈন্যরা হিজলী পর্যন্ত তাঁকে তাড়া করে। পথিমধ্যে চার্ণক থানা দুর্গের ক্ষতি সাধনও করেন। হিজলী যুদ্ধের পর এক চুক্তিপত্রে ঠিক হয় যে ইংরেজরা জাহাজ মেরামতির জন্য উলুবেড়িয়া পর্যন্ত আসতে পারবে—তবে থানা দুর্গের কাছে যাওয়া চলবে না। চুক্তি অনুযায়ী ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন চার্ণক উলুবেড়িয়ায় এসে উপস্থিত

হলেন। আরও সুখের কথা যে জোব চার্ণক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল কাউন্সিলের কাছে সুপারিশ করেন যে উলুবেড়িয়াতেই ইংরেজদের ঘাঁটি করা হউক। যদিও কাউন্সিল তাঁর ঐ প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করে সুতানটিতেই তাঁবু গাড়তে আদেশ দেন। সেই আদেশ মতই ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট দুপুরবেলা জোব চার্ণক ভাগীরথীর পূব পাড় সুতানটিতে পদার্পণ করে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড স্থাপন করলেন যা কালে রাজদণ্ডে পরিণত হল। এই দিন থেকেই কলকাতার জন্মদিন ইংরেজরা স্থির করে দিল—যা পরবর্তীকালে ইতিহাসেও সন্নিবিষ্ট হল।

যদি জোব চার্ণকের সুপারিশ কার্যকর হত তাহলে রাজধানী কলকাতার জয়তিলক উলুবেড়িয়া তথা হাওড়ার কপালেই হয়তো শোভা পেত। তবে এ ব্যাপারে অন্যান্য অসুবিধাগুলিও নগণ্য নয়—জনশ্রুতি আছে উলুবেড়িয়ার স্থানীয় অধিবাসীরাই নাকি সুবাদারের কাছে অভিযোগ করল সেখানে ইংরেজ কুঠি তৈরি হলে স্নানার্থী মহিলাদের অসুবিধা হবে। আসলে গঙ্গার এ পাড়ে চড়া পড়তে শুরু করায় সব জাহাজই পশ্চিম পাড়ে না ভিড়ে পূব পাড়েতেই নঙ্গর করছিল।

ইতিমধ্যে বর্ধমান-লুণ্ঠনকারী শোভা সিং-এর ভাই হিম্মত সিং বেতোড় আক্রমণ করে থানা দুর্গ অধিকার করেন। এবার হুগলীর ফৌজদারকে ইংরেজদের সাহায্য ভিক্ষা করতে হল। "ইংরেজ 'টমাস' নামে এক যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইলে হিম্মত সিং থানা দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।"[৭] এই দুর্গটি মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতও আক্রমণ করেন। বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ একইভাবে ইংরেজের সাহায্যে তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। তাই **An Account of Howrah Past & Present** গ্রন্থে **C. N. Banerjee** লিখেছেন—**In 1750 A. D. the Marhattas took the Tanna Fort.**

এইভাবে এদেশীয় শাসকরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে ইংরেজ তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পদে পদে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে বিপদমুক্ত হতে লাগলেন। বিনিময়ে তারাও কিছু পেতে চাইল। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা সহ আটত্রিশটি গ্রামের সনদ লাভের প্রস্তাব দেন। এই গ্রামগুলির মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের পাঁচটি গ্রাম যথা শালিখা, হারিয়ারা, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর ও বাট্টারের (বেতোড়) নামেরও উল্লেখ আছে।

ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব তাঁর **The Early Annals of the English in Bengal** গ্রন্থে ৮১৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—**The list of towns ordered to be entered after the consultation of May 4th 1714, being a list of towns that the East India Company already possessed**

round Calcutta and of those they wished the Moghul to grant them in Phirmand.

সেই শহরগলির তালিকা নিচে দেওয়া হল।

Towns	Parganas	Rent Rs. A. P.	Total Rs. A. P.
Salican (শালিখা)	Boro Pican	61-11-0 216- 3-3	277-14-3
Harirah (হাওড়া)	Boro Pican	237- 5-4 145-13-5	383- 2-9
Casundah (কাসুন্দিয়া)	Boro Pican	119-14-4 0- 8-7	120- 6-11
Ramkrishnapur (রামকৃষ্ণপুর)	Boro Pican	89- 3-8 80-11-0	169-14-8
Battar (বেতোড়)	Boro Pican	351-13-0 229- 1-9	580-14-9

মুসলমান সুলতানদের আমল থেকেই সপ্তগ্রামের অধীনে বোরো ও পাইকান পরগনার অন্তর্গত হয়ে বেতোড় নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট আকবরের সময় আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে যে রাজস্বের হিসেব আছে তাতে সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বোরো-পাইকান পরগনায় অবস্থিত বেতোড়ের রাজস্বও দেখানো হয়েছে। এই তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ঐ সব শহরের মধ্যে বেতোড়ের রাজস্বই সবচেয়ে বেশি। সুতরাং বেতোড় যে ঐ গ্রামগুলির মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আলোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত প্রাচীন স্থানগুলি সবই বর্তমান হাওড়া শহরের সীমানায় অবস্থিত। এমতাবস্থায় দেশীয় কাব্যাদি (মঙ্গলকাব্য) বা বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে মানচিত্রগুলিই কি প্রমাণ করছে না বেতোড়ের ও শালিখার বয়স আটশ বছরের মত। আর হারিয়া, রামকৃষ্ণপুর এবং কাসুন্দিয়া অঞ্চলও বেতোড় বন্দরের ন্যায়ই পুরনো। এই 'হাবিয়া' গ্রামটিই যে পরবর্তীকালে আধুনিক 'হাওড়া' শহরে রূপান্তরিত হয়েছে তা পরের অধ্যায়ের আলোচনা হতেই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে। তাই বলি হাওড়া শহরের জন্মকাল ৫০০ বছর বলতে অসুবিধা ও লজ্জা কোথায়!

১. পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত—পৃষ্ঠা ১৯২।
২. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।
৩. হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি—তারাপদ সাঁতরা।
৪. কলিকাতার ইতিবৃত্ত—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত—পৃষ্ঠা ১১।
৫. হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি—তারাপদ সাঁতরা।
৬. হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন) মাসিক বসুমতী চৈত্র ১৩৪২।
* শালকিয়া দুর্গ নামেও একটি ছিল। দ্রঃ ম্যাপ অব ক্যালকাটা।
৭. হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যোতীরত্ন) মাসিক বসুমতী চৈত্র ১৩৪২।

হাওড়া নামের ইতিহাস

সাধারণভাবে জানা আছে যে প্রত্যেকটি স্থানের নামকরণের পেছনে একটি সঙ্গত কারণ বর্তমান। কখনো সেটি আমাদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে, কখনো আবার কষ্ট কল্পিতও বলে মনে হয়। পণ্ডিতদের মতে বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানের নামই বৃক্ষলতাদি নামের অনুসরণে। ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা স্থান নাম' গ্রন্থে বলেছেন—বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি যে কোন কোন বৃক্ষ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল বলে বিবেচিত হয়। (বিস্ময়ের বিষয় এই যে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত এই সব গাছের নাম বাংলা দেশের স্থান নামে প্রচুর মেলে।) এই প্রসঙ্গে আবার তিনি শিমুল, বট ও অশ্বত্থ গাছের প্রাধান্যই স্বীকার করেছেন।

ডঃ সেন বাংলা দেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বলেছেন—পশ্চিমবঙ্গের পুরানো স্থান নামের বারো আনা ভাগই উদ্ভিদ্ নাম থেকে নেওয়া।...পূর্ব ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই তুলনায় সবচেয়ে বেশি শস্যশ্যামল অথচ যথাসম্ভব জলাভূমি ও বনভূমি বর্জিত।[১] বেতোড়সহ যে পাঁচটি গ্রাম ইংরেজরা গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে সনদ লাভে সমর্থ হয়েছিল তাদের নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ পাঁচটি গ্রামের মধ্যে তিনটি স্থান বৃক্ষলতাদির নামানুসারে নামাঙ্কিত হয়েছে, যেমন শালকিয়া, কাসুন্দিয়া ও বেতোড়। অপর দুটির হাড়িয়া (হাওড়া) প্রাকৃতিক ভূমি ভাগের (topography) প্রকারভেদ অনুসারে ও রামকৃষ্ণপুর ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে নিশ্চয়ই নামাঙ্কিত হয়েছে। শালকিয়াতে প্রচুর শালুক ফুল হত, কাসুন্দিয়া অঞ্চলে প্রচুর কাসুন্দে গাছ ছিল আর বেতোড়ে নদীতটে বেতের জঙ্গল ছিল। সে কারণেই তাদের অনুরূপ নাম হয়েছে।[২] হব্বড়>হাবড়া>হাওড়া হচ্ছে সে স্থান যার নদীতট জল-কাদাময়।[৩] শেষোক্ত স্থানটি অর্থাৎ রামকৃষ্ণপুর নিশ্চয়ই ব্যক্তিনাম ঘটিত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে বেতোড় মধ্যযুগে এতো ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল তাকে টপকে গিয়ে জেলার নাম হাওড়া হয়ে গেল কি ভাবে? এর উত্তরে একটি প্রবাদ বাক্যই হয়তো উল্লেখ করলে যথেষ্ট বলা হবে বলে মনে করি—যাকে ইংরেজিতে বলে **A dark horse won the race.**

এখন হাওড়া নামের ব্যুৎপত্তি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজিটিয়ার্স (হাওড়া)-এর লেখক ও'ম্যালি এবং এম. চক্রবর্তীর মতে পূর্ববঙ্গে 'হাওড়' (haor) নামে কথা চালু আছে। নিচু ও অবনত অঞ্চলে বৃষ্টি ও বর্ষার জল সঞ্চিত স্থানকেই 'হাওড়' বলা হয়। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের কোন কথা চালু নেই বলে তিনি বলেছেন—**'but the word does not appear to be known in Western Bengal.'** তবে তিনি এই মতটিকেই গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হাওড়া সিভিক কমপ্যানিয়ানের লেখক জে. বোনার্জীর

মতে হারিড়া থেকে হাওড়া হতে পারে। হারিড়াকে ওড়িয়া ভাষায় হাবোড় বলা হয়। হাবোড় কথার মানে জল-কাদাময় ভূমি। আর এই অঞ্চলটি যে এককালে ওড়িয়া রাজাদের অধিকৃত অঞ্চল ছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। উপরন্তু ১৯০৮ সালের জরিপ অনুসারে দেখা যায় যে হাওড়া শহর অঞ্চলে মাত্র ৮ বর্গ মাইল এলাকায় তখন খানা ডোবার সংখ্যা ছিল ১৮০০ টি। অপরদিকে অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত ১৯৭২ সালের ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজিটিয়াস' (হাওড়া) গ্রন্থে 'হারিডা' থেকে 'হারিয়াড়া' ও রেল স্টেশন স্থাপনের পর 'হাওড়া' হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার 'হাড়ি' শব্দের সঙ্গে 'আড়া' যোগ থাকায় ব্যাখ্যা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে একদা এই স্থান হাড়ি সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল ছিল। 'আড়া' শব্দের অর্থ বাসস্থানের জন্য উঁচু বা ডাঙ্গা জমি। 'আড়া' শব্দটিকে অষ্ট্রিক শব্দ বলেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অপরপক্ষে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' পুস্তিকায় 'হাবড়' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই কথাটির জন্য ওড়িয়া কথার মানে খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কথাটি মূলত দেশীয়। কাদা অর্থে 'হাবড়' পূর্ব ভারতে প্রচুর প্রয়োগ আছে। এখনও যশোহরের বাওড়ের (বৃহৎ স্বাভাবিক জলাশয়) যে ঘাটে বালি বেশি আছে তাকে বলে বেলেঘাট। যেখানে পাঁক বা কাদা বেশি তাকে বলে হাবড়ে (হাবড়িয়া) ঘাট। এই প্রসঙ্গে তিনি চব্বিশ পরগনার 'হাবড়া গ্রাম' ও আগড়তলার 'হাওড়া' নদীর নামও উল্লেখ করেছেন। অষ্ট্রিক 'আড়া' শব্দের সংযোগে বা হাড়িদের উঁচু বাঁধের পাড়ে (আড়া) বাসস্থান থেকে হাড়িয়ারা হয়েছে এটাও তিনি খণ্ডন করে বলেছেন যে 'হাড়িরা' কোন ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মেই হাওড়া হতে পারে না। হাড়ি+আড়া=হাড়িয়ারা—এ ব্যুৎপত্তিও কষ্ট কল্পিত।

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তাতে এ কথা হয়তো মেনে নিতে অসুবিধা হবে না যে 'হাবড়' অষ্ট্রিক বা নিষাদ জাতির শব্দ হউক বা 'হাবড়' ওড়িয়া শব্দই হউক 'হাবড়' (জল-কাদাভূমি) থেকেই 'হাবড়া' ও পরে 'হাওড়া' হয়েছে। কারণ ইংরেজ আমলেও হাওড়াকে প্রথমে 'হাবড়া' বলে বিভিন্ন সরকারী এবং বে-সরকারী সংবাদ-পত্রেও নিয়মিত উল্লেখ করা হত। হাওড়া স্টেশনে প্রথম রেল চালু হবার সংবাদ সম্বন্ধে তদানীন্তন কালের বিখ্যাত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' লিখছে—"আগামী আগষ্ট মাসের (১৮৫৪ সাল) ১লা তারিখে আমাদিগের গবর্ণর জেনারেল ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত সাহেবরা উপস্থিত হইয়া রেইল রোড খুলিবেন। ঐ দিবস 'হাবড়ায়' ও অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সামান্য সমারোহ হইবেক।" এমনকি ১৮৫৪ সালে ২৬শে অক্টোবর রেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর. ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনশন স্বাক্ষরিত যে রেলের প্রথম টাইম টেবল 'সংবাদ ভাস্করে' ছাপা হয়েছিল তাতেও লেখা ছিল 'হাবড়া স্টেশন হইতে গমন।'

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে চব্বিশ পরগনাতেও (বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা)

'হাবড়া' বলে একটি গ্রাম আছে। এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ করবার জন্যই কী তাকে বলা হতো 'গোমো হাবড়া'! ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব কিন্তু 'হাওড়া'কে 'হাউরা' (Houra) নামে লিখেছেন। এটা মনে হয় তখনকার দিনে ইংরেজরা নামের বানান নিজেদের মত করে লিখতেই অভ্যস্থ ছিলেন। যেমন, 'রেনেল'স এটলাসে' প্লেট নং সাত ১৭৭৯ এবং প্লেট নং উনিশ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে শালকিয়াকে শোলকি (Solkee অথবা Solkey) বলে ছেপেছেন। আর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'আপজন' (upjhon) সাহেব তাঁর মানচিত্রে রামকৃষ্ণপুর ঘাটকে রামকৃষেণপুর (Ramkissenpore ghat) এবং শালকিয়া ঘাটকে শুলখিয়া ঘাট (Sulkhia ghat) বা শুলকিয়া ঘাট (Sulkia ghat) বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে একথা সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে রেল লাইন চালু হওয়ার পরেই আস্তে আস্তে 'হাবড়া' থেকে 'হাওড়া' চালু করল ঐ ইংরেজরাই। কারণ ঐ 'হারিরা' মৌজাতেই হাওড়া স্টেশন স্থাপিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ার কলকাতার দিকের তেত্রিশটি গ্রামের সঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ের পাঁচটি গ্রামও ইংরেজদের দান করেছিলেন। ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ের জমিদাররা সহজেই সম্রাটের আদেশ মেনে নিলেও পশ্চিম পাড়ের জমিদার বা ভূ-স্বামীরা তা সহজে মানতে রাজি হন নি। অবশ্য এ অনিচ্ছা প্রকাশে তাঁদের পেছন থেকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তদানীন্তন বাংলা দেশের নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ। হাওড়ার এ পারের জমিদারদের জাতীয়তাবোধ তীব্রতর ছিল বলেই হয়তো তাঁরা সম্রাটের ফরমানকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজ বণিকের কাছে অনেকদিন পর্যন্ত মাথা নোয়াননি।

ফরমান দানের কয়েক বছরের মধ্যেই ভূমি রাজস্ব আদায় নীতি দুবার করে সংশোধিত হয়। মুর্শীদকুলী খাঁর আমলে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার এবং তাঁরই জামাতা সুজাউদ্দিনের রাজত্বকাল ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার। এই দ্বিতীয় বারের রাজস্ব পদ্ধতি পুনর্বিন্যাসের সময় উলুবেড়িয়ার সমগ্র অংশ এবং হাওড়া সদর অঞ্চল বর্ধমান মহারাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। এইভাবে হাওড়াকে ইংরেজ শাসনের তালিকাভুক্ত করা হল।

এর পরের ইতিহাস হচ্ছে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ আক্রমণ—এমনকি তিনি থানা দুর্গ পর্যন্ত অধিকার করে রাখেন। এই আক্রমণে ভীত হয়ে বাংলার তদানীন্তন নবাব আলিবর্দী খাঁকে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার বিস্তীর্ণ অংশসহ বর্ধমানের অনেক অংশ ছেড়ে দিয়ে মারাঠা শক্তির সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হয়। এই অস্থির অবস্থা চলে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।[৪]

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে সিংহাসনে বসেন। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের প্রথম থেকেই যে বনিবনা ছিল না তা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। সিরাজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা থানা দুর্গ সাময়িকভাবে দখল করে রাখে। কিন্তু নূতন করে হুগলী থেকে সৈন্য পাঠালে

ইংরেজরা দুর্গ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে থানা দুর্গের এক পাশে সিরাজ একটি নবাব গৃহও নির্মাণ করেছিলেন। An Account of Howrah Past & Present গ্রন্থের লেখক C. N. Banerjee লিখেছেন— Close to the Banian tree was seen a ruined house. This house is said to have been the Kutchery of the Nawab Sirajuddulya.
'ক্যালকাটা ক্যাপচারের' পর সিরাজউদ্দৌল্লা কালবিলম্ব না করে মানিক চাঁদ ও দেওয়ান নন্দকুমারের হাতে কলকাতা রক্ষার ভার দিয়ে মুর্শিদাবাদ রওনা হয়ে যান। নবাবের জয়ের সংবাদ জানতে পেরে মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন কয়েকটি জাহাজ নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সংবাদ শুনে নন্দকুমার দুটি জাহাজে ইট বোঝাই করে মেটিয়াবুরুজের মুখে গঙ্গার অপরিসর স্থানে ডুবিয়ে দিয়ে ইংরেজদের রণতরীর গতিরোধ করার কৌশল করেছিলেন। কিন্তু জোয়ারের সহায়তায় এত দ্রুত গতিতে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের জাহাজ এসে পেঁছে গেল যে নন্দকুমারের কৌশল মনে মনেই রয়ে গেল। থানা দুর্গ ইংরেজদের সহজেই দখলে এসে গেল। তারপর সিরাজকে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা কিভাবে পর্যুদস্ত করে বাংলাদেশ জয় করল তা আর বঙ্গবাসীর কাছে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্বে বহুদিন পর্যন্ত হাওড়া বলে কোন পৃথক জেলা ছিল না। প্রথমে হাওড়া ও হুগলীকে বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান থেকে হুগলী জেলাকে পৃথক করে দেওয়া হয়। কিন্তু তখনও হাওড়ার বৃহৎ অংশ হুগলীর অধীনেই ছিল। কেবল মাত্র শহর হাওড়াকে কলকাতার অংশরূপে গণ্য করা হত। তাই হাওড়ার ফৌজ-দারী মামলাগুলি চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক ও প্রধান বিচারকের এজলাসে বিচারের জন্য পাঠানো হত। কিন্তু হাওড়া জেলার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির ফলে শাসক কর্তৃপক্ষ একটি আলাদা জেলা গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ফলে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়াকে হুগলী থেকে আলাদা জেলা বলে ঘোষণা করা হল। সেই নূতন জেলার প্রথম জেলা শাসক হলেন মিঃ উইলিয়াম টেলার (Mr. William Tayler)।[৫] যদিও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাওড়ার জেলা শাসক চব্বিশ পরগনার জজ সাহেবের অধীনস্থ ছিলেন এবং পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার হুগলীর জজ সাহেবের অধীনে যায়। তবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হাওড়া জেলা হিসেবে কাজ করতে পারে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে।

১. বাংলা স্থান নাম—সুকুমার সেন।
২. পূর্বোক্ত।
৩. পূর্বোক্ত।
৪. West Bengal District Gazetteers--Amiya Kumar Banerjee.
৫. Bengal District Gazetteers—Howrah—O' Mally & M. Chakravorty.

হাওড়া জেলার ভৌগোলিক অবস্থান

প্রথমেই মনে রাখতে হবে এই জেলাটির আকৃতি একটি বিষম ত্রিভুজের মত। বাংলাদেশের মধ্যে এটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম জেলা। পূর্ব ও পশ্চিমের সীমারেখা দুটি নদী ও উপনদী দ্বারা বেষ্টিত। যেমন পূর্বে ভাগীরথী এবং পশ্চিমে তারই উপনদী রূপনারায়ণ। পূর্ব ও পশ্চিম-এর প্রস্থ হচ্ছে ২৮ (আঠাশ) মাইল এবং উত্তরে ও দক্ষিণে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০ (চল্লিশ) মাইল। জেলাটি উত্তরে ২২° ১৩´ হতে ২২° ৪৭´ অক্ষাংশ এবং ৮৭° ৫১´ হতে ৮৮° ২২´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জেলার মোট আয়তন ৫১০ বর্গমাইল।[১]

হাওড়া জেলার চতুঃসীমা বলতে উত্তরে হুগলী জেলার আরামবাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমা, পূর্বে কলকাতাসহ উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাকপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আলিপুর ও ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমা, দক্ষিণে মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা ও পশ্চিমে মেদিনীপুরের ঘাটাল ও তমলুক মহকুমা এবং হুগলীর আরামবাগের কিয়দংশ। এই জেলায় দুটি মহকুমা রয়েছে, যথা—হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমা। ১৯৬৩ সালে হাওড়া জেলাকে বর্ধমান বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২]

হাওড়া জেলার পূর্বে ও পশ্চিমে ভাগীরথী ও রূপনারায়ণ প্রবাহিত হলেও এই জেলার ভেতর দিয়ে আর এক প্রধান নদী বয়ে গেছে যার নাম দামোদর। দামোদর নদের প্রভাব এই জেলার মানুষের জীবনযাত্রার উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জেলাটি গড়ে উঠেছে নদী পলি গঠিত সমভূমি হিসেবে। এই তিন প্রধান নদী ছাড়াও রয়েছে সরস্বতী (মৃতপ্রায়), কানা দামোদর বা কৌশিকী প্রভৃতি নদী। জেলার ভূমিভাগের ঢাল বিচিত্র—ঠিক যেন একটি বাটির মত। এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় হুগলী নদী ও সরস্বতী নদীর মধ্যস্থ অবনত অঞ্চল (হাওড়া জলা), মধ্যাংশে সরস্বতী ও কানা দামোদরের মধ্যস্থ অবনত অঞ্চল (রাজপুর জলা) ও পশ্চিমাংশে কানা দামোদর ও দামোদরে মধ্যবর্তী অবনত অঞ্চল (আমতা জলা)। এই জেলার আর একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসংখ্য খাল, বিল, ঝিল ইত্যাদির অবস্থান। বর্ষার জলে এগুলি পূর্ণ হয়ে থাকে। ফলে এই সময় গ্রামগুলি খুবই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতীতে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল নৌকা, ডোঙ্গা ও শালতি। মাঝে মাঝে বাঁধের উপর দিয়ে যাতায়াতকে নিরাপদ করা হত। জেলার বিভিন্ন অংশে খালের আধিক্য এক অংশ থেকে অপর অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে—যেমন হুগলীকে বিভক্ত করেছে বালী খাল। এছাড়া জেলার মধ্যেই রয়েছে রাজগঞ্জের খাল, সিসবেড়িয়া খাল, সাঁকরাইল খাল, মাদারিয়া খাল ও চম্পা খাল প্রভৃতি। উল্লেখ্য এই যে, এই সব কটি খালই গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে তাল রেখে চলে।

জোয়ারের সময় বড় নৌকো দিয়ে গ্রামের মধ্যে পণ্যসামগ্রী চলাচল করান হয়। এছাড়া দামোদরের সঙ্গে যোগ রয়েছে বারটি খালের। যার মধ্যে মাদারিয়া, বাঁশপতি ও গাইঘাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর রূপনারায়ণের সঙ্গে এসে মিশেছে ছটি খাল। যার মধ্যে বাকসীর খাল খুবই প্রসিদ্ধ। বাকসী ও গাইঘাটা পরস্পর মিলিত হওয়ায় দামোদর ও রূপনারায়ণে নৌচলাচলের পক্ষে সুবিধা হয়েছে।

হাওড়া জেলার পূব পাশের গঙ্গানদীই ভাগীরথী নামে হিন্দুদের কাছে সমধিক পরিচিত। মুর্শিদাবাদের দক্ষিণাংশ থেকে গঙ্গা কেন ভাগীরথী নামে পরিচিত সেই পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করে অযথা পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়াতে ইচ্ছে নেই। তবে রাজা ভগীরথ মর্ত্যে যে গঙ্গা আনয়ন করে সগর বংশের ষাট হাজার তৃষ্ণার্ত সন্তানদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথী আজও ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের ধর্মাবেগের সঙ্গে মিশে আছে। সাঁকরাইল অংশের গঙ্গাকে হিন্দুরা গঙ্গা বলে আজও মনে করে না। তাই ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা যেকোন পুণ্যতিথিতে আজও স্নান করতে আসে হাওড়া ঘাট প্রভৃতি স্থানে। ও' ম্যালি এবং এম. চক্রবর্তী তাই লিখেছেন—**The portion below Sankrail is not considered sacred, however, perhaps because it was little used by boats in early times.**[৩]

প্রকৃতপক্ষে সাঁকরাইল নদী অঞ্চলটি তখন পর্তুগীজ জলদস্যু ও বোম্বেটেদের অধ্যুষিত হওয়ায় পণ্যবাহী নৌকোগুলি বেতড়ের অপর পার কালীঘাটের আদি গঙ্গার পথ ধরে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছত। এই কালীগঙ্গাকেই পবিত্র 'আদিগঙ্গা' নামে আখ্যা দেওয়া হয়। ভাগীরথী-তীর যে কেবল হিন্দুদের কাছেই পবিত্র স্থান তাই নয়—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও ভাগীরথী তীরকে সমান পবিত্র বলে মনে করতেন। তাই তিব্বতের রাজা তোসী লামা বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে ঘুষুড়ীর ভাগীরথী তীরে একখণ্ড জমি ভিক্ষা করেছিলেন যাতে তিব্বতীরা ভাগীরথী তীরে বসে ঈশ্বর-চিন্তা করতে পারেন।[৪] সেই স্থানটি আজও 'ভোটবাগান মঠ' নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে।

কালীঘাটের আদি গঙ্গা মজে গেলে গঙ্গার গতিবেগ পশ্চিম দিকে পরিবর্তিত হয়। বোটানিকেল গার্ডেনের পাশ দিয়ে সাঁকরাইল হয়ে উলুবেড়িয়া দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় দামোদর একদিক থেকে এবং রূপনারারণ অপরদিক থেকে এসে একসঙ্গে মিলিত হয় গাদিয়ারা নামক স্থানে। এই সঙ্গম স্থলটিতেই লর্ড ক্লাইভ একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন যা ফোর্ট মর্নিংটন পয়েন্ট নামে খ্যাত। আজও ভাটার সময় ঐ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই স্থানটিই আবার জেমস এণ্ড মেরী চড়া (**James and Mary Sands**) নামেও বিখ্যাত। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জেমস এণ্ড মেরী নামে একটি জাহাজ হুগলী নদীর মুখে ঢোকবার সময় তাম্বুলী পয়েণ্ট (**Tambolee Point**) এক চড়ায় আটকে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটি উল্টে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে চার পাঁচজন নাবিকের

প্রাণনাশও হয়। বেঙ্গল লেটার টু কোর্ট, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এক নোটে বলা হয়েছে—**Tambolee Point is shown in the Pilot Chart 1703 at the present site of Fort Mornington Point.**[৭]

এই চড়াটি অনুরূপ নামে নামাঙ্কিত হয়েছে এই কারণে যে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস ও তাঁর রানী মেরী অব মোদেনার নামে ঐ জাহাজটির নাম ছিল।

হাওড়া জেলার নদীগুলির বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু চড় দেখতে পাওয়া যাবে যেমন ঘুষুড়ির চড়, রামকৃষ্ণপুরের চড়, শিবপুরের চড় (ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছে), সারেঙ্গা চড় ও উলুবেড়িয়ার চড়। এর মধ্যে আবার রামকৃষ্ণপুরের চড়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই চড়টি থেকে পোর্ট কমিশনারের প্রচুর আয় হয়। নদীর ধারে বাকি চড়গুলি ইটখোলার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

সরস্বতী নদী এককালে সপ্তগ্রামে যাবার একমাত্র জলপথ ছিল। এই সরস্বতী নদী বেতোড়ের পাশ দিয়ে সাঁকরাইল হয়ে গঙ্গায় মিলিত হয়। তাই সরস্বতীর নিম্নাংশকে সাঁকরাইল খালও বলে। সরস্বতী ডোমজুড় থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে প্রাচীন কালে প্রবাহিত হত। নদী পরে মজে যাওয়ার ফলে জায়গায় জায়গায় বৃহৎ জলাশয়ের সৃষ্টি করে। যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় দহ—যেমন মাকড়দহ, ঝাপড়দহ ও ভাণ্ডারদহ ইত্যাদি।

জেলার প্রধান নদী দামোদর ছোট নাগপুরের মালভূমি থেকে বয়ে এসে হাওড়া জেলায় প্রথম প্রবেশ করে আক্না নামক গ্রামের কাছে। তারপর আমতার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গাইঘাটা খালের সঙ্গে মিলিত হয়। আমতার পর দক্ষিণে বাগনান অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে হুগলী পয়েন্ট-এ এসে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়।

এই দামোদরের আবার দুটি শাখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা কানা দামোদর বা কৌশীকী এবং পশ্চিম দামোদর শাখা। কানা দামোদর ইছাপুর গ্রামের কাছে জেলায় প্রবেশ করে পরে দক্ষিণ দিকে রাজাপুর ঝিলে এসে মিলিত হয়। পরে আরও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়ে উলুবেড়িয়ার পাশ দিয়ে ফলতা পয়েন্টের বিপরীতে হুগলী নদীতে এসে পড়ে। এই কানা দামোদরের তীরেই একদা অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামের পত্তন হয়েছিল। ও'ম্যালি এবং এম. চক্রবর্তীর মতে—**A small stream now, it must have been more important in old days, as several large villages inhabited by the Bhadralok, or respectable Hindu Castes, lie along its course.**

অপর উল্লেখযোগ্য প্রধান নদী রূপনারায়ণ হাওড়া জেলায় প্রথম প্রবেশ করে ভাটোরা গ্রামের কাছে। তারপর দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বাক্সীখালের সঙ্গে মিলিত হয়। তারও পরে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে তমলুক অভিমুখে যাওয়ার পথে হুগলী পয়েন্টের বিপরীত দিকে হুগলী নদীতে পড়ে। দামোদর ও রূপ-

নারায়ণ এই দুই নদীর সংযোগ স্থাপন গাইঘাটা ও বাকসী খালের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। সাড়ে সাত মাইল লম্বা এই খালটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন হাওড়া ডিষ্ট্রিক বোর্ডের হাত থেকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জেলার প্রধান নদীগুলির গতিপথ কালের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে দামোদরের গতিপথের পরিবর্তনই সমধিক স্মর্তব্য।
হাওড়া জেলার সমভূমি প্রধানত নদী পলল দ্বারা গঠিত। সুতরাং এই জেলা নানা প্রকার ফসল উৎপাদনের পক্ষেও উপযোগী। এই সব চিন্তা করেই হয়তো কর্নেল রবার্ট কীডসাহেব শিবপুরে বোটানিকেল গার্ডেনের স্থান নির্বাচন করেছিলেন। যা পরবর্তীকালে ভারত তথা এশিয়ার কৃষি ও উদ্ভিদ গবেষণার শ্রেষ্ঠ উদ্যান হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

যেহেতু হাওড়ার শহরাঞ্চলে কলকারখানা ও গ্রামাঞ্চলে চাষের কাজে অধিকাংশ জমি নিয়োজিত হয়েছে সেহেতু জেলায় কোন বনাঞ্চল সৃষ্টির অবকাশ হয়নি। ফলে তেমন কোন হিংস্র জন্তুর আবাসস্থলও গড়ে ওঠেনি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ও'ম্যালি এবং এম. চক্রবর্তী হাওড়ার গেজিটিয়ারে লিখেছেন যে—তিন চার বছর আগে বালটিকরীতে একজন স্থানীয় শিকারী একটি চিতা শিকার করেছিল। আর একটি চিতাকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোগলা বনে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া কোন হিংস্র জন্তুর কথা তারা জানতে পারেননি। জগৎবল্লভপুর ও উলুবেড়িয়া অঞ্চলে বন্য শুয়র কিছু ছিল বলেও তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে হুগলী ও দামোদর নদীতে প্রায়ই কুমীরের দেখা পাওয়া যেত বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

নদীনালা অধ্যুষিত হাওড়া জেলা সুস্বাদু মাছের জন্য তখন বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল, যেমন—হুগলী নদীর ইলিশ, ভেটকী, ট্যাঙ্গরার স্বাদে মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালীর কার না জিভের লালা গড়ায়! আর তপসে মাছের ঋতুতে তপসে ভাজা ও ঝোল কোন বাঙ্গালীর না আদরণীয় আহার্য বস্তু! ওয়ালটার হ্যামিলটন সাহেব পর্যন্ত ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তপসে সম্বন্ধে লিখেছেন—**The Hooghly from Uluberia to Diamond Harbour is in fact, noted for the delicious fish last named, as the best and highest flavoured fish not only in Bengal, but in the whole world.**

সেই তপসে মাছের স্বাদ আজ আমরা কদাচিৎ পেলেও কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পানিত্রাসের সামতা বেড়ে থাকা পর্যন্ত খুবই ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের স্নেহধন্যা রাধারানী দেবী লিখেছেন—রূপনারায়ণের তাজা তপসে মাছ পাঠাতেন (শরৎদা) লিলুয়ায়। কলকাতাতেও বরাবর পাঠিয়েছেন।[৬]
এছাড়া রুই, মৃগেল, কাতলা প্রভৃতি মাছের চাষ আজও প্রচুর পরিমাণে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হয়ে থাকে। বাগনান ও আমতাতে মাছের অনেক আড়তও আছে।

বর্ষাকালে উলুবেড়িয়া, কোলাঘাট ও বাগনানে গেলে মৎস্যপ্রিয় বঙ্গবাসী একবার ইলিশের খোঁজ করতে এখনও ভোলে না।

১. Bengal Gazetteers (Howrah) 1909.—O'Mally & M. Chakravorty.
২. W. B. District Gazetteers—Howrah—Amiya K. Banerjee.
৩. District Gazetteers—(Howrah) 1909
৪. District Gazetteers—Howrah—O'Mally & M. Chakravorry 1909
৫. District Gazetteres – O'Mally & M. Chakravorty. 1909
৬. শরৎচন্দ্র—মানুষ ও শিল্প—রাধারানী দেবী।

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে যেসব গভর্নর জেনারেল সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট বলে ইতিহাসে আখ্যালাভ করেছেন তাদের মধ্যে লর্ড ডালহৌসী অন্যতম। তাঁরই আমলে এমন সব ভারতীয়দের স্বার্থবিরোধী আইন প্রণীত হয়েছিল (প্রধানত স্বত্ববিলোপনীতি) যার দ্বারা এদেশের অনেক দেশীয় রাজ্যই অন্যায়ভাবে ইংরেজের হাতে চলে যায়। ফলে জাতীয় বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল। এই গভর্নর জেনারেলের দমনমূলক ও বিভেদপ্রবণ সাম্রাজ্যবাদী নীতি শেষ পর্যন্ত মহা বিদ্রোহে পরিণত হ'ল। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তিকে এদেশে এতবড় যুদ্ধের সম্মুখীন হতে আর কখনও হয়নি। স্বভাবতঃই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে এনিয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। ভারতীয়দের বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য মহারানী ভিক্টোরিয়া কুইন্স্ প্রোকলেমেশন্ (Queen's Proclamation) জারী করে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রে সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যদিও সেটা একান্তই কাগজে সহানুভূতি (Pious Wish) ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

লর্ড ডালহৌসীকে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্য বিস্তারের প্রতিভূ হিসেবে আখ্যা দিলেও ভারতীয়দের জন্য তাঁর কিছু কিছু সংস্কারমূলক কাজ এদেশের অধিবাসীরা ভুলতে পারবে না। এদেশে রেললাইনের প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি। মনে রাখতে হবে, ভারতের মত বিরাট অথচ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে দ্রুত যাতায়াতের আবশ্যকতা প্রথম অনুভব করলেন লর্ড ডালহৌসী। যদিও আসল কারণ ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার ও বিদেশী পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করা। জর্জ স্টিফেনসনের (১৭৮১—১৮৪৮) বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের সুফল ভারতেও যাতে ছড়িয়ে পড়ে তার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ভারতে প্রথম রেলগাড়ির সূচনা হয় ১৮৫৩ সালে বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত রেললাইন চালু করে। বলা বাহুল্য, ভারতের আধুনিক যানবাহন-ব্যবস্থা প্রবর্তনে ঐ দিনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক দিন। এর পরের বছরেই শুরু হয় হাওড়া স্টেশনে রেলগাড়ির সূচনা।

'কলকাতা দর্পণ'-এর বর্ষীয়ান লেখক রাধারমণ মিত্র লিখছেন—১৮৫৩ সালের শেষাশেষি রেললাইন পাণ্ডুয়া অবধি তৈরী হইয়া যায়। কিন্তু গাড়ি চালানো পিছিয়ে যায় তিনটি কারণে—প্রথমতঃ···যে রেলগাড়িগুলি প্রথম এই লাইনে চলবে সেগুলি নমুনা স্বরূপ বিলেতে তৈরী হয়ে এক জাহাজে কলকাতায় আসছিল। 'গুডউইল' নামে সেই জাহাজটি গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি Sandheads-এ এসেই ডুবে যায়।

দ্বিতীয়তঃ···বিলেত থেকে গাড়ী চালাবার এঞ্জিন আসছিল তা ভুলক্রমে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়।

তৃতীয়তঃ···চন্দননগরের উপর দিয়ে রেললাইন যাওয়ায় ফরাসীদের স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়।

অবশেষে ঠিক হল যে, ১৮৫৪ সালের ১লা আগষ্ট হাওড়া স্টেশনে রেল চালু হবে। এ সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত প্রচারিত হল ১৮৫৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখছেন ঃ "আগামী আগষ্ট মাসের ১লা তারিখে আমাদিগের গবরণর জেনারেল ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত সাহেবরা উপস্থিত হইয়া রেইল রোড খুলিবেন। ঐ দিবস হাবড়ায় (তখন হাওড়াকে বাংলায় এইভাবে লেখা হ'ত) ও অন্যান্য স্থানে প্রজাদিগের সামান্য সমারোহ হইবেক।" স্বাভাবিক কারণেই লাইনে ট্রায়ালের কাজ শুরু হ'য়ে গেল। তাই হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত গাড়ী চালিয়ে দেখা হ'ল লাইন ঠিকঠাক আছে কিনা। ১৮৫৪ সালের ২৮শে জুন মিঃ জন হজ্‌সন্ নামে এক ইংরেজ ড্রাইভার ইঞ্জিন চালিয়ে লাইন পরীক্ষা করেন।

পূর্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ১লা আগষ্ট রেল চালু হ'ল না। কারণ বড়লাট লর্ড ডালহৌসী সেদিন আসতে পারলেন না। ২৯শে জুলাই (১৮৫৪) 'সংবাদ প্রভাকর' আবার লিখলেন ঃ মর্নিং ক্রনিকেল পত্রে প্রকাশ হইয়াছে আগামী মাসের ১৬ই তারিখে (১৬ই আগষ্ট) শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরণর জেনারেল বাহাদুর সাধারণের গমনাগমনের উদ্দেশ্যে বঙ্গরাজ্যের রেইল প্রতিষ্ঠা করিবেন।

কিন্তু এবারেও তিনি কথা রাখতে পারলেন না। তাই ঐ তারিখ না পিছিয়ে বিজ্ঞাপিত দিনের একদিন আগেই অর্থাৎ ১৫-ই আগষ্ট মঙ্গলবার ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত (পাণ্ডুয়া নয়) ২৪ মাইল পথে প্রথম রেল চালু হ'ল। আশিস কমল সরকারের 'পূর্ব-রেলের পথে পথে' বইতে হাওড়া স্টেশনে প্রথম রেল চলার দিনটির এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে তিনি লিখছেন—'টিকিটের জন্য পড়ে গেল কাড়াকাড়ি'। তিনখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা, দুখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, দুখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। আর একখানি গার্ডের ব্রেকভ্যান। গাড়ির বহন ক্ষমতা ছিল শ'সাতেক। আর টিকিটের জন্য আবেদন পড়েছিল তিন হাজার যাত্রীর। সর্বশেষে আটশ যাত্রী সেদিন চড়তে পেরেছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন—'প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন স্বনামধন্য কলকাতার গন্ধবণিক শ্রীরূপচাঁদ ঘোষ। তিনি ট্রেন থেকে নেমে জনে জনে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সত্যি হুগলী পেঁছেছেন তো! আর একজন হলেন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত রাধালঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও রাশি-নক্ষত্র বিচার করে তবেই হাওড়া থেকে সেই প্রথম ট্রেনের যাত্রী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু হুগলী গিয়ে আর সেই 'আগুনের গাড়িতে' চড়ে কলকাতায় ফিরে যেতে রাজি হলেন না। কারণ তাঁর মতে এই অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে আয়ুক্ষয় ছিল অনিবার্য।' এরই বিপরীত চিত্র দেখা গেল একজন সাহেব যাত্রীর পক্ষে। রেলের গতিবেগ দেখে তিনি আবার গতিবাতিক হয়ে উঠলেন। 'তাঁর ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াটি রেলের গতিতে ছুটতে পারছে না

দেখে তাকে চাবুক মারতে মারতে মেরেই ফেললেন।'[১] এর কয়েকদিন পরেই অর্থাৎ ১. ৯. ১৮৫৪ তারিখে পাণ্ডুয়া অবধি রেল চালু হয়। ১৫. ৮. ১৮৫৪ তারিখে যে রেল চলেছিল তার চালক ছিলেন মিঃ জন হজ্‌সন্‌। ইনি ছিলেন ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেলের রেলইঞ্জিনের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। আর যে ইঞ্জিনটি দিয়ে গাড়ী চালানো হয়েছিল ওর নাম ছিল 'Fairy Queen'।

'কলকাতা দর্পণে' রাধারমণবাবু আরও লিখেছেন ঃ 'ফেয়ারী কুইনকে' অনেকদিন পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনের ভেতর ঘিরে রাখা হয়েছিল লোকদের দেখানোর জন্য। এখন আর সেটি সেখানে নেই। কোথায় আছে বা আছে কি না জানি না।' 'হুগলী জেলার ইতিহাস' রচয়িতা প্রবীণ লেখক সুধীর কুমার মিত্র তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—'Fairy Queen বর্তমানে লিলুয়ায় আছে।' খবর নিয়ে জানা গেছে যে, ঐ ঐতিহাসিক রেল ইঞ্জিনটি বর্তমানে জামালপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে আছে।

হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রথম যেদিন রেল চলল সেদিন যে জনসাধারণের উৎসাহ ও বিস্ময় কিরকম হ'তে পারে তা পাঠকের চিন্তার ওপরই রইল। সেদিনের হাওড়া—হুগলীর মধ্যবর্তী স্টেশনগুলি ছিল কেবলমাত্র বালী, শ্রীরামপুর, চন্দননগর। চন্দননগরের পর চুঁচুড়া স্টেশন। এই স্টেশনকেই রেলের টাইম টেবিলে হুগলী স্টেশন ব'লে দেখান হয়েছে। পাঠকদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য রেলের প্রথম টাইম টেবিলটি এখানে ছেপে দেওয়া হ'ল। তবে মনে রাখতে হবে, পাণ্ডুয়া পর্যন্ত লাইন হুগলী স্টেশনের পরে অর্থাৎ ১. ৯. ১৮৫৪ তারিখে চালু হয়। সেদিন থেকেই রেলের প্রথম টাইম টেবিল চালু হ'ল।

পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেল চলাচলের দিনটিতে প্রথম রেলের টাইম টেবিল চালু হয়ে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। ঐ দিনটিতেই আবার বর্ধমানের মহারাজার জন্মদিন ছিল। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, ঐ দিনে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে পরে পাল্কী বা ঐ জাতীয় যানে ক'রে সোজা গ্র্যাণ্ড-ট্র্যাঙ্ক রোড ধ'রে বর্ধমান গিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

এই পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার একটি বিখ্যাত স্থান। পূর্বে এটি 'পেঁড়ো বসন্তপুর' নামে পরিচিত ছিল। এটি একটি হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। হুগলী জেলার ইতিহাস রচয়িতা সুধীরকুমার মিত্রের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঐ গ্রন্থে লিখছেন—'শুনা যায়, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতদোনের পুত্র পাণ্ডশাক্য নামে এক রাজা পাণ্ডু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাণ্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পাণ্ডুদাস আমতার অধীনে পেঁড়ো বসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। রাজা পাণ্ডুদাস নিজবংশের নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পাণ্ডুয়া নামকরণ করিয়াছিলেন।' তিনি নিজ বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড সাহেবের মতামতও উল্লেখ করেছেন। ক্রফোর্ড সাহেবও লিখছেন ঃ **Pandua was once the capital of a Hindu Raja and is famous as a site of great victory by the Musalman under Saha Safi over the Hindus about 1340 A. D.**

পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলের প্রথম টাইম টেবিল
'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে উদ্ধৃত হ'ল।[২]

কলিকাতা হইতে	প্রাতের শকট	বিকেলের শকট	পাণ্ডুয়া হইতে	প্রাতের শকট	বিকেলের শকট
হাবড়া ষ্টেশন হইতে গমন	১০-৩০	৫-৩০	পাণ্ডুয়া হইতে গমন	৭-৩০	২-৩০
বালি	১০-৪৫	৫-৪৫	মগরা	৭-৫৫	২-৫৫
শ্রীরামপুর	১১-৩	৬-৩০	হুগলী	৮-১২	৩-১২
চন্দননগর	১১-৩০	৬-৩৭	চন্দননগর	৮-৩০	৩-৩০
হুগলী	১১-৪০	৬-৪৩	শ্রীরামপুর	৮-৫১	৩-৫১
মগরা	১১-৫৮	৬-৫৮	বালি	৯-৯	৪-৯
পাণ্ডুয়া পৌঁছিল	১২-৩০	৭-৪০	হাবড়া পৌঁছিল	৯-৩০	৪-৩০

R. Macdonald Stephenson
Managing Director
১৮৫৪ সন ২৬শে অক্টোবর

এখানে মনে রাখতে হবে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের উদ্বোধন তখনও হয়নি। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী পর পর দু'বারই কথা দিয়েও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু পাণ্ডুয়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত যখন লাইন পাতা হ'ল তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অবশ্য বড়লাট লর্ড ডালহৌসী উপস্থিত ছিলেন। ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার হাওড়া স্টেশনের গঙ্গার ধার গাড়ীতে গাড়ীতে ভর্তি হ'য়ে আছে। বহু গণ্যমান্য ইউরোপীয় ও এদেশীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনপর্ব অনুষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু এবারেও বড়লাট সাহেব পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে যেতে পারলেন না। হাওড়া স্টেশনের সভায় উপস্থিত থেকেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন।

স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, হাওড়া স্টেশন থেকে রেলে উঠতে হলেও কলকাতার যাত্রীদের জন্য গঙ্গার পূর্ব পাড়ে আর্মেনিয়ান ঘাটের কাছে একটি টিকিট ঘর ছিল। কিন্তু সেটি তুলে দেওয়া হয় ট্রেনে মান্থলি টিকিট ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে। তদানীন্তন 'সাধারণী' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাধারণী' পত্রিকা ১২৮১ সালের ২৯শে মাঘ সংখ্যায় লিখছে—'ইষ্ট ইণ্ডিয়া

রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ আগামী ফেব্রুয়ারী (১২৮১ সন) মাস হইতে যাহারা প্রত্যহ গাড়ীতে যাতায়াত করিবেন তাহাদিগকে কম দামে টিকিট দিবেন। হাওড়া স্টেশন হইতে যাত্রা শুরু হইবে—কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেল।[৩] এ প্রসঙ্গে তখনকার দিনে রেলের ভাড়ার তালিকাটিও পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া থেকে একটি দলিল ছেপে দেওয়া হল।

ভারতে রেলগাড়ী যেমন প্রথম চালু হয় বোম্বাইয়ে এবং পরে হাওড়ায় তেমনি ইলেকট্রিক রেলও চালু হওয়ার অনেক পর শুরু হয় হাওড়ায়। তবে সেটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু ক'রতে এসেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। তাঁর হাতেই উদ্বোধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১৪/১২/১৯৫৭। তা হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত প্রথম চালু হয়। তবে সে অনুষ্ঠানের বিষাদস্মৃতি এখনও আমাদের কারো কারো মনে আছে। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে ঐ বৈদ্যুতিক গাড়ীতে অসতর্কতাবশতঃ ঝুলে যাওয়ার জন্য কয়েকটি যুবকের অমূল্য প্রাণ বিসর্জিত হয়েছিল। সে কথা ভোলার নয়।

হাওড়া স্টেশনের কথা বলা হল। এই প্রসঙ্গে হাওড়া ব্রীজের কথা একটু বললে হয়তো বে-মানান হবে না। প্রবীণদের স্মরণে আছে যে, বর্তমান ক্যাণ্টি-লিভার হাওড়া ব্রীজের বদলে তখন ভাসমান কাঠের পুল ছিল। এই পুল সম্বন্ধে 'বাংলায় ভ্রমণ' (১ম খণ্ড) পুস্তকে লেখা হয়েছে।

"১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি ভাসমান নৌকার (পনটুন) উপর অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এই পুলটি নির্মিত হয়। ইহার উপর দিয়া বাস, লরী, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতি চলিবার প্রশস্ত রাস্তা ও দুইদিকে লোক চলাচলের জন্য 'ফুট পথ' আছে। মধ্যের দুইখানি নৌকা ইচ্ছামত সরাইয়া লইয়া গিয়া পুল খুলিয়া বড় বড় স্টীমার ও জাহাজ যাতায়াতের পথ করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই পুলের উত্তর দিকে একটি প্রকাণ্ড ঝুলান সেতু নির্মিত হইয়াছে।"

নতুন এই ব্রীজ করতে মোট আট বছর লেগেছিল। এই ব্রীজের নকসা তৈরি করেছিল মেসার্স রেণ্ডেল (**Rendel**), পামার (**Palmer**) এবং ট্রিটন (**Tritton**)। ইংলণ্ডের মেসার্স ক্লিভল্যাণ্ড ব্রীজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড প্রধান কনট্রাক্টর ছিলেন। এই কোম্পানী আবার ফ্যাব্রিকেশনের স্টীল ওয়ার্ক করার জন্য মেসার্স ব্রেইথওয়েট, বার্ন এবং জেসপ্ (সংক্ষেপে বি. বি. জে) কোম্পানীকে সাব-কনট্রাক্ট দিয়েছিলেন। এই তিনটি কোম্পানীর পক্ষ থেকে যিনি আসল কোম্পানীর সঙ্গে ফ্যাব্রিকেশনের কাজে কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার শালিখার অধিবাসী ললিতমোহন দাস। ললিতবাবু শালকিয়া এ. এস. স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন।

ঝুলন্ত হাওড়া ব্রীজ তৈরি করতে জমি সমেত খরচ পড়েছিল তিনকোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা। মোট ইস্পাত লেগেছিল ছাব্বিশ হাজার পাঁচশ টন—যার সম্পূর্ণ পরিমাণ সরবরাহ করেছিল টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী। বাজারে ঋণপত্র ছেড়ে এই ব্রীজের টাকা যোগান দেওয়া হয়। ঐ টাকা শোধ দেবার জন্য ½ শতাংশ কলকাতা কর্পোরেশনের বাড়ির করের উপর ধরা হয় এবং ¼ শতাংশ কর ধার্য ছিল হাওড়া, দক্ষিণ শহরতলী, টালিগঞ্জ ও গার্ডেনরীচের বাড়ির করের উপর। এছাড়া ট্রাম, বাস ও রেলের টিকিটের উপরও কর ধার্য আছে। মজার কথা ভারতের এই বিস্ময়কর পুলটির কোন উদ্বোধনপর্ব হয়নি। কারণ তখন চলছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।[৪] এই পুলের উপর দিয়ে প্রথম ট্রাম চলে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩। ১৯৪২ খ্রীঃ ডিসেম্বরে জাপানীরা দিনের বেলায়ই বোমা ফেলেছিল কলকাতায়—কিন্তু লক্ষ্য ছিল হাওড়া পুল উঁড়িয়ে দেবার।[৫]

হাওড়ায় ট্রাম—রেলগাড়ী চালু হওয়ার পর স্থলপথে এ শহরে আর এক দ্রুতগামী যান চালু হ'ল সেটি হচ্ছে ট্রাম গাড়ী। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একটি নদীরই অপর পারে হাওড়া শহর অবস্থিত হ'লেও এখানে ট্রাম চালু হয়েছিল কলকাতার অনেক পরে। কলকাতায় ট্রাম প্রথম চালু হয়েছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮০। অবশ্য সেই ট্রাম ঘোড়ায় টানতো। কিন্তু হাওড়া শহরে বৈদ্যুতিক ট্রাম একেবারেই চালু হ'ল। ট্রাম লাইন প্রথম চালু হ'ল হাওড়া স্টেশন থেকে শিবপুর অঞ্চলে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রটি স্থাপিত হ'ল শালিখায়—ঘাসবাগান ট্রাম ডিপোতে। হাওড়া-শিবপুর শাখায় প্রথম ট্রাম চালু হয় ১০ই জুন ১৯০৮। এই লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল তিন কিলোমিটারের মত। বর্তমান শিবপুর ট্রাম ডিপো বলে যে স্থানটি পরিচিত সেখান পর্যন্তই লাইনটি ছিল। হাওড়া বাঁধাঘাট (ভায়া জি. টি. রোড) শাখায় লাইন পাতা হল ৩.৭.১৯০৮ তারিখে। আর (ভায়া হাওড়া রোড হয়ে) হাওড়া-বাঁধাঘাট শাখায় লাইন চালু হয় ২.১০.১৯০৮ তারিখে। 'কলকাতা দর্পণের' লেখক রাধারমণ মিত্র লিখছেন—'হাওড়ার উত্তর বিভাগের (শালকিয়ায়) দুটি লাইনই খোলা হয় ১৯০৮ সালে—সঠিক তারিখ জানতে পারিনি।' সুতরাং উপরিউক্ত তারিখগুলি জানা এক্ষেত্রে বিশেষই মূল্যবান। মিত্র মশায় আরও লিখেছেন—'হাওড়ার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ট্রাম লাইন আর চালু নেই। এই দুটি বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৭০ সালে। এক্ষেত্রেও তিনি সঠিক কোন তারিখ দিতে সমর্থ হননি। এবং একটির সাল ভুল দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার কথা চিন্তা করেই সেই তারিখ দুটি দেওয়া হল। শালিখা অঞ্চলে ট্রাম উঠে যায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ আর শিবপুর অঞ্চলের ট্রাম উঠে যায় ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ (১৯৭০ সাল নয়) *।

* ট্রাম কোম্পানীর এই তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন সুপারভাইজিং ট্র্যাফিক অ্যাসিস্টেন্ট শ্রীপতিতপাবন বর্মন (ছেঁচে বর্মন)।

হাওড়ায় বাস—ট্রাম গাড়ির মতই কলকাতায় বাস চালু হবার বহু পরে হাওড়ায় বাস চলেছিল। ট্রামের মতই তখন বাস ঘোড়ায় টানতো। প্রথম ঘোড়াটানা বাস কলকাতায় চালু হয় ১৯২০ সালে। এই বাস চালু হবার পেছনে যে ইতিহাস আছে তা পড়ে পাঠক খুশিই হবেন। প্রসিদ্ধ নট অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (নিজেকে হারায়ে খুঁজি বইতে) বলছেন—'ততদিনে শহরে বেশ বাস চালু হয়ে গেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ, মহাত্মাজীর আন্দোলন ইত্যাদি একের পর এক যে সব ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে চারিদিকে মিটিং আর হরতাল খুবই হতো। ট্রাম কোম্পানীর ধর্মঘট তো লেগেই ছিল। এক সময় সালটা ঠিক আজ মনে নেই, ট্রাম ধর্মঘট বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ফলে অফিসে যাতায়াত করা কষ্ট হতে লাগল মানুষের। সে জন্য যে সব অফিসে মাল বহার লরী ছিল তাতে বেঞ্চি পেতে তাঁদের বাবুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। মালবাহী লরী—উঁচু তার পাটাতন, ছেলে ছোকরারা লাফিয়ে উঠতো। কিন্তু মধ্যবয়সী যাঁরা একটু বা মোটা হয়েছেন ভুঁড়ি হয়ে গেছে বেশী তাঁদেরই হতো অসুবিধা।...

মাল বইবার জন্য যাদের ছিল লরীর কারবার তারা বেশ এই সুযোগে লরীগুলিতে বেঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে যাত্রী বইবার লাইসেন্স বার করে নিল।[৬] এর পরই রাস্তায় বাস চলতে লাগলো। কলকাতায় বিখ্যাত Walford কোম্পানীর পরিচালনায় বড় বড় বাস নিয়মিত চালু হ'লেও তার আগেও কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলকাতার রাস্তায় বাস চলতো। 'কলকাতা দর্পণে' রাধারমণ মিত্র লিখেছেন: 'দেখতে দেখতে (Walford কোম্পানীর আগে) কলকাতার রাস্তায় বিচিত্র সব নামকরা বাসের আমদানী হ'ল। মেনকা, কিন্নরী, উর্বশী, পথের বন্ধু, চলে এসো ও আমি যাচ্ছি, এসব।' নামগুলি থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি হয়তো সবই এদেশীয়দের দ্বারা চালু হয়েছিল।

তবে ডবল ডেকার বাসের প্রবর্তন করেছিল Walford Transport কোম্পানী ১৯২৬ সালে। অবশ্য সেগুলি আজকের মত ছাউনি যুক্ত ছিল না। 'কলকাতা দর্পণে' তারও এক মজাদার বিবরণও দেওয়া আছে। তাতে লেখা হচ্ছে: 'গ্রীষ্মের সময় প্রচুর লোক হাওয়া খেতে বাসে উঠতো। কালীঘাট থেকে এক বাসে শ্যামবাজার গিয়ে, আবার ঐ বাসেই কালীঘাটে ফিরে আসা—এ তখন ছিল বহু লোকের শখ।

এবারে হাওড়ার কথায় আসা যাক। হাওড়ায় ঠিক কত সালে বাস চলেছিল তার সঠিক তারিখ সাল জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালে হাওড়ায় প্রথম বাস চলে। এ বাস চলা নিয়েও দুটি মত আছে—একদল বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে রামরাজাতলা ও হাওড়া স্টেশনের মধ্যে। এই বাস চালান রামরাজাতলারই বাসিন্দা—রায় এণ্ড কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

অপরপক্ষে আরেকদল বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে হাওড়া থেকে শালকিয়াতে। শালকেতে প্রথম যে বাস চলেছিল তার নাম 'মহাবীর'।

বাবুডাঙ্গার ঘোষাল বাগানের বাসিন্দা ভোজনাগরওয়ালা নামে জনৈক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট (ভায়া জি. টি. রোড) ঐ বাসটি চালান। (মতান্তরে মহাবীর বাসের মালিক ছিলেন তরণী দাস কালীপদ দাসের জামাই।) ঐ বাসটির আসন সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরটি। এই মালিকেরই অপর দুটি বাস ছিল **Orange William** ও **Napolean** নামে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের ব্যবসা বেশিদিন চললো না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী **S.T.A.** কোম্পানীর অর্থাৎ **Salkia Transport Agency**-র আবির্ভাব। এই কোম্পানীর মালিক নন্দকুমার সিংহ শালিখার একজন প্রাচীন বাসিন্দা। এই কোম্পানী যেমন বহুদিন চলেছিল তেমনি এই ব্যবসায়ে তাঁদের সুনামও ছিল। এর কারণও অবশ্য আছে। এই বংশের রাম সিং চৌধুরী নিজ বাসভূমি পাঞ্জাব থেকে এখানে এসে প্রথমে গরুগাড়ি, ঘোড়াগাড়ি ও উটেরগাড়ি মাধ্যমে মাল চলাচল করতেন। এমনকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক বিলি পর্যন্ত তখনকার দিনে এঁরা করতেন। সুতরাং নন্দকুমার সিংহ মশায়ের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা এই ব্যবসায়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই কোম্পানীর ব্যবসা এত উন্নতি করেছিল যে, এক সময়ে এঁদের অধীনে একান্নটি বাস বিভিন্ন লাইনে চলতো। বেশ কয়েক বছর হ'ল এই কোম্পানীটি উঠে গেছে। বাসের ব্যবসা ছাড়া এঁদের যাত্রীবাহী জাহাজও ছিল। মাত্র সাড়ে আট টাকায় ডেকেতে (খাওয়া সমেত) কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে যাওয়া যেত। এঁদের দেখাদেখি বাবুডাঙ্গার শিবচন্দ্র ঢ্যাং 'কার্তিক' ও 'গণেশ' নামে দু'খানি বাস হাওড়া স্টেশন থেকে বালিখাল পর্যন্ত চালিয়েছিলেন।

আজ হাওড়া শহরে বাসের রুট ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে হাওড়া শহর শালিখাতেই যে প্রথম বাস চলেছিল এই অনুমানকে একেবারে নস্যাৎ করাতো যাচ্ছেই না বরং এই দাবিই বেশি গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়। হাওড়ার বাসরুটের নম্বরগুলির দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তা হ'লে দেখা যাবে যে, ৫১ থেকে বাসের রুট নম্বর করা হয়েছে। ৫১নং বাস হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট হ'য়ে বালিখাল—বর্তমানে ডানলপ পর্যন্ত হয়েছে। এরপরই কিন্তু ৫২নং বাস শালকিয়ায় পর্যায়ক্রমে না হ'য়ে রামরাজাতলা রুটে দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে ৫৩ (এখন নেই) ও ৫৪নং বাস যথাক্রমে পঞ্চাননতলা ও বালি পর্যন্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে। এভাবে ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৩ প্রভৃতি রুটের বাসগুলি চলতে থাকে। এই বিচারে শালকিয়ায় যে প্রথম শহরে বাস চলেছিল তা স্বীকার করতে হয়।

১. পূর্ব রেলের পথে পথে—আশিস কমল সরকার।
২. হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বসুমতী—১৩৪১ সন।
৩. হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বসুমতী—১৩৪১ সন।
৪. Howrah civic Companion—S. Bonnerjee.
৫. ঐ ঐ
৬. রাধারমণ বাবুর মতে ১৯২২ সনে প্রথম কলকাতায় যাত্রীবাহী বাস চালু হয়।

ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের পূর্বে এখানকার মন্দির ও মসজিদগুলিই ছিল অক্ষর পরিচয়ের কেন্দ্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে সংস্কৃত বা ধ্রুপদী ভাষার তেমন কোন চর্চা ছিল না সেখানেই অর্থাৎ শালিখা ও ঘুষুড়িতেই ইংরেজি শিক্ষার পত্তন হল সারা জেলার মধ্যে প্রথম। এর কারণই বা কি হতে পারে? মনে হয়, শালিখা ও ঘুষুড়ির এই অঞ্চলটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ায় এবং এখানে সমুদ্রগামী জাহাজের মেরামতী কেন্দ্র ছিল বলে বাণিজ্যিক জাহাজে বিদেশী লোকলস্কররা শহরের এই অংশে থাকার উপযোগিতা বেশি করে উপলব্ধি করেছিল। তাই নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এবং কয়েকজন মিশনারী পাদ্রী শিক্ষা বিস্তারের কল্যাণ চিন্তার দিক থেকেও হয়তো তাঁরা এই অঞ্চলে ইংরেজি ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর সঙ্গে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল।

১৭৮৫ সালে জেলার প্রথম প্রাথমিক ইংরেজি স্কুল শুরু হয় বর্তমান কালেক্টরেট অফিস প্রাঙ্গণে। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নাম ছিল The Bengal Military Orphan Asylum. বেঙ্গল আর্মির নিহত সৈনিক সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই মূলতঃ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। এই স্থানটি লেভেট (Levet) সাহেবের বাগান বাড়ি ছিল।[১] এখানে প্রায় পাঁচশ অসহায় ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করত।[২] যদিও এই বিদ্যালয়টি ১৭৮২ সালে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল। এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজ সরকার অর্থ সাহায্যও করতেন। এখানে মেয়েদের সূচীশিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল।

এদেশে শিক্ষাবিস্তারে শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদের অবদানের কথা আমাদের জানা আছে। এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে The Baptist Missionary Society নামে একটি পাদ্রী সংস্থা ১৭৯৩ সালে জেলায় প্রথম এদেশীয় বালক-বালিকাদের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে।[৩] এই স্কুলগুলিকে 'বাজার স্কুল' বলা হত। পরে ১৮৩০ সালে ঐ সংস্থারই উদ্যোগে আরও দুটি বাংলা মাধ্যম স্কুল মনিটারিয়েল প্রথায় স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে একটি ছিল এদেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ও অপরটি ছিল অখ্রীষ্টীয় ভারতীয়দের জন্য।[৪]

হাওড়ায় প্রথম বসবাসকারী Statham নামে জনৈক মিশনারী পাদ্রী ১৮২১ সালে এই শহরে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। যদিও সেটি কয়েক বছর যেতে না যেতেই উঠে যায়। এইভাবে ১৮২৪ থেকে ১৮২৭ সালের মধ্যে মিশনারীরা শালিখা, ঘুষুড়ি ছাড়া শিবপুর ও ব্যাঁটরাতেও বাংলা স্কুল গড়ে তোলেন। T. Morgan নামে অপর এক পাদ্রী ঘুষুড়িতে একটি অবৈতনিক স্কুল

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটিও ষোল বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।[৫] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ সব স্কুলই ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই দুই পাদ্রীর স্কুলেই ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বালকেরাই কেবলমাত্র (বালিকারা নয়) পড়ত।[৬] ওপরের আলোচিত স্কুলগুলি কিন্তু প্রায় সবকটিই শালিখার সীমানায়ই অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত বা ধ্রুপদী ভাষার চর্চাকেন্দ্র হিসেবে শালিখার খ্যাতি নারীট, ভুরশুট, রসপুর, খুরুট, বালি, বেলুড়ের মত উল্লেখযোগ্য না হলেও আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার প্রথমকেন্দ্র কিন্তু স্থাপিত হয়েছিল এই শালিখায়ই। হাওড়া ময়দান ও কোর্ট এলাকা প্রথম শালিখার সীমানাই ছিল। এতক্ষণ সংক্ষেপে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কথাই আলোচনা করা হল। জেলায় কবে কোথায় প্রথম ইংরেজী মাধ্যমিক স্কুল তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে বিভিন্নরকম মতামত ও তথ্য পাওয়া যায়। জেলার প্রাচীনতম মাধ্যমিক ইংরেজী স্কুল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জেলা স্কুলকেই প্রথম মাধ্যমিক স্কুল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এই সরকারী বিদ্যালয়টিও কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম শালিখায়ই। হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের লেখক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—'On November 16, 1845, the District Magistrate of Howrah received 190 petitions from Hindu parents for opening a Government School in Howrah town, which was started on December 1, 1845 with his active support. বিদ্যালয়টির সূচনা কোথায় হয়েছিল তা অবশ্য তিনি উল্লেখ করেননি। কিন্তু গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের স্মারক গ্রন্থ (১৯৪৮) লিখছে—'১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন নুন গোলার পূর্বে একটি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করা হয়। গঙ্গার ধারে গোলাবাড়ী থানার পেছনে এই নুনগোলার অবস্থিতি আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।' এই ব্যক্তব্যটিই যে যথার্থ তা অবশ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজ লেখনীতেও ফুটে উঠেছে। তিনি তারপরই লিখছেন—'The school house was built in 1847 on a $2\frac{1}{2}$ bigha plot of land near the Howrah Maidan. In 1858 the first batch of students was sent up for the Entrance Examination of the University of Calcutta....... This institution, named later as the Howrah Zilla school. সুতরাং প্রথমেই যে এই স্কুলটির নাম হাওড়া জেলা স্কুল ছিল না এবং বর্তমান স্থানেও যে প্রথম উহা স্থাপিত হয়নি তা বেশ পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। এই স্কুলের প্রথম বাঙ্গালী প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৪৯—১৮৫৬ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন কবি করুণানিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ এনামুল হক ও অধ্যাপক মহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রমুখ কৃতী শিক্ষকগণ। অপরপক্ষে কৃতী ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখ্য—নরসিংহ দত্ত (যাঁর নামে হাওড়ার প্রথম কলেজ) চারুচন্দ্র সিংহ

(হাঃ পৌরসভার চেয়ারম্যান), প্রসিদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী প্রমুখ।[৭] এই স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে ছাত্রটি সর্বপ্রথম প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁর নাম ছিল মাখন লাল দে। সাল ১৮৯৯। পরে এই মাখনবাবুই নাগপুর সরকারী কলেজে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োজিত হন। এক সময়ে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শালিখার অধিবাসী বেণীমাধব দে। সুবর্ণবণিক সমাজের মধ্যে তিনিই ছিলেন নাকি প্রথম এম. এ। পরে তিনি স্কুল ইনস্পেক্টারও হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি হুগলী ডকের সামনে একটি বাড়ীতে শেষ জীবন কাটান।[৮]

এরপর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম বলা হবে তা হচ্চে বর্তমান শালকিয়া এ. এস. হাই স্কুল। সর্বপ্রথম এই স্কুলটির নাম ছিল শালকিয়া অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল। ১৮৫৫ সালে পুণ্য 'আমবারুণী' তিথিতে বিদ্যালয়টি মাত্র পাঁচটি ছাত্র নিয়ে বিদ্যোৎসাহী ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয় (যাঁর নামে ক্ষেত্র মিত্র লেন) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তারও দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়। বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র হাওড়া কোর্টের একজন মোক্তার ছিলেন। পরে কবে বা কখন এই স্কুলের নাম শালকিয়া অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল হ'ল তার কোন প্রামাণিক তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। তবে ক্ষেত্রমোহনের সহৃদয় লালন পালনে এই বিদ্যালয়টি আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে লাগল—তাই স্থানীয় লোকেরা এই বিদ্যালয়কে বহুদিন 'ক্ষেত্রমিত্রের স্কুল' বলত।

এই স্কুলের ছাত্ররা প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় ১৮৫৯ সালে। লক্ষণীয় যে, হাওড়া জেলা স্কুল ১৮৪৫ সালে স্থাপিত হলেও তার প্রথম ছাত্রদল এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বসে শালকে স্কুলের মাত্র এক বছর আগে অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে।[৯] কিন্তু জেলার মধ্যে ১৮৫২ সালে জগৎবল্লভপুর স্কুলের ছাত্ররা প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে জেলার শিক্ষার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শালকে স্কুলের যিনি প্রথম প্রধান শিক্ষক হলেন তিনি কোন ভারতীয় নন। তিনি ছিলেন একজন ইউরোপীয়—তাঁর নাম হল Grecian Thowet.[১০] এই বিদেশী প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে জেলার এই প্রাচীন অন্যতম বিদ্যালয়টির গৌরবের কথা কেবল গঙ্গার পশ্চিমপারেই সীমাবদ্ধ রইল না। ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালের সামান্য ব্যবধানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র যথাক্রমে রামকৃষ্ণ ঘোষ ও পার্বতীকুমার সরকার। এই ঘটনা দুটির মত আর কোন আনন্দ সংবাদের পুনরাবৃত্তি অবশ্য আজ পর্যন্ত শালিখাবাসীর ভাগ্যে জোটেনি।

শালকিয়া এ. এস. স্কুল সম্বন্ধে অমিয়বাবু আরও বলেছেন—বে-সরকারী প্রচেষ্টায় এবং ভারতীয় পরিচালনাধীনে জেলার প্রাচীনতম মাধ্যমিক বিদ্যালয় এটি। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে জেলার মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাস সংগ্রহ করতে গিয়ে

দেখা গেল যে এ মতের ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এমন কি শালকিয়া এ. এস. স্কুলের শতবার্ষিকী স্মরণীতেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এমন কোন বিশেষণও ব্যবহার করেননি।

পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে, হাওড়া শহরের পশ্চিম প্রান্তে আন্দুল নামক গ্রামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপনার্থে আন্দুলরাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের বিরাট বাগানবাড়িতে একটি বিদগ্ধ ও বিত্তশালীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে 'সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের প্রস্তাবানুসারে এবং তারকচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় ইস্কুলের নাম আন্দুল একাডেমি রাখা হইল।'[১১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ জুলাই ১৮৩৮ (১৪ শ্রাবণ ১২৪৫) ঐ পুস্তকে আরও লিখেছেন—'বর্তমান বর্ষের ১১ জুলাই বুধবার বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের সুখোদ্যান নামক স্থানের গৃহে ঐ আন্দুল এবং তন্নিকটবর্তী অনেকানেক গ্রামবাসী প্রধান ধনী-মানিগুণী সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহাসভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় শ্রীমন্মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রভৃতির লিপ্যনুসারে শতাধিক সম্ভ্রান্ত সভ্যের সমাগম হইয়াছিল।'[১২]
এই 'আন্দুল অ্যাকাডেমি' পরবর্তীকালে Andul H. C. (Higher Class) English School নামে পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু Andul H. C. (Higher Class English School-টি যে বর্তমান মহিয়াড়ী কুণ্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশন তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্কুলের পুরাতন প্রসপেক্টাসে যে সিলমোহর সহ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে পরিষ্কার লেখা আছে—১৮৪১ খ্রীঃ আন্দুলরাজ রাজনারায়ণ রায় এবং মহিয়াড়ীর জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের প্রচেষ্টায় মহিয়াড়ীতে Andul H. C. (Higher Class) English School নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই স্কুলটির শতবর্ষ পালিত হতে পারেনি দুটি কারণে, যেমন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও গ্রামীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আরও উল্লেখ্য, একদা এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন 'বাঙ্গালার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেঠামশায় দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাসিক বেতন ছিল ২ টাকা।[১৩] আলোচনান্তে হাওড়া জেলার উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাচীনত্বের ইতিহাস এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে গেল।
এরপর দেখা যাচ্ছে যে, জেলার গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য অংশেও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গড়ে তোলার উৎসাহজনক সাড়া পড়ে গেল। বাগনানের খাদিনান গ্রামে ১৮৫৪ খ্রীঃ হেমচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় তৈরি হল 'বাগনান হাইস্কুল'। ১৮৫৫ খ্রীঃ শহরে আরও দুটি ইংরেজী স্কুল একই বছরে স্থাপিত হল। এর মধ্যে শালকিয়া এ. এস. স্কুল ও বেলুড় হাইস্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলুড় হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক চেষ্টায়। সঙ্গে ছিলেন কতিপয় খ্রীষ্টান মিশনারী ও কতিপয় বিদ্যোৎসাহী গ্রামবাসী।[১৪]
তাই হয়তো নলিনচন্দ্র সরকার 'বিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশ বিবরণী'তে লিখেছেন—

'প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও বৈষ্ণব চূড়ামণি লালাবাবুর পূত পদরজস্পর্শে বেলুড় উচ্চ বিদ্যায়তন তীর্থে পরিণত হয়েছে।'[১৫]

ইতিমধ্যে জগৎবল্লভপুর হাইস্কুল গড়ে উঠল ১৮৪৬ খ্রীঃ এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় ছাত্ররা। ১৮৫৬ খ্রীঃ বলুটি গ্রামে বলুটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন উত্তরপাড়ার দানবীর জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এইভাবে গড়ে উঠল গ্রামে ও শহরে অনেক স্কুল যার মধ্যে রয়েছে আমতা পীতাম্বর হাই (১৮৫৭), রামকৃষ্ণপুর হাইস্কুল (১৮৬২), মেকলে (অধুনা বালী) বালিকা বিদ্যালয় (১৮৬৪), মুগকল্যাণ হাই (১৮৬৬), গড় ভবানীপুর আর. পি. ইনস্টিটিউশন (১৮৬৭), শিবপুর হিন্দু বালিকা (১৮৬৭), মহিয়াড়ী বাংলা (অধুনা হাই) স্কুল (১৮৬৮), খোরোপ হাই (১৮৭০), শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (১৮৭৪), রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৭৬), বি. কে. পাল ইনস্টিটিউশন (১৮৭৭) রসপুর উচ্চ বালিকা (১৮৭৮), জয়পুর ফকিরদাস ইনস্টিটিউশন (১৮৮০), মাজু আর, এন. বসু হাই (১৮৮৩), উলুবেড়িয়া হাই (১৮৮৪), পানপুর শশিভূষণ হাই (১৮৮৫), রিভার্স টমসন স্কুল (অধুনা শান্তিরাম বিদ্যালয়) (১৮৮৫), নারীট ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশন (১৮৮৫), ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী হাই (১৮৮৬), হাওড়া রিপন কলেজিয়েট (অধুনা অক্ষয় শিক্ষায়তন) (১৮৮৬), টাউন স্কুল (১৮৯০)।

উপরিউক্ত তালিকার উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে শহরাঞ্চলে মেকলে বালিকা এবং গ্রামাঞ্চলে রসপুর বালিকা বিদ্যালয় জেলায় মেয়েদের জন্য প্রথম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস সৃষ্টি করে আজও নজির হয়ে আছে। যদিও ভারতীয় পরিচালনায় প্রথম ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সাঁত্রাগাছিতে ১৮৬৩ খ্রীঃ আজ সেটি নেই। আর একটি স্মরণ করার বিষয় এই যে মহিয়াড়ী বাংলা (হাই) স্কুলটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতেই প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবিদ্যালয়'গুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এরকম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বালি (১৮৬৭), কুমারটুলী প্রভৃতি স্থানে। গড় ভবানীপুর আর. পি. ইনস্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও পরামর্শে স্থানীয় জমিদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাওড়া জেলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রিপন কলেজিয়েট স্কুল সম্বন্ধেও দু'চারটি কথা আলোচনা করা দরকার। এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব সমাজের সবক্ষেত্রেই যে কিরূপ ছিল তা উল্লেখের কোন অপেক্ষা রাখে না। হাওড়াতে তিনি যখন এই স্কুলটি নিজের হাতে তৈরি করে নিজেই পড়াতে লাগলেন তখন পাশের অন্যান্য স্কুলগুলিতে গেল গেল রব উঠে যায়। বিভিন্ন স্কুল থেকে ছেলেদের অভিভাবকরা ছাড়িয়ে নিয়ে সুরেন্দ্রনাথের স্কুলে ভর্তি করাতে লাগলেন। সবার মুখেই এক কথা স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ যেখানে

পড়াচ্ছেন সেখানে ছেলে পড়ানোই শ্রেয়ঃ। শালকিয়া এ. এস. স্কুলের অত নাম থাকা সত্ত্বেও ছেলেরা ছেড়ে গিয়ে রিপন স্কুলে ভর্তি হতে লাগল। তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণী থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি লিখছেন—The Ripon Collegiate School was established at Howrah. The name of the founder (Sir Surendra Nath Banerjee) worked like a charm. Students from all quarters flocked to his school.···the institution that suffered most was the Salkia A. S. School, the premier school of the district. Boys left the school by scores··· Now the condition of the School can better be imagined than described. But it is a pleasure to note that some there were who were faithful among the faithless and clung fast to their Alma Mater.

শুধু শালকিয়া এ. এস. স্কুলই নয়। খোদ সরকারী হাওড়া জিলা স্কুল পর্যন্ত নড়ে উঠল। যাতে সরকারী স্কুল থেকে ছেলে না যায় তার জন্য জিলা স্কুল ছেলেদের মাইনে কমিয়ে দিল। স্কুলটি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তুলে দিল আর্থিক দায়িত্ব বহনের জন্য। 'নগর হাওড়া' গ্রন্থের লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—'১৮৯০ সালেই সরকার তার ১২ই মার্চ তারিখের ১৮৮নং আদেশ বলে জেলা স্কুলের দায়িত্ব হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির হাতে দেয়। তিনটি শ্রেণীতে মাহিনার হারও কমিয়ে দেওয়া হয়।' সুরেন্দ্রনাথ সরকারের এই প্রতিহিংসা-পরায়ণ কাজের প্রতিবাদ করে সরকারী দপ্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথকে কাবু করতে পারা যায়নি। এই স্কুলেরই ১৯১০ সালের দুই কৃতী ছাত্র হচ্ছেন Logic বইয়ের লেখক বিখ্যাত ভোলানাথ রায় এবং অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

এবারে আসা যাক বিদেশী চার্চ কর্তৃক পরিচালিত St. Thomas' Church School সম্বন্ধে। এই স্কুলটি ১৮৬০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও পর্যন্ত তার নিজ অস্তিত্ব মর্যাদার সঙ্গে বজায় রেখে চলেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রেভারেন্ড ডঃ উইলিয়াম স্পেন্সার। ভারতে ১৮৫৮ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়া ঘোষণাপত্র জারী হবার পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীঃ হাওড়া চ্যাপেলের প্রধান হয়ে এদেশে আসেন। এখানে আসার বছর দেড়েকের মধ্যেই তিনি ১৮৬০ খ্রীঃ এই ইংরেজি স্কুলটি স্থাপনা করেন।[১৬] স্কুলটি এদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সন্তানদের শিক্ষা দেবার জন্য স্থাপিত হলেও আজ এখানে সব ধর্মের সর্বজাতির জন্যই তার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।* জেলার হিন্দীভাষী স্কুলের মধ্যে শালকিয়া সত্যনারায়ণ মাধব মিশ্র বিদ্যালয় (১৯১০) তার প্লাটিনাম জয়ন্তী পূরণ করল। সাঁত্রাগাছির কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন (১৯২৫) শতবর্ষে পা না দিলেও একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-তে) ঐ স্কুলের শিলান্যাস করেছিলেন।[১৭] কোনা স্কুলটি ১৮৭৮ সালে

প্রতিষ্ঠা হলেও মাত্র ১৯৭৮ সালে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বালি বারাকপুর জুনিয়ার হাইস্কুলটি ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও আজও সেটি শতবর্ষ পার হয়েও সাবালকত্ব লাভ করেনি। তাই জুনিয়ার স্কুলই থেকে গেল।

জেলার শতবর্ষের ইংরেজি হাইস্কুলগুলির নাম উল্লেখ করলেও এদের মান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ভালই লাগবে বলে মনে হয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে হাওড়া জেলা স্কুলের ছাত্র মাখনলাল দে ১৮৯৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন, শালকিয়া এ. এস. স্কুলের ছাত্র রামকৃষ্ণ ঘোষ ও পার্বতী কুমার সরকার যথাক্রমে ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী)।

অপরপক্ষে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন (১৯২২) স্থাপিত হয়েও ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন দেবীচরণ খাঁ। আর ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন ঐ স্কুলেরই ছাত্র বরুণ চক্রবর্তী। ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র কিংশুক পালধি। এছাড়া পুরাতন হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষাগুলিতে এই স্কুলটি থেকেই টেক্‌নিক্যাল গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ হয়ে যাঁরা জেলায় এক নূতন নজির সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে দেবব্রত হোড় (১৯৬৫), অরুণ কুমার চক্রবর্তী (১৯৬৭) এবং মলয় মুখোপাধ্যায় (১৯৬৮)।[১৮] এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য ভারত সরকার কর্তৃক 'জাতীয় শিক্ষক'রূপে (National Teacher) ১৯৬৩ সালে জেলার মধ্যে প্রথম পুরস্কৃত হন। আজ পর্যন্ত জেলার আর কোন শিক্ষক এই সম্মান লাভ করেননি। শালকিয়া হিন্দু হাইস্কুলের ছাত্র সুচিত্র খাঁ ১৯৬০ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান (কলা বিভাগে) অধিকার করে বিদ্যালয়ের ও জেলার সারস্বত সাধনায় সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

এক্ষেত্রে একটি গ্রামের স্কুলের কৃতিত্বও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের কাছে থানা মাকুয়া মডেল হাইস্কুলের ছাত্র প্রণব বিশ্বাস ১৯৬৯ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে জেলার নাম উজ্জ্বল করে রাখতে সাহায্য করেছেন।

কলেজীয় শিক্ষা ক্ষেত্রেও হাওড়া জেলার ইতিহাস কম গৌরবময় নয়। যদিও সেই গৌরবের পুরো কৃতিত্বই ইংরেজ মিশনারীদের। উচ্চশিক্ষা প্রসারে বিশপস মিডলটনের কাজে উৎসাহ যোগাবার জন্য ১৮২০ সালে তদানীন্তন সরকার তাঁকে বাযট্টি বিঘা জমি দান করেন।[১৯] ১৮২০ সালে কলেজের নির্মাণকার্য শুরু হলেও শিক্ষাদান শুরু হয় ১৮২৪ সালে।[২০] এই কলেজই একদা মধুকবি মাইকেল

মধুসূদন দত্ত (১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ খ্রীঃ) ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করেন। আর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজেই অধ্যাপনা করেন ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ খ্রীঃ পর্যন্ত। এখানে একটি বিশেষ ঘটনা বলা প্রয়োজন।

বিশপস-কলেজের নিয়ম ছিল, যে কোন এদেশীয় ছাত্র খ্রীষ্টান হলেও ঐ কলেজে পড়ার অধিকার পাবে না। অথচ মাইকেল মধুসূদন খ্রীষ্টান হবার পরে হিন্দু কলেজ ছেড়ে বিশপস-কলেজে ভর্তি হতে চান। কিন্তু কলেজের নিয়ম ছিল অন্তরায়। এই ব্যাপারে জনৈক মহেশচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টান্ত মধুসূদনকে ঐ কলেজে পড়তে বিশেষ সাহায্য করেছিল। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনায় হাওড়ার ভূমিকা' নামক পুস্তিকায় অচল ভট্টাচার্য লিখছেন—"১৮৩২ খ্রীঃ ২৭শে আগষ্ট বিশপস কলেজের কাউন্সিলের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়।...মহেশ চন্দ্র ঘোষ নামে হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে বিশপস কলেজে ভর্তি হতে চান। এর আগে কোন দেশীয় ছাত্রকে বিশপস কলেজে ভর্তি করা হয়নি—কেউ ভর্তি হতে চায়নি। অনেক যুক্তি-তর্কের সিঁড়ি ভেঙে কলেজ কাউন্সিল অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন এবার থেকে কলেজে দেশীয় ছাত্রদেরও ভর্তি করা হবে।...মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন এই সংবাদে কলকাতা শহরে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পিতা রাজনারায়ণ পুত্রের এই কাজে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একদল লাঠিয়াল পর্যন্ত সংগ্রহ করেছিলেন।" মধুসূদনের জীবনে এই কলেজের প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষ লিখছেন—বিশপস কলেজে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এখানকার অধ্যাপকগণও মধুসূদনের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পরে এই কলেজটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ঐ বাড়িতে আজকের বি. ই. কলেজ চলছে। যদিও এই বি. ই. কলেজ সর্বপ্রথমে চালু হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রীঃ বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। পরে ১৮৮০ খ্রীঃ কলকাতা থেকে বি. ই. কলেজ শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়। এর পরই ভারতীয় তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় জেলার সর্বপ্রথম কলেজ হচ্ছে নরসিংহ দত্ত কলেজ। দানবীর বেলিলিয়াস সাহেবের বাগান বাড়ির ঘরেতে এই কলেজটি ১৯২৩ খ্রীঃ স্থাপিত হয়।

এরপর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে বেলুড় বিদ্যামন্দির (১৯৪০-৪১), আমতা রামসদয় কলেজ (১৯৪৬) ও হাওড়া গার্লস কলেজ (১৯৪৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। হাওড়ার একমাত্র মহিলাদের এই কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তাঁরই হাতে গড়া আর একটি কলেজ হচ্ছে শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ। হাওড়া গার্লস কলেজের বর্তমান নাম বিজয়কৃষ্ণ কলেজ। এরপর দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে জেলার গ্রামে ও শহরে আরও কিছু সংখ্যক কলেজ স্থাপিত হয়—যেমন শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ (১৯৪৮), উলুবেড়িয়া কলেজ (১৯৪৮-৪৯), বাগনান কলেজ (১৯৫৮), শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী

মহাবিদ্যালয় (১৯৬৪), প্রভু জগবন্ধু কলেজ (১৯৬৪), লালবাবা কলেজ (১৯৬৪) ও পুরেশ কানপুর কলেজ। সাম্প্রতিককালে জগৎবল্লভপুরের শোভারাণী ও জয়পুর কলেজের প্রতিষ্ঠা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আরও সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। কৌতূহল জাগতে পারে যে উচ্চশিক্ষা প্রসারে হাওড়া জেলার উদ্যম এত দেরীতে শুরু হল কেন ? মনে হয়, কলকাতার সান্নিধ্যই হাওড়াকে এই প্রয়োজন মেটাতে ততটা উদ্যোগী হতে বিরত রেখেছে। প্রসঙ্গত, এই একই কারণে স্বাধীনতার আগে তদানীন্তন ২৪-পরগনা জেলায় কোন কলেজ স্থাপিত হতে পারে নি।

জেলার স্কুল-কলেজের ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যদি পাঠাগারের ইতিহাস একটু আলোচিত না হয় তা হলে সারস্বত সাধনার কেন্দ্রগুলির অঙ্গহানি হবে বলে মনে হয়। কারণ, পাঠাগার হচ্ছে স্কুল কলেজের পরিপূরক সংস্থা। ইউনেসকোর ম্যানিফেস্টোতে (১৯৪৯ সালে) পাঠাগারকে বলা হয়েছে 'Living Force of Popular Education'. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে হচ্ছে 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়'। এই সত্য বিদ্যোৎসাহী হাওড়াবাসী বুঝেছিলেন বলেই হয়তো স্কুল-কলেজের পাশাপাশি পাঠাগারও স্থাপন করেছিলেন জ্ঞানার্জনের পরিপূরক কেন্দ্ররূপে।
জেলার প্রাচীনতম গ্রন্থাগারটির নাম হচ্ছে শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী। এটি স্থাপিত হয় ১৮৭৪ খ্রীঃ স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায়। অপরপক্ষে জেলার প্রথম গ্রামীণ পাঠাগার স্থাপিত হয় ১৮৮৩ খ্রীঃ রসপুর পিপলস লাইব্রেরী। পরের বছর ১৮৮৪ খ্রীঃ তৈরি হল ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী। ১৮৮৫ খ্রীঃ বালি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হল*। ১৮৮৬ খ্রীঃ স্থাপিত হল আন্দুলের মহিয়াড়ী সাধারণ পাঠাগার। এর অনেক বছর পর ১৯০২ খ্রীঃ স্থাপিত হল মাজু পাবলিক লাইব্রেরী। এর দশ বছর পর ১৯১২ খ্রীঃ স্থাপিত হল শালকিয়ার গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ লাইব্রেরী এবং তারও পরে ১৯১৭ খ্রীঃ শালকিয়ার মাধব মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। এছাড়া বড় পাঠাগারের মধ্যে আছে ডিউক লাইব্রেরী (১৯১৪) এবং শিবপুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী।
এইসব পাঠাগারগুলির বেশীর ভাগই বিদ্যোৎসাহী ও সমাজসেবী ব্যক্তিদের গোষ্ঠী অথবা যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। তবে এটাও সত্য যে কতিপয় পাঠাগার বিদ্যোৎসাহী জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্যমে গড়ে উঠেছিল যেমন মহিয়াড়ী সাধারণ, মাধব স্মৃতি ও ডিউক পাঠাগার ইত্যাদি।
শালকিয়ার একটি মাঝারি ধরনের পাঠাগারের উল্লেখ একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। সেটি হচ্ছে বিষ্ণুপদ পাঠাগার। ১৯৩৪ সালে এটি প্রথমে শিশু পাঠাগাররূপে স্থাপিত হলেও পরে সাধারণ পাঠাগারেই পরিণত হয়। ১৯৬০ সালে পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে পাঠক বইয়ের কাছে যাবে না—বইই যাবে পাঠকের কাছে।

* অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পাঠাগারটি সম্বন্ধে The second oldest library in the district লিখে ঠিক করেননি।

সেইমত ঐ বছরের ১লা সেপ্টেম্বর পাঠাগারের একটি ভ্রাম্যমাণ শাখার উদ্বোধন করলেন তদানীন্তন হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্মলকুমার মুখার্জী। উদ্যোগটি যে খুবই অভিনব ছিল তা বুঝতে পারা যাবে পরের দিন সংবাদপত্রের একটি সংবাদ থেকে। The Statesman পত্রিকা লিখছে—'First of its kind in West Bengal. It is meant for only ladies and invalid people'. এই পাঠাগারটির পেছনে পান্নালাল আটা, শচীন্দ্রনাথ বসুমল্লিক ও হেমন্তকুমার ভট্টাচার্যের শ্রম ও নিষ্ঠা স্মরণ করার মত। বর্তমানে পাঠাগারটি সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

এই পরিচ্ছেদটি একটি অজানিত অথচ চমকপ্রদ ঘটনা দিয়ে উপসংহার টানতে চাই। কালে এটি একটি ঐতিহাসিক নজির হিসেবে উল্লিখিত হবে বলে আশা রাখি। ঘটনাটি ঘটেছিল শালকিয়া এ. এস. স্কুলের দশম শ্রেণীর কক্ষে। ১৯৩৬ সাল। সুনীল চন্দ্র সরকার নামে জনৈক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য স্নাতক হয়ে স্কুলে যোগ দিয়েছেন। তখনকার দিনে দশম শ্রেণীতে বাংলা সিলেকসনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরিণী' নামে একটি কবিতা পাঠ্য ছিল। শ্রীসরকার ঐ কবিতাটি পড়াতে গিয়ে যে ব্যাখ্যা করলেন তার প্রতিবাদ হল ঐ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মেধাবী ছাত্রদের পক্ষ থেকে। এদের প্রতিবাদের কারণ ছিল এই যে উক্ত কবিতাটির ব্যাখ্যা স্কুলের তদানীন্তন জনৈক প্রবীণ ও খ্যাতনামা বাংলা শিক্ষক নীলরতন আঢ্যের ব্যাখ্যার বিপরীত ছিল বলে। বলা বাহুল্য, সেই যুগে উক্ত প্রবীণ শিক্ষকের বাংলা-সাহিত্য জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে ছাত্ররা সন্দেহাতীত ছিল। ফলে যুবক ও নবীন শিক্ষক সুনীলবাবুর ব্যাখ্যাটি তাদের মনঃপূত হল না। সুনীলবাবুও মহাবিপদে পড়লেন। প্রবীণদের সঙ্গে বাদানুবাদে না গিয়ে সোজা বিশ্বকবিকেই এক পত্রাঘাত করলেন। পাঠকের অবগতির জন্য সুনিলবাবু ও রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠিই ছেপে দেওয়া হল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার বিনীত প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার একটি কবিতা সম্বন্ধে ছাত্র ও শিক্ষক মহলে কিছু উদ্বেগ, কলহ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপারটা সামান্য হলেও হয়ত আপনার সামান্য একটু মনোযোগের অযোগ্য নয়। এই ভেবে এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহসী হলুম।

কবিতাটি হ'ল 'নির্ঝরিণী'—Calcutta University Matriculation পরীক্ষার্থী-দের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি স্কুলের ছেলেদের জন্যে নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন কিনা, সে আলোচনা করবো না। তবে আমি নিজে জানি, ঐ কবিতাটির ব্যাখ্যা নিয়ে বহু স্কুলেই শিক্ষকদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটেছে। বাজারের Notes Makers-রা তো কবিতাটি 'শেষের কবিতা' থেকে উদ্ধৃত এই অজুহাতে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক

শিক্ষক শুনতে পাই এই কবতাটির সঙ্গে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' জড়িত ক'রে এমনও বলেছেন যে ও কবিতাটি হচ্ছে নির্ঝরের সমুদ্র যাত্রার তুলনা। এ অর্থ করবার কোনও সঙ্গত কারণ আমি তো দেখি না। অবশ্য এ বিষয়ে কোন উৎকণ্ঠা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে না।

শুধু আমার নয়, অসংখ্য শিক্ষক ও ছাত্রের সুবিধার জন্য এই আমার নিবেদন যে, এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে একটু নির্দেশ পেলে কৃতার্থ হবো।

প্রার্থনা করি আপনার স্বাস্থ্য যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। ইতি—প্রণত—

সুনীল চন্দ্র সরকার

৩৩, জেলিয়াপাড়া লেন, সালকিয়া, হাওড়া

তাং ১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৬

এই চিঠি পেয়ে বিশ্বকবি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাও হুবহু পাঠকের অবগতির জন্য ছেপে দেওয়া হল।

সুনীলচন্দ্র সরকার

৩৩, জেলিয়াপাড়া লেন, শালকিয়া, হাওড়া

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

'শেষের কবিতা' গ্রন্থে 'নির্ঝরিণী' কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্ব প্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্ক লোকের ছায়া দোলে তার ঝরণার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে—তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের সঙ্গে মানব-চিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তাঁরই বাণী হয়ে উঠে। ইতি—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ই বৈশাখ ১৩৬৩

প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য, এই চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে 'নির্ঝরিণী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৩ সাল নিজ ব্যাখ্যা নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেন:

'শেষের কবিতা'য় নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি ঝর্ণার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক, তোমার মনে প্রতিবিম্বিত আমার ছবিটিকে

বাণী দাও, তোমার প্রেমের যে বাণী নিত্যকালের। অর্থাৎ তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সার্থক করো ; সত্য করো।
তোমার অন্তরে পড়ছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহ-বেগে, তার প্রেরণায় আমার যথার্থ স্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমার প্রকাশ রূপিণী বাণীকে।'
এক কথায়, এই কবিতার মর্মার্থ এই যে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মোপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
এই কবিতার অর্থ সম্বন্ধে কবির নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়। কিন্তু এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ রকম একটি জটিল কবিতাকে স্কুলের অপরিণত ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত ক'রে যে সুবিবেচনার পরিচয় দেননি (যা সুনীলবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেও মন্তব্য করেননি) তা তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেন। আনন্দের কথা অবশেষে ঐ কবিতাটিকে পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।
শুধু হাওড়া জেলায়ই নয় সম্ভবত বঙ্গদেশেই এটা এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই সুযোগে সুনীলবাবুর সঙ্গে বিশ্বকবির পরিচয় গাঢ় হয় এবং কবির আহ্বানে তিনি স্কুল ছেড়ে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। আমৃত্যু সেখানে যুক্ত থেকে শেষ জীবনে 'বিনয় ভবনের' (বি. টি. কলেজ) অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। আর যে মেধাবী ছাত্ররা সুনীল বাবুর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অতৃপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ঘোষ পরের বছর (১৯৩৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নিজে তৃপ্ত হন এবং শালিখাবাসীকেও তৃপ্তিদান করেন। অপর দুজন ছিলেন শীতলচন্দ্র পোড়েল ও সুশীলকুমার গাঙ্গুলী (সলিসিটর)।

১. L. S. S. O. Malley & Chakravorty—Howrah District Gzaetteers 1909.
২. C. N. Banerjee—Howrah Past and Present.
৩. W. B. District Gazetteers—Howrah—Amiya K. Banerjee.
৪. C. N. Banerjee—Howrah Past & Present.
৫. W. B. District Gazetteers—Howrah—Amiya K. Banerjee.
৬. ঐ ঐ
৭. হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮. স্মারক গ্রন্থ গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ ১৯৪৮।
৯. হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০. স্কুলের শতবার্ষিক স্মরণী ১৯৫৫।
১১. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২. ঐ ঐ ঐ

১৩. আশুতোষ স্মৃতিকথা—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ।

১৪. বেলুড় উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা—নব পর্যায়—১৯৮৩ ।

১৫. বেলুড় উচ্চ বিদ্যালয়ে শতবর্ষ জয়ন্তী উদ্বোধন উৎসব—১৯৫৬ ।

১৬. St. Thomas' Church School—125th Anniversary Volume.

* O'Malley & M. Chakravorty লিখেছেন—St. Thomas' School was opened in 1864.

১৭. হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা—১৯৮৫ সাল ।

১৮. বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা—১৯৭২ সাল ।

১৯. O'Malley & M. Chakravorty—Dist. Gazetteers. Howrah.

২০. প্রাগুক্ত ।

কবিগান, যাত্রা, থিয়েটারে—হাওড়া

বর্তমান যাত্রা-থিয়েটার যেমন উন্নত ও জনপ্রিয় হয়ে লোকের চিত্তবিনোদনের ও চিত্তশোধনের প্রধান আঙ্গিক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, মধ্যযুগে বাংলা দেশেও সেরকম লোক-শিক্ষা ও লোক-চিত্তবিনোদনের অঙ্গ হিসেবে ছিল কবিগান ও কথকতা ইত্যাদি। অবশ্য তার জাঁকজমক ও জৌলুস আজকের নাটক ও যাত্রার আসরের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে একথা সত্য যে, বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কবিয়ালদের কবিগানের মূল্য অসীম।

হাওড়ায় নাটক ও যাত্রার একটা অনুকূল আবহাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ বিষয়ে এই মাটির প্রাচীন ঐতিহ্য। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনান্তে দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের সার্থক কবিয়াল রাম বসু এই হাওড়া-রই শালিখার অধিবাসী ছিলেন। রাম বসুকে আধুনিক কবি গানের জনক বলে আখ্যা দেওয়া হয়।[১] রাম বসুর যুগেও বিশিষ্ট কবিয়ালদের মধ্যে ছিলেন ভবানী বেনে, ঠাকুরদাস সিংহ ও মোহন সরকার প্রমুখ কবিয়ালগণ। তথাপি তাঁরা রাম বসুকে দিয়ে উচ্চ মানের কবিগান রচনা করিয়ে নেবার জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে একদল কবিয়ালদের বলা হ'ত দাঁড়াকবি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিগান গাইতো বলে তাঁদেরকে দাঁড়াকবি বলা হত বলে একটা সাধারণ ধারণা আছে। কিন্তু সেই ধারণাটি নিতান্তই ভুল। এই ধারণা যে সর্বৈব ভ্রান্ত তার উল্লেখ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙ্গালী' গ্রন্থে। তাতে তিনি বলেছেন—'পাঁচালী যেমন পা-চালি থেকে হয়নি, দাঁড়াকবিও তেমনি 'দাঁড়ানো' থেকে আসেনি। 'পাঁচালী শব্দটি এসেছে 'পঞ্চালিকা' শব্দ থেকে। পঞ্চালিকা মানে পুতুল।' আসলে রাম বসুর পূর্বে দু'দল কবিয়ালই প্রশ্ন ও উত্তর আগে থেকেই গড়াপেটা করে আসরে অবতীর্ণ হতেন। ফলে আসর প্রথম প্রথম উপভোগ্য হলেও পরে অনেকটা পানসে হয়ে যেত। এমনও দেখা গেছে যে, নতুন করে প্রশ্ন উত্তর তৈরির জন্য আসরের সাময়িক বিরতি দিয়েও আবার আসর বসানো হত। প্রতিভাধর কবিয়াল রাম বসুই প্রথম যিনি আসরে দাঁড়িয়েই প্রতিপক্ষকে তাৎক্ষণিক প্রশ্নের জবাব দেবার পদ্ধতি চালু করেন। তা থেকেই দাঁড়াকবি কথা চালু হয়।' গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন—আসরে বসে প্রতিপক্ষের জবাব দেবার প্রথা প্রচলন করেন তিনিই (রামবসু) প্রথম।[২] এটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল কারণ, তিনি একজন উঁচু স্তরের কবিয়াল ছিলেন বলে। সংবাদ প্রভাকর লিখছে—ইনি 'জন্ম কবি' ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন।[৩]

এই রাম বসুই শালিখায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ

করেন। পুরো নাম রামমোহন বসু (কেউ কেউ রামচন্দ্র বসুও বলেন)।[৪] সাধারণভাবে তিনি রাম বসু নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।[৫] রাম বসুর পিতার নাম নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, রামবাবুর পিতা হচ্ছেন রামলোচন বসু। গোপালবাবুর মতে তাঁর নাম ছিল জয়নারায়ণ বসু। কিন্তু ব্রজসুন্দর সান্যাল কোথাও তাঁকে রবিলোচন আবার কোথাও তাঁকে রামলোচন বসু বলেও উল্লেখ করেছেন।[৬] যা হোক, রাম বসু যে শালিখায়ই জন্মেছিলেন তাতে কারও সন্দেহ নেই। রাম বসুর মায়ের নাম ছিল নিস্তারিণী।

রামবাবুর ছোট বয়স থেকেই কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায়। তাঁর পিতা তাঁকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়ে আরও উন্নত করবার জন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ভগ্নীপতির বাড়িতে পাঠান। কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের মতে—৺বারাণসী ঘোষের বাড়িতে তাহার পিসার নিকট থাকিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন।[৭] রামবাবু কিছু ইংরেজী শিখে প্রথম জীবনে চাকরি করতে ঢোকেন এক সওদাগরী অফিসে। তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন একমাত্র কবিয়াল যিনি কিছু ইংরেজী জানতেন।[৮] রামবাবু পরে অবশ্য চাকরি ছেড়ে নিজেই একটি কবির দল গঠন করেছিলেন—নাম ছিল 'রাম বোসের দল।'

রাম বসুর চরিত্র সম্বন্ধে বেশ কানাঘুষা শোনা যায়। তাঁর নাকি একজন রক্ষিতা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল যজ্ঞেশ্বরী। এই যজ্ঞেশ্বরী নিজেও একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা কবিয়াল ছিলেন। কারো কারো মতে রামবাবুর কবিত্ব শক্তির উৎসই নাকি ছিলেন এই যজ্ঞেশ্বরী। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় 'নব্য ভারতে লেখা হচ্ছে—'রাম বসুর চরিত্রটি নিতান্ত ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না।' আবার অনাথ কৃষ্ণ দেব তাঁর 'বঙ্গের কবিতা' পুস্তকে লিখছেন—'যজ্ঞেশ্বরীকে রাম বসু অনুগৃহীতারূপে দেখতেন।' অবশ্য তখনকার দিনে এ ধরনের অবৈধ প্রেমকে মোটেই দোষের ব'লে দেখা হত না। ১৩১৩ সালের 'নব্য ভারত' পত্রিকা লিখছে—'প্রাচীন মহাশয়েরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যুবকগণ বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা শিখিতে পারে না।' এখানে যজ্ঞেশ্বরী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা কবিয়াল। তিনি নিজেও একটি কবির দল গড়েছিলেন। তিনি স্বয়ং আসরে বসে কবিতা রচনাতেও পটীয়সী ছিলেন। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে তিনি আসরে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণা হয়ে শ্রোতাদের চমক লাগিয়ে দিতেন। তিনি যে জাত কবিয়াল ছিলেন তার প্রমাণ পাই প্রসিদ্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রার সঙ্গেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংবাদ থেকে।

একবার কলকাতার এক আসরে* উপস্থিত হয়ে যজ্ঞেশ্বরী দেখলেন যে, প্রসিদ্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রা সেখানে উপস্থিত। ভোলা ময়রার খ্যাতির কথা যজ্ঞেশ্বরী আগেই জানতেন। তাই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যজ্ঞেশ্বরী তাঁকে 'ভোলানাথ আমার পুত্র এবং আমি ভোলানাথের মাতা' বলে গান বাঁধলেন।

* কাশিমবাজারের রাজবাড়ি।

উদ্দেশ্য যে, ভোলানাথ হয়তো মাতাকে আর তেমন হেনস্তা করবেন না। কিন্তু ভোলানাথ মাতার পুত্র আখ্যা স্বীকার করেও এমনভাবে গালাগালি দিয়ে তার উত্তর দিয়েছিলেন যা পড়লে ভোলানাথের কবি-প্রতিভার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভোলানাথের উত্তরটি চমৎকার—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী সর্ব কার্যে শুভংকরী
তোমার ঐ পুরানো এঁড়ে রাম বোস বাপ।
যেমন পিতা তেমনি মাতা ভোলানাথের অভয়দাতা
মা—বাপ ঠিক খাগিয়ে দিলে খাপ॥
এখন মা! শুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোরে ডাক।
বুঝি তোমার হয়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক॥
তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মত মাতার দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চপিতা, সপ্তমাতা শাস্ত্রে শুনতে পাই
তুমি আমার গাভীমাতা, চল তোমায় চরাতে যাই॥[১]

উল্লেখ্য, রাম বসুর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীর অবৈধ যোগাযোগের ঘটনা ভোলা ময়রা বলতে কসুর করেনি। বলা বাহুল্য, যজ্ঞেশ্বরীকে সেদিন বিনা শর্তে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল।

বাংলার প্রাচীন যাত্রা জগতে এক বিখ্যাত নাম হচ্ছে পালাগানকারী গোবিন্দ অধিকারী। তিনি একদিকে যেমন উঁচুদরের যাত্রাভিনেতা ছিলেন অন্যদিকে তিনি ছিলেন একাধিক পালা রচনায় সিদ্ধহস্ত। অধিকারী মশায়ের কৃষ্ণযাত্রার সুখ্যাতি সে যুগে আসরে আসরে কীর্তিত হত। এই অধিকারী মশায়ের জন্ম হুগলী জেলার খানাকুলে হলেও তাঁর জীবনের বেশী সময়ই কেটেছে এই হাওড়া জেলারই শালিখায়। এখানেই তিনি সগৌরবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

গোবিন্দ অধিকারী যে কত উঁচুমানের যাত্রা পালাকার ছিলেন তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় বিপিন বিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। প্রবীণ নাট্যাচার্য* শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর—বিপিন বাবুকে বলেন—'তখন কলিকাতায় যাত্রাগানের খুব ধুম। সর্বত্রই যাত্রার আসর ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চক্রবর্তীর দল, বৌ-মাষ্টারের দল, ঝোড়োর দল, ব্রজ অধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল (গোপাল উড়ের দল নামে প্রসিদ্ধ), মদন মাষ্টারের দল, লোকা ধোপার দল প্রভৃতি যাত্রার দল তখনকার

* ভারত সঙ্গীত সমাজ হইতে একমাত্র শ্রীযুক্ত কর মহাশয়ই নাট্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।
দ্রঃ পুরাতন প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গোবিন্দ অধিকারী রাত্রিশেষে আসরে নামিতেন। তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্তারা আসিয়া বসিতেন। তৎপূর্বে রাত্রি নয়টা হইতে তিনটা পর্যন্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙের ব্যবস্থা ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর পোষাক জরি বসান শালুর কাপড়ে প্রস্তুত ছিল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইত, তাহারা কলাপাতার গহনা পরিত।...প্রত্যেক দলই নাচ গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গোবিন্দ অধিকারী বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া বিন্দে দূতী সাজিয়া আসরে নামিতেন, অথচ কিছু মাত্র বে-মানান বলিয়া মনে হইত না। অতি মধুর কীর্তনাঙ্গে তিনি সকলকে মোহিত করিয়া দিতেন।' বৈষ্ণব গোবিন্দবাবুর জন্ম-মৃত্যু নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। 'বঙ্গভাষার লেখক' হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন—তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত সন তারিখ জানা নাই। তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। 'বাঙ্গালীর গানে' বলা হয়েছে—১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ অধিকারীর জন্ম এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে হাওড়ার সালিখা গ্রামে মৃত্যু হয়।[১০] গান রচনা ও সুললিতকণ্ঠের অধিকারী, বহু পালাগানের রচয়িতা ও দূতীর ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা ও যাত্রা-পরিচালক গোবিন্দ অধিকারীকে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' গোবিন্দকে পরমানন্দের দলের 'ছোকরা অভিনেতা' বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] এই বিখ্যাত যাত্রা অধিনায়ক গোবিন্দ অধিকারী থাকতেন শালিখার বর্তমান কলডাঙ্গা লেনে।

ইতিপূর্বে 'দাঁড়া কবি' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দাঁড়া কবিদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে রঘুনাথ দাস। কেউ কেউ বলেন, তিনিই নাকি 'দাঁড়াকবি'র প্রবর্তক ছিলেন।[১২] ডঃ ভবতোষ দত্তও গোপালবাবুর মতকে সমর্থন করেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে রঘুনাথ ফরাসডাঙ্গায় বাস করতেন। রঘুনাথ এক সময়ে হাওড়ার শালিখায়ও বাস করতেন এটাও অনেকের মত। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে (৪র্থ) বলেছেন—'কিন্তু অনেকে বলেন রঘুনাথ নানা স্থানে বাস করতেন—সালিখা, গুপ্তিপাড়া ও কলকাতায় তাঁর যাতায়াত ছিল'। ভবতোষ দত্তের মতে—অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে এঁর জন্ম। রঘুর জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্ন কিম্বদন্তী আছে। কেউ বলেন কলিকাতায় কেউ বলেন শালিখায়, কেউ বলেন গুপ্তিপাড়ায়। হরু ঠাকুর এঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

এই সব কাহিনীর অবতারণা করে এ কথা বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে হাওড়া যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমায় যে গৌরবের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সেটা হঠাৎ গড়ে ওঠা কিছু প্রতিভাশালী অভিনেতা, নাট্যকার ও গায়কের ধূমকেতুর মত আগমন নয়, এটা তাঁরা পেয়েছিলেন এই মাটিতে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট প্রাচীন কয়েকজন সৃজনশীল পূর্বপুরুষ কবিয়াল, অভিনেতা ও নাট্যকারের সহজাত গুণের উত্তরাধিকারী হিসেবে। ঐ সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় প্রতিভাধরদের জন্য হাওড়াবাসী

স্বতঃই গর্বিত। কবিয়াল রাম বসু সম্বন্ধে কবি ঈশ্বরগুপ্ত যে ধরনের প্রশস্তি কীর্তন করেছেন তা যে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই প্রার্থিত বস্তুস্বরূপ। গুপ্ত কবি বলেছেন—যেমন সংস্কৃত কবিতায় 'কালিদাস', বাঙ্গালা কবিতায় 'রামপ্রসাদ' ও 'ভারতচন্দ্র' সেইরূপ কবিয়ালদিগের কবিতায় 'রাম বসু', যেমন ভৃঙ্গের মধ্যে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্র-সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে 'রাম বসুর গীত'।[১৩]

গোবিন্দ অধিকারীর জন্মের কাছাকাছি হাওড়া ব্যাঁটরা গ্রামে আর এক পাঁচালিকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ঠাকুরদাস দত্ত। 'আনুমানিক ১২০৮ সালে (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে) ইনি হাওড়ার অন্তর্গত ব্যাঁটরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদাসের পিতা রামমোহন দত্ত ছিলেন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসুর বন্ধু স্থানীয়। রাম বসুর কবির দলে তিনিও যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু জীবিকা হিসেবে রামমোহন ফোর্ট উইলিয়ামে কাজ করাই বাঞ্ছনীয় ভাবিয়াছিলেন।'[১৪] 'ঠাকুরদাসের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের জন্ম ১৮৪২ সালে। তিনি ছিলেন পিতার মতই সঙ্গীতকর্তা। ঠাকুরদাসের অপর পুত্র শ্যামাচরণ ছিলেন সুকবি।'[১৫] 'যুবক বয়সে ঠাকুরদাসের পিতৃবিয়োগ ঘটলে তিনি শখের যাত্রাদল করেন। প্রথমে বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে একটি পালাগান রচনা করেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ২৯/৩০ বৎসর।'[১৬] তাঁর বিখ্যাত পালা ছিল 'নল-দময়ন্তী', 'কলঙ্ক ভঞ্জন' ও 'শ্রীমন্তের মশান'। সেই সময়ের বিখ্যাত যাত্রাগায়ক দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল এই তিনটি পালাই বহুদিন গেয়েছিলেন। তখনকার দিনে ঠাকুরদাসের পালাগান জেলার বিভিন্ন অংশে অভিজাত বাড়িতে গাওয়া হত। এছাড়া তাঁর রচিত বিভিন্ন পালা কলকাতার টাকী জমিদার বাড়ি, শ্রীরামপুর-রিষড়ার কৈলাসচন্দ্র গারুই-এর বাড়ি ও বাগবাজার নিবাসী গোপীনাথ দাসের বাড়িতে শখের যাত্রাদলেরা অভিনয় করত। অবশেষে ঠাকুরদাস নিজেও একটি শখের পাঁচালীর দল করেন। পরে সেটি পেশাদার দল হয়। তাই নিরঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর বইতে লিখেছেন—এই দলের জন্যই 'পাঁচালীওয়ালা ঠাকুরদাস' নামে তাঁহার কবিখ্যাতি দিগন্ত প্রসারিত হয়।' এটি কি হাওড়াবাসীর কাছে কম আনন্দের বার্তা! তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে রাম বসুই ছিলেন ঠাকুদাসেরও পাঁচালীগানের প্রেরণাদাতা। ঠাকুরদাস-পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নিজ পিতা সম্বন্ধে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তা থেকেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনায় হাওড়ার ভূমিকা' পুস্তিকায় অচল ভট্টাচার্য লিখেছেন—'পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পিতা ঠাকুরদাস সম্পর্কে লিখেছেন—

বহু শিক্ষা লাভ কিংবা চাকুরী গ্রহণ।
এ সকলে ঠাকুরের না উঠিল মন॥
পিতৃসখা রামবসু কবিত্বের যশে।
পবিত্র করিল মন বাণীসুধা রসে॥

কবিতা, পাঁচালী, যাত্রা, বাউল সঙ্গীত।
এ সকল আলাপনে হয় হরষিত ॥
অসংখ্য পাঁচালী রচি কবিতা ও গান।
দেশে প্রচারিয়া পান অজস্র সম্মান ॥
সুকবি সে দাশু রায়, সুধী কীর্তিমান।
যাঁহার পাঁচালী কাব্য নব অবদান ॥
ঠাকুরদাসের কাব্য করি আস্বাদন।
'দাদা' বলি, 'কবি' বলি, করেন বন্দন ॥

উল্লেখ্য, লক্ষ্মীনারায়ণও একজন গীতিকার ছিলেন। তার নমুনা উপরের পিতৃ-প্রশস্তি থেকেই বোঝা যায়। ঠাকুরদাস ১২৮৩ সালের ২১শে বৈশাখ (১৮৭৬ ইং) তারিখে লোকান্তরিত হন।[১৭] ডঃ সুকুমার সেনের মতও তাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় সংস্করণে শ্রী সেন লিখছেন—'অবশ্য কোন সাহিত্য-ইতিহাসকার কিভাবে ১২৮৮ সাল নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই।' পাঁচালী-গানে ঠাকুরদাসের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল পাঁচালীগানের সঙ্গে উন্নততর মার্গ-সঙ্গীতের সংমিশ্রণ।

এবার যাত্রা ও থিয়েটারের কথায় আসা যাক। যাত্রা ও থিয়েটারে হাওড়াবাসীদের একটি বিশেষ ট্র্যাডিশন আছে। আর সেই ট্র্যাডিশনের মূলে ছিলেন কবিয়ালশ্রেষ্ঠ রাম বসু, গোবিন্দ অধিকারী এবং ঠাকুরদাস দত্ত। তাঁরা যে কেবল জেলার গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের প্রতিভা প্রকাশে সীমায়িত ছিলেন তা নয়। নগরী শ্রেষ্ঠ কলকাতার বিভিন্ন স্থানেও তাঁরা নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

পাঁচালী থেকেই যে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে এ মত অধিকাংশ পণ্ডিতই পোষণ করেন। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেনের মতে—'পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব।' অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল তাঁর 'বাংলা নাটকের ধারায়' লিখেছেন—'কীর্তন ভাঙ্গিয়া ঢপকীর্তন' ও ঢপকীর্তন ভাঙ্গিয়া যাত্রার উৎপত্তি। বিশিষ্ট নাটক সমালোচক ও অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার ঘোষও তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—'পাঁচালী হইতেই জনপ্রিয় যাত্রাগানের উদ্ভব হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্য পাঁচালীর জন্ম হইয়াছে। এই পাঁচালীর ধারা উদ্ভূত হইয়াছে কীর্তন গান হইতে।' History of Bengali Literature in the 19th Century গ্রন্থে এস. পি. দে-ও মন্তব্য করেছেন—Jatra, a species of popular amusement which was closely allied to Kavi and Panchali. অতএব এরপর আর তর্কের অবকাশ কোথায়!

যাত্রাভিনয়ে কিন্তু বালি গ্রামের প্রাচীনত্ব বহুল প্রচারিত। বালি সাধারণী সভা-শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থে বলা হয়েছে—'যতদূর জানা যায় ১৮৮৫-৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সখা নাট্যসমাজ 'শকুন্তলা' যাত্রার সূচনা করেন। গ্রামের অন্যতম কৃতী সন্তান নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা হইতে অভিনয় উপযোগী করিয়া

যাত্রার সাট বা পালা রাখেন। সরল সংলাপ ও ধ্রুপদী সঙ্গীত 'শকুন্তলা' যাত্রার বিশেষত্ব ছিল। সুরসাধক রাম দত্ত সঙ্গীতে সুর সংযোজন করেন। নিশ্চিন্দা ঘোষপাড়া এবং জোড়া অশ্বত্থতলার 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাভিনয় বালিসহ কলকাতাতেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সময়কাল হবে ১৯০৭—১৯১২ খ্রীঃ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, বৃত্রাসুর, ভীষ্ম, ভক্ত পুরাণ প্রভৃতি যাত্রাভিনয় জনসমাজে আদৃত হয়েছিল।'

কিন্তু দেরীতে হলেও হাওড়া শহরে 'নদের নিমাই' যাত্রা সকলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। বাঙ্গলাদেশে হাওড়া সমাজের 'নদের নিমাই'-এর যাত্রাগান সদাই প্রচারিত ও প্রসংশিত। এটির জন্মকাল ১৯৩১ সাল ৬ই নভেম্বর। 'স্মৃতির অর্ঘ্য' গ্রন্থে শিবপুরের বসন্ত কুমার লিখছেন—শিবপুরে অনেকগুলি ভাল শখের যাত্রাদল ছিল। এদের মধ্যে হাবড়া (হাওড়া) ও শিবপুরের অনেকগুলি ভদ্রলোক মিলে 'নদের নিমাই' যাত্রাভিনয় করতে আরম্ভ করেন।···নদের নিমাই-এর পরিকল্পনা করেন 'হাবড়া সমাজে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বরঞ্জনবাবুর পিতা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই বহির্বাটীতে (হারকার্ট লেন) আশ্রয় নেওয়া হল। নদের নিমাইয়ের গানে অপূর্ব সুর সংযোগ করেন বিশ্বরূপবাবু। নিতাইয়ের ভূমিকায় হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইয়ের ভূমিকায় শ্রীমান গোপালের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। এই যাত্রাভিনয়ের অর্থেই নদের নিমাই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে মধ্য হাওড়ার বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনে। মন্দিরের মহাপ্রভুর মৃন্ময় মূর্তিটি গভীর ভাবের দ্যোতনা করবে ভক্তজনের মধ্যেই। আজও হাওড়া সমাজ 'নদের নিমাই' যাত্রাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এখানে যদি বাংলার যাত্রাজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম না করি তাহলে বাংলার যাত্রাজগতের অঙ্গহানি ঘটবে। তিনি হচ্ছেন ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। যাত্রার আসরে তিনি আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে 'বড় ফণী' নামেই সমধিক পরিচিত। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েও নেশার টানে যাত্রাদল খোলেন। আসল নাম ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৮৯৩ সালে জন্মেছিলেন হাওড়া জেলার সাঁত্রাগাছি গ্রামে।[১৮] শুধু অভিনয়েই নয়—ইতিহাস, পুরাণ, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলেই ভাল ভাল নাটকও লিখে গেছেন। ভারত সরকারের সঙ্গীত-নাটক একাডেমি তাঁকে ১৯৬৮ সালে সরকারী সম্মানে পুরস্কৃত করেছিলেন। 'এই বিভাগে তিনিই প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন।'[১৯] ১৯৬৮ সালে নারকেলডাঙ্গায় 'বাঁশের কেল্লা' অভিনয় করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২০] 'বড় ফণী' যে হাওড়াবাসীকে যাত্রাজগতে কত বড় করে গেছেন তা আজ হাওড়াবাসী বুঝতে পারছে। স্বাধীনোত্তর যুগে সত্তরের দশকে আর এক যাত্রাভিনেতা খ্যাতিলাভ করে অবসর নিয়েছেন—তিনি হচ্ছেন হাওড়া শালিখার ভোলা পাল। শখের যাত্রা অভিনয়ে শিবপুর প্যারাডাইস ক্লাব ও সাঁত্রাগাছি নাট্যসমাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাঁত্রাগাছির নাট্যসমাজের 'জয়দেব' পালাটি সেকালে বিশেষ খ্যাতি

লাভ করেছিল। পঞ্চাশ বছর ধরে ঐ ক্লাবটি জনসাধারণকে আমোদিত করে চলেছে।

পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হলেও পুরাতন যাত্রার সঙ্গে কিন্তু বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নেই। বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটেছিল। রসরাজ অমৃতলাল বসুর মতে—আমাদের দেশীয় যাত্রায় গানই প্রধান, এই জন্য যাত্রা 'শুনিতে' হয়; থিয়েটার অঙ্গভঙ্গী অর্থাৎ 'অ্যাকটিং' প্রধান, এইজন্য থিয়েটার 'দেখিতে' হয়।[২১] হাওড়ায় কবে কোথায় প্রথম থিয়েটার চালু হল তা নিয়ে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। তথাপি যে সব লিখিত তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে শিবপুরেই প্রথম থিয়েটার চালু হয়। 'নগর হাওড়া' গ্রন্থের লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন--'প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৮ সালে শিবপুরে বৌবাজারের এক শখের নাট্যগোষ্ঠীর নাটক অভিনীত হবার পরই এ নগরের মানুষ নাটক অভিনয়ে উৎসাহিত হয়। অপরপক্ষে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এ বিপিন বিহারী গুপ্ত লিখছেন—'১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শখের থিয়েটারের খুব ধুম পড়িয়া গেল। শিবপুরে বাঁধা ষ্টেজে 'রামাভিষেক' নাটক অভিনীত হইল।'

আবার 'স্মৃতির অর্ঘ্য' গ্রন্থে বসন্ত কুমার পাল লিখেছেন—পিতার মুখে শুনিয়াছি ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠীভাগে কলকাতায় প্রথম 'পদ্মাবতী' নাটক অভিনয়ের পর তাঁহারা শিবপুরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করেন। মাইকেল নিজে আসিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিতেন এবং তাহারা এ অভিনয়ে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন।'

এখানে এমন একজন অভিনেতার নাম উল্লিখিত হচ্ছে যিনি অভিনয়ে প্রথমে নেমেই প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হিসেবে সে-যুগে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে আদৃত হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন নাট্যাচার্য্য রাধামাধব কর। তিনি হাওড়ায়ই জন্মেছিলেন। শ্রীকর ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সালে বিপিন বিহারী গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন—১৮৫৩ সালের পৌষ মাসে সাঁত্রাগাছিতে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর* আমার চেয়ে এক বছর পাঁচ মাসের বড়। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন আমার পিতৃদেব (স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস কর) বরিশাল হইতে ঢাকায় বদলি হইয়া গেলেন।' এই রাধামাধব কর উচ্চশিক্ষার পথ ত্যাগ করে অভিনয়ে মেতে উঠলেন। ১৮৭২ সাল। কলকাতার রাজেন্দ্র পালের বাড়িতে 'লীলাবতী' নাটক হচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে দর্শকরা বসেছেন। দর্শকদের মধ্যে আছেন দীনবন্ধু মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, কানাইলাল দে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ দশকগণ। অভিনয়ের সময় বৃষ্টি হল। 'সেই ভিজে চেয়ারের উপর বসিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ভদ্রলোকগণ অভিনয় দর্শন করিলেন।'[২২] এই নাটকে রাধামাধববাবু ক্ষীরোদ বাসিনী, ললিত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

---

* ইনি কার মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন। তার নামেই বর্তমান আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজ।

ও ঝি-এর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী অভিনয় করেছিলেন। রাধামাধববাবু বিপিনবাবুকে বলেছিলেন—'এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি 'ঊষা', 'অনিরুদ্ধ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'লীলাবতী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম সমস্তগুলি স্ত্রীলোকের ভূমিকার শিক্ষকতা আমাকেই করিতে হইত। আমি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর 'লীলাবতী' অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ আমার নামের উল্লেখ করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—'শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর থিয়েটারের শিক্ষকতার দাবি রাখেন।'[২৩] একি হাওড়াবাসীর যে সে গৌরব!

তারপরই শিবপুর, শালকিয়া ও ব্যাঁটরাতেও শখের থিয়েটার ক্লাব বেশ কয়েকটি গড়ে উঠল। সমাজ সেবায়ও তাঁরা এগিয়ে এলেন। সাহায্য-রজনী করে হাসপাতালের জন্যও টাকা তুলতে শুরু করলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল শিবপুরে কবি মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়। নগর হাওড়ার লেখক অলোকবাবু লিখছেন—'শিবপুরের অম্বিকা পাল তাঁর প্রতিবেশী শ্যামাচরণ মুখার্জি, মহেন্দ্র মিত্র, চন্দ্রকান্ত সরকার ও অন্যান্যদের নিয়ে মধুসূদন দত্তর 'কৃষ্ণকুমারী' মঞ্চস্থ করলে নাট্যকার স্বয়ং সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। তিনি আরও লেখেন—শালকিয়া ক্লাবের প্রখ্যাত শিল্পী চারু গাঙ্গুলী, গিরিশ চ্যাটার্জি, হারু মাষ্টার প্রভৃতি অভিনয় করেন 'শাহজাহান' ও 'রাজা বাহাদুর'। **Full Moon Dramatic** ক্লাব 'জনা' ও 'রিজিয়া' নাটক প্রদর্শন করার পরই ইউনাইটেড ক্লাবের সদস্য নরেন হালদার, মহেন্দ্র চ্যাটার্জি—'চাঁদবিবি' ও 'রানী দুর্গাবতী' অভিনয় করেন।'

সে যুগে আর একজন বঙ্গবিখ্যাত অভিনেতার কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি হচ্ছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। এই রসরাজ উত্তর কলকাতার কম্বুলিয়াটোলায় থাকলেও তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল হাওড়ার শালিখার কামিনী স্কুল লেনে। অমৃতলালের বিবাহ হয়েছিল কৈশোরে। তিনি নিজেই স্মৃতি কথায় বলছেন—'এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।'[২৪] বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃতময় অমৃতলাল' প্রবন্ধে লিখেছেন—'অমৃতলালের বিবাহ হয় ১৮৬৮ সালে। সে সময়ে বাল্যবিবাহের জোর মহড়া চলিত, কাজেই অমৃতলালও তাহাতে বাদ পড়েন নাই। শালিখার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় জয়রাম ঘোষের* পৌত্রীকে তিনি বিবাহ করেন।[২৫] অমৃতবাবুর শালিখায় শ্বশুরালয়ে থাকারও একটি ইতিহাস আছে। নাট্যজগতের লোকেদের জানা আছে যে টিকিট বিক্রী করে অভিনয় করার ব্যাপারে গিরীশ ঘোষের সঙ্গে অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তাফির মতাবিরোধ হয়েছিল। ফল মনোমালিন্য ও দল ছাড়াছাড়ি। কিন্তু এই ধারণা ভুল। পুরাতন প্রসঙ্গ-তে অমৃতলাল বিপিনবাবুকে বলেন—'এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। গিরীশবাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটরের জন্য একখানা

* জয় নারায়ণ ঘোষ হবে—যাঁর নামে রাস্তাও আছে।

ভাল বাড়ি না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না। আগে ভাল ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর ; নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন ?' যা হোক উভয়ের মধ্যে যখন এই মনোমালিন্য চলছিল অমৃতলাল তখন কলকাতা ছেড়ে শালিখায় শ্বশুরবাড়ীতে এসে বাস করছিলেন। দু'রথীর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব থেকে সরে গিয়ে মানসিক শান্তিলাভের জন্যই বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন। অবশ্য এই দুয়ের দ্বন্দ্ব থেকে যে ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছিল তা বাংলা তথা বাঙ্গালীর শিক্ষা সংস্কৃতিতে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। তার ফলশ্রুতি হিসেবেই এদেশে প্রথম পাবলিক ষ্টেজের প্রতিষ্ঠা। নাট্যমঞ্চটির নাম 'ন্যাশানাল থিয়েটার'—প্রতিষ্ঠাকাল ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল—বাংলা ১২৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ, শনিবার। স্থান—জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের ঘড়িওয়ালা বাড়ি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে মঞ্চটি উদ্বোধন করা হল। এর প্রধান উদ্যোক্তা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এবং অভিনয়ের মধ্যমণি 'সৈরিন্ধ্রী' মেয়ের ভূমিকায় রসরাজ অমৃতলাল বসু। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'নীলদর্পণে'র এটি হল প্রথম অভিনয়।

এই প্রসঙ্গটি সবিস্তারে আলোচনা করা হল এজন্যই যে, অমৃতলাল তখন শালিখায় থাকতেন। এখান থেকেই গঙ্গা পেরিয়ে অভিনয় করতে কলকাতায় যেতেন। 'অমৃতময় অমৃতলাল' প্রবন্ধে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেন—'বিধাতা কল টিপিলেন। জানি না, কি সৌভাগ্যবলে অমৃতলাল বাহিরের বাস তুলিয়া দিয়া শালিখায় আসিয়া বাসা বাঁধিলেন।'[২৬]

এবার বিংশ শতাব্দীর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের আর এক প্রতিভাবান অভিনেতা ও থিয়েটার পরিচালকের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—তিনি হচ্ছেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর অভিনয়ের মুন্সিয়ানা সম্বন্ধে এখানে আলোচনার ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু শিশির বাবু ছিলেন এই জেলারই সন্তান। তাঁর পৈতৃক বাস ও জন্মস্থান হচ্ছে হাওড়ার সাঁত্রাগাছিতে। কিন্তু সেই বসতবাটি ত্যাগ করে শিশির বাবুর পিতা হরিদাস ভাদুড়ি কলকাতায় চলে যান। শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভাইপো চিরকিশোর ভাদুড়ি 'দেশ' পত্রিকার (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯) সংখ্যায় লিখেছেন—'শিশির কুমারের পিতা হরিদাস ভাদুড়ি হাওড়ার এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন। জ্ঞাতিদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে হরিদাস হাওড়ার বসতবাটি পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন।' সাঁত্রাগাছির গ্রামের জ্ঞাতিরা শিশিরবাবুর পরিবারের উপর বিরক্তিকর আচরণ করে থাকলেও জেলারই অপর একটি অংশ শালকিয়ার অধিবাসীরা কিন্তু শিশিরকুমারের অর্থ সংকটের দিনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ইতিহাসের উল্লেখ শিশির ভাদুড়ির জন্ম শতাব্দীতে পত্র পত্রিকায় লেখা বিবিধ প্রবন্ধাদিতে কোথাও আমার চোখে পড়েনি। তাই শিশিরবাবুর ঐতিহাসিক জীবনের পূর্ণ ইতিহাস তৈরির কাজে আরও সঠিক তথ্য সরবরাহের তাগিদেই কিছু ঘটনার কথা লিখছি।

১৯৩১ সালের ১২ইজানুয়ারী নিউ ইয়র্ক শহরের 'ভ্যান্ডার বিল্ট' থিয়েটারে 'সীতা' অভিনয় প্রথম শুরু হয়।[২৭] সেখানে ছমাস তিনি নাটক অভিনয় করেছিলেন। তবে তাতে লক্ষ্মীর বেসাতি হয় নি। পরন্তু তাঁকে দল নিয়ে অর্থ সংকটেই পড়তে হয়েছিল। একথা অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এমনকি আমেরিকা প্রবাসী শিশির-বান্ধব সতু সেনও তাঁদের লেখায় প্রকাশ করেছেন। এই অর্থ সংকট কাটাবার জন্যই শিশিরবাবুকে ভারতে এসে প্রথমেই দিল্লীতে বড়লাট লর্ড আরউইনের উপস্থিতিতে 'সীতা' অভিনয় করতে হল। বলা বাহুল্য, লাটসাহেব অভিনয়ে অত্যন্ত প্রীত হলেন। এখানে বলে রাখি আমেরিকায় 'সীতা' অভিনয় দেখে New York-এর The Sun নামে বিখ্যাত পত্রিকা সমালোচনা লেখে—বিদেশী সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মস্কো আর্ট থিয়েটারের নিচেই ভারতীয় দলের স্থান।[২৮]

কিন্তু বাংলাদেশে পা দিয়ে শিশিরকুমার প্রথম 'সীতা' অভিনয় করলেন হাওড়ায়—শালকিয়ার 'নাট্যপীঠ' সিনেমায় (অধুনা পিকাডিলি সিনেমা)—কিন্তু কলকাতার কোন রঙ্গমঞ্চে নয়। শিশিরকুমারের আর্থিক সংকট মোচনের জন্য তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু বাবুডাঙ্গার মুখার্জী পরিবারের হরিগোপাল মুখার্জী তার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে প্রাথমিক সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করেছিলেন বিষ্ণুচরণ আটা (আটা ফাউন্ডারীজে'র মালিক)। শিশির কুমার ও হরিগোপাল ছিলেন হরিহর আত্মা। শিশিরবাবু হরিগোপালকে 'গোপাল' বলেই ডাকতেন। শোনা যায়, বন্ধুর দেনা শোধ করার জন্যই নাকি শালকিয়ায় 'সীতা' অভিনয়ের স্থান ঠিক করেন শিশিরবাবু। অপর মত হচ্ছে বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যই হয়তো হরিগোপাল বাবু স্বেচ্ছায় এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।* নাট্যপীঠে শিশিরবাবুর 'সীতা' ছাড়া 'ষোড়শী' 'পল্লীসমাজ' একাদিক্রমে পঁচিশদিন ধরে অভিনীত হয়েছিল। তারও পরে 'আলমগীর' 'রিজিয়া' ও 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি নাটকও অভিনীত হয়। শেষজীবনে শিশিরকুমার অবশ্য নিজেই 'আলমগীর' নাটক অভিনয় করেছিলেন সাঁত্রাগাছি বাণী নিকেতন গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাঠাগারের মঞ্চটির নাম রাখা হয় 'শিশির মঞ্চ'।

হরিগোপাল বাবুর বন্ধুত্বের সুবাদে বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে একদল শখের অভিনেতা শিশিরবাবুর হাতে গড়ে উঠেছিলেন—তাঁদের মধ্যে নৃপেশ রায় ও তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নৃপেশ রায় কলকাতার শ্রীরঙ্গমে শিশিরবাবুর দলে অভিনয় করতেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হিসেবে তখন পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শিশিরবাবু মর্মাহত হয়ে বলেন—আমার অতি প্রিয় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকটির অভিনয় নৃপেশের মৃত্যুতে একদম বন্ধ হয়ে

* এই তথ্যটি আমাকে জানিয়েছিলেন নির্বাক যুগের বিখ্যাত অভিনেতা শালকিয়ার অধিবাসী ও হরিগোপাল বাবুর প্রতিবেশী ৺কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গেল। অতবড় অভিনেতা বাংলাদেশে খুব কমই জন্মেছে।'[২৯] শিবপুরে 'অলকা সিনেমা' স্থাপন করেন হরিগোপালবাবু এবং তার উদ্বোধন করান তিনি বন্ধু শিশিরবাবুকে দিয়ে। যে চেয়ারে বসে শিশিরবাবু সেদিন উদ্বোধন করেছিলেন আজও সেটি সযত্নে রেখেছেন সিনেমা কর্তৃপক্ষ। 'অলকা' নামটি শিশিরবাবুরই দেওয়া। বালিরও দুই অভিনেতা সুবোধ মুখার্জী ও রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে কলকাতার মঞ্চে শিশিরবাবুর সঙ্গে নিয়মিত অভিনয় করতেন।

কলকাতার সঙ্গে তাল রেখে প্রতি শনি ও রবিবার নিয়মিত নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল শালিখার ভৈরব দত্ত লেন ও মুন্সী জেল্লার লেনের সংযোগস্থলে। সময়কাল ছিল বর্তমান শতকের তিরিশের দশক। নাটকগুলি ছিল—'জনা', 'আলিবাবা', 'জয়দেব', 'রিজিয়া', 'প্রফুল্ল' ইত্যাদি। এই নাটকগুলি বিনা পয়সায়ই শুধু দর্শকরা দেখতেন না—অভিনয়ান্তে নিখরচায় ভরপেট আহারেরও ব্যবস্থা ছিল। মঞ্চ পরিচালক ও ধনাঢ্য ব্যক্তি যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জী এর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন।[৩০] অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞান মুখার্জী, অনুকূল মুখার্জী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ বসু, কুঞ্জবিহারী চ্যাটার্জী (মিনার্ভায় অভিনয় করতেন) ও কয়েল বাগানের গণেশ শর্মা (অধিকারী*) প্রমুখের নাম আজও প্রবীণদের সুখস্মৃতিতে অটুট রয়েছে।

শালকিয়া চৌরাস্তায় 'মদন' সিনেমা (আজ নেই) নামে একটি হল ছিল। সেখানে নিয়মিত ইংরেজী সিনেমা দেখানো হত। মাঝে মাঝেই এই মঞ্চে প্রসিদ্ধ অভিনেতা দুর্গাদাস ব্যানার্জী অভিনয় করতেন। দুর্গাদাসবাবু এক সময়ে বেশ কয়েকবছর শালিখায় গিনি মসজিদের পেছনে তাঁর শ্বশুর আনন্দ মুখার্জীর বাড়িতে কাটিয়ে গেছেন। কলকাতার সঙ্গে হাওড়াবাসীকেও তিনি তাঁর সু-অভিনয়ে বহুদিন আনন্দদান করে গেছেন।

শালকিয়ার 'বান্ধব সমিতি' শখের থিয়েটার অতীতের একটি বিশেষ নাম ছিল। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উচ্চশিক্ষিত লোকেরা থিয়েটারে ও যাত্রায় তখনও বিশেষ যোগ দিতেন না। কিন্তু এই থিয়েটার দলটিতে যোগ দিলেন হাওড়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ডক্টর অবনী দত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র খগেন্দ্রনাথ দাস, শৈলকুমার মুখার্জী (প্রাঃ মন্ত্রী), হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবীগণ যেমন—জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ বসু। এছাড়া রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। আর এঁদের নাট্যশিক্ষক ছিলেন স্বয়ং প্রকাশ মুস্তাফী। গোলাবাড়ী থানার কাছে ক্যালিডোনিয়ন ডকের মাঠে প্রকাশবাবুর পরিচালনায় 'দুর্গাদাস' নাটকের সুখস্মৃতি আজও প্রবীণদের স্মৃতিতে ভেসে উঠে। এই ক্লাবটি ভেঙেই ১৯২৮ সালে হাওড়া নর্থ ক্লাবের সৃষ্টি। উত্তর হাওড়ার এমন কোন অভিজাত ও শিক্ষিত ঘরের লোক ছিলেন না যিনি সে সময় এ ক্লাবের সঙ্গে জড়িত না ছিলেন। আজও

* শিশিরবাবুর দলে পরে অভিনয় করেন।

ক্লাবটি নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। হাওড়ার আর এক বিশিষ্ট নাট্যকার ছিলেন তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। বহুদিন শালিখায় বাস করেছেন।* তাঁর কয়েকটি নাটক স্বাধীনোত্তর বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল, যেমন 'যুগাবতার', 'মীরাবাঈ', 'পারের আলো' প্রভৃতি। এই 'যুগাবতার' নাটকটির আদিতে নাম ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। ১৯৪৮ সাল। দক্ষিণ কলকাতার 'কালিকা' থিয়েটার (এখন সিনেমা) নামে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল। তারক মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটকটি দিয়েই মঞ্চটি উদ্বোধন করবেন বলে স্বত্বাধিকারী রাম চৌধুরী মনস্থ করেন। কিন্তু একদল 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ভক্ত ঠাকুরকে নিয়ে এ-ধরনের পেশাদারী অভিনেতাদের দিয়ে বিভিন্ন পূত চরিত্রের অভিনয় করার বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন। থিয়েটারের দরজায় পুলিশ পর্যন্ত মোতায়েন করা হল। কিন্তু রাম চৌধুরীও জেদ ধরলেন যে তিনি ঐ নাটকই মঞ্চস্থ করবেন। 'যে বই censor থেকে pass হয়েছে তা বন্ধ করবার চেষ্টা করলে আইনের আশ্রয় নেব'।[৩১] পরে সমঝোতা হল নাটকটি রূপক হবে। আর নাম হবে শ্রীরামকৃষ্ণ-এর বদলে 'যুগাবতার'। শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও নীতিশ মুখোপাধ্যায় এসব দেখে অভিনয় করতে অসম্মত হন। অবশেষে খুঁজে পেতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করা হল। আর রাসমণির (নারায়ণী) ভূমিকায় অভিনয়ে প্রথম মলিনাদেবী নারাজ হলেও অবশেষে রাজী হন। উল্লেখ্য, সে যুগে এই নাটকটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পাঁচ শত রজনী চলে কলকাতার এক নজির সৃষ্টি করেছিল। এই নাটকে অভিনয় করে মলিনা দেবীর মনের কি পরিবর্তন হয়েছিল তা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন— 'সত্যই যারা এই বইতে অভিনয় করে তারা প্রত্যেকেই শান্তিতে আছে এবং খুবই আত্মতৃপ্তি অনুভব করে অভিনয় করে, অন্ততঃ আমি শিল্পী হিসেবে এইটুকু তাদের মনের কথা বলতে পারি **। এই গৌরব কেবল তারকবাবুর একার নয়— এটা হাওড়াবাসীরও পরম আনন্দ। এ ছাড়া চল্লিশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত উচ্চাঙ্গের নাটক মঞ্চস্থ করে 'ক্ষণিকা' 'সান্ধ্যসম্মিলনী' 'শীলনী' প্রভৃতি নাট্যসংস্থা-গুলি উত্তর হাওড়ার লোকেদের মনোরঞ্জন করে গেছে। হাওড়ার শালিখা অঞ্চলের জীবন গোস্বামী নামে একজন অভিনেতা দীর্ঘদিন ধরে শিশির বাবুর দলে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত অভিনয় ছিল 'কার্ভালোর' ভূমিকায়। প্রসিদ্ধ নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য পরিচালিত 'দ্বিধা' নাটকটি নিয়মিত এক বছরের মত অভিনীত হয়েছিল শালিখার 'শীশ মহল' নাট্যমঞ্চে যা বর্তমানে 'রাখী' সিনেমা হয়েছে। এতে কলকাতার নামী শিল্পীরাই অভিনয় করতেন যেমন তৃপ্তি মিত্র ও তরুণ কুমার প্রভৃতি।

---

* এক সময় তিনি পঞ্চানন্দতলার ঝাউতলায়ও থাকতেন।

** এই ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে লেখকের 'শালিখার ইতিবৃত্ত' থেকে।

হাওড়ার বালি গ্রামের যাত্রার ইতিহাস প্রাচীন হলেও…থিয়েটার মঞ্চ চালু হয় ১৯০৫—১৯০৭ সালের মধ্যে। আর মঞ্চটি চালু করে বালির 'গেইটি ক্লাব'। এই ক্লাবের অভিনীত নীল দর্পণ, প্রফুল্ল, সাহাজাহান ও হরিশ্চন্দ্র তিরিশের দশকের অর্ধেক পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।[৩২] বালির নাট্যকারদের মধ্যে ছিলেন নলিন মিশ্র এবং অভিনেতা ও নাট্যকার মনমোহন গোস্বামী। গোস্বামী রচিত 'সংসার' ও 'সাধনা' কলকাতার মঞ্চেও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। শচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের (শচে কানাই) প্রচেষ্টায় ১৯৩১-৩২ সালে উঁচুমানের নাটক বালিতে নিয়মিত অভিনীত হতে শুরু হয়। তাঁরই উদ্যোগে সার্থক প্রযোজনা দেখায় 'সান্ধ্য সম্মিলনী'। বালি নর্থ ক্লাবেরও উল্লেখ এখানে করতে হয়। তবে বালিতে কলকাতার নামী ও দামী অভিনেতাদের দিয়ে নিয়মিত পেশাদারী অভিনয় শুরু করে এই সান্ধ্য সম্মিলনী। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, তুলসী লাহিড়ী, সরযূবালা প্রমুখ। ক্লাবের সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন তারক গোঁসাই, নারায়ণ প্রসাদ মুখার্জী, বলাই ঘটক ও জ্যোতির্ময় কুমার।[৩৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চাঙ্গের নাটক শান্তিনিকেতন ও ঠাকুর বাড়ি ছাড়া সাধারণ শহরে ও মহকুমা শহরে তেমন একটা তখন অভিনয় করতে দেখা যেত না। কিন্তু বালির 'সবুজ সংঘ' কবির ডাকঘর, ফাল্গুনী, ঋণ শোধ, মুক্তধারা, গোরা, রক্ত করবী প্রথম অভিনয় করতে শুরু করে। অবশ্য এই সংঘের আয়ুষ্কাল ছিল ১৯১৮-৩০ সাল।[৩৪] এই সব নাটকগুলি পরিচালনা করতেন সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সতুদা), রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, নলিনী গোস্বামী, প্রমোদ গোস্বামী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, সুধাংশু ব্যানার্জী ও রবীন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ। এঁদের শ্রীপঞ্চমীর দিনে সারস্বত উৎসব ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের। এঁদের 'রক্ত করবী' অভিনয় সম্বন্ধে তদানীন্তন কলকাতার দৈনিক ইংরেজী কাগজ 'Forward' পত্রিকা লিখেছিল—The whole play was a grand success. The actors seemed to be thoroughly involved with the underlying spirit of the book. The songs sung by Srijut Promode Ranjan Goswami were a great treat. All credit is due to Sj. Santosh kumar Banerjee and Rai Sahib Dharmadas Mukherjee who organised the play.[৩৫]

আলোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে নাটকে শখের দল জেলার মধ্যে শিবপুরেই প্রথম চালু হয়। আরও সুখের খবর যে বাংলাদেশে প্রথম মহিলা নাট্যকার জন্মেছিলেন এই হাওড়া জেলার শিবপুর গ্রামে। তাঁর নাম কামিনীসুন্দরী দেবী। তাঁরই হাতে রচিত 'উর্বশী' (১৮৬৬) ও 'ঊষা' (১৮৭১ সালে) প্রকাশিত হয়।[৩৬] এই দুটি নাটকই 'তিনি দ্বিজতনয়া' ছদ্মনামে লিখেছিলেন।[৩৭] পঞ্চাশের দশকে হাওড়ার একটি নামকরা নাট্যসংস্থা হচ্ছে 'নটনাট্যম'। প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় সিনেমা পরিচালক বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

নাট্য নির্দেশনায় ক্লাবটির ভিত সুদৃঢ় করেন। বর্তমানে নাট্যকার জগমোহন মজুমদারের পরিচালনায় সংস্থাটির সুনাম জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। সাঁত্রাগাছির রমেন লাহিড়ী নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে আজ একজন প্রতিষ্ঠিত প্রতিভা। আর এক নাট্যকার ও পরিচালক হচ্ছেন শিবপুরের অরুণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'চেতনা' নাট্য গোষ্ঠী আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে নূতন চেতনার সৃষ্টি করে চলেছে। তাঁর রচিত ও পরিচালিত 'জগন্নাথ' ও 'মারিচ সংবাদ' অগণিত দর্শকের সানন্দ-সম্বর্ধনা লাভে সক্ষম হয়েছে।

যাত্রা ও থিয়েটারের শেষে কালীকীর্তন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করলে এই অধ্যায়টি ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে বলে মনে হয়। তাই এ সম্বন্ধেও সামান্য আলোকপাত করা যাক। কালীকীর্তনে অবিভক্ত বাংলাদেশেও হাওড়া জেলার অবদান স্বীকৃত ছিল। এই কালীকীর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে প্রথমেই মনে পড়ে আন্দুলের প্রেমিক মহারাজের কথা। তিনি শুধু আন্দুলের কালীকীর্তন দলেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না সম্ভবত বঙ্গদেশে তিনিই ছিলেন কালীকীর্তনের স্রষ্টা। তাঁরই দেবী মাহাত্ম্যের বাঁধা গানগুলি দিয়ে ঐ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে কালীকীর্তনে একদিকে যেমন দেবীর প্রশান্ত রূপের গান আছে তেমনি তাঁর উগ্ররূপেরও বর্ণনা আছে। পরবর্তী কালে প্রেমিক মহারাজের বাঁধা গান দিয়েই শালিখার কালীকীর্তন দল প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের মাষ্টার ছিলেন হলাবাবু—আসল নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। পরে ঐ দল ছেড়ে দিয়ে এসে তিনি বীণাপাণি ক্লাব কালীকীর্তন দলে যোগ দেন। আজও সেই কালীকীর্তন দল সমানে চলছে। আর একটি দল আছে বাবুডাঙ্গায় শালিখা কালীকীর্তন সমিতি নামে। এই কীর্তনদলটি মৈমনসিংহের (অধুনা বাংলাদেশ) নাটোর মহারাজের বাটিতে গীতিনাট্যের মাধ্যমে 'পান্ডব গৌরব' মঞ্চস্থ করে। পালাটি এতই মনোজ্ঞ হয়েছিল যে নাটোরের মহারাজ দলটিকে একটি পাখোয়াজ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। আন্দুলের কালীকীর্তন দলই বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচারিত।
শিবপুরের শ্যামাচরণ পণ্ডিত ও জ্ঞানচন্দ্র ব্যানার্জী বাউল গান গেয়ে সে যুগে খুব খ্যাতি লাভ করেছিলেন। '১৮৮৪ সালে ঝুলন উৎসবে শিবপুরের এই দল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।'[৩৮]

ধ্রুপদী (classical) নৃত্যে হাওড়া শালিখার দুই নৃত্য শিল্পীর নাম উল্লেখ করার মত। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সুশীল করণ তাঁর কলেজের অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছেই নৃত্যের শাস্ত্রীয় মুদ্রা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতার পাথুরিয়া ঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বাড়িতে নিখিল বঙ্গ সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগেই নৃত্যে যুবক সুশীল করণ প্রথম স্থান

অধিকার করে সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পেয়েছিলেন। পরে তিনি উদয় শঙ্করেরও স্নেহ ভাজন হয়েছিলেন। অপর এক মহিলা নৃত্যশিল্পীর নাম হচ্ছে বেলা অর্ণব। নৃত্যে তাঁর প্রথম গুরু হরেন নন্দী (খ্যাতনাম্নী গায়িকা গীতা দত্তের মেসোমশাই)। পরবর্তী সময়ে পিতা পাঁচু অর্ণব মেয়েকে কত্থক শেখাবার জন্য নাড়া বাঁধেন জয়পুর নিবাসী শোহনলাল মিশ্রের কাছে। তারপর জয়লালজির কাছে শিক্ষা। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে দশ বছর ধরে কত্থক নৃত্য অনুশীলন করেন পদ্মশ্রী শম্ভু মহারাজের কাছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঐ বিভাগে তিনি প্রথম সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'নৃত্য বারিধি' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন। অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গের কোন নৃত্যশিল্পী এই উপাধি পাননি।

পুতুলনাচ ভারতের একটি প্রাচীন লোকশিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের অঙ্গ বিশেষ। সেই গ্রামীন পুতুলনাচ আজও মানুষের উৎসাহ সৃষ্টি করে। কিন্তু আধুনিক আঙ্গিকে পুতুল নাচের যে বৈজ্ঞানিক রূপ পরিবর্তন হয়েছে তাতে হাওড়া জেলার শালকিয়ার সুরেশ দত্তের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ১৯৮০ সালে পোল্যাণ্ডে যে আন্তর্জাতিক পুতুল নাচের আসর বসেছিল তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সুরেশ দত্ত। একুশটি দেশের পুতুল নাচের দলের মধ্যে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের সুরেশ দত্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিবেচিত হয়ে নিজেই কেবল স্বর্ণ পদক গলায় পরেননি—বিজয়মাল্য পরিয়েছেন বঙ্গমাতা তথা ভারত মাতার গলেও। তাঁর 'আলাদীন' ও 'রামায়ণ' অসাধারণ সৃষ্টি।

সুরেশ দত্তেরই ভাই যোগেশ দত্ত মূকাভিনেতা হিসেবে আজ আর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতেই নয়—ভারতের বাইরেও তিনি মূকাভিনয় করে বিশেষ গৌরব অর্জন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মূকাভিনয় করে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। এঁদের দুজনেরই কৈশোরের কিশলয় ও যৌবনের উপবন ছিল হাওড়ার শালিখায়। বার্ধক্যের বারাণসী রূপে এখন কলকাতাকেই বেছে নিয়েছেন।

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. প্রাচীন কবি সংগ্রহ ১ম খণ্ড—সম্পাদিত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. ঈশ্বরগুপ্ত রচিত কবি জীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত।
৪ বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ (১)—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬. নব্য ভারত (পৌষ)—১৩১১।
৭. ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবি জীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত।
৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯. হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীরকুমার মিত্র।

১০. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১. ঐ ঐ
১২. প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩. কবি জীবনী—ডঃ ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।
১৪. ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী কবি ও বাংলা সাহিত্য—নিরঞ্জন চক্রবর্তী।
১৫. নগর হাওড়া—অলোককুমার মুখোপাধ্যায়।
১৬. ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী কবি ও বাংলা সাহিত্য—নিরঞ্জন চক্রবর্তী।
১৭. ঐ ঐ
১৮. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।
১৯. ঐ ঐ
২০. ঐ ঐ
২১. পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত (২য় সংস্করণ)
২২. ঐ ঐ
২৩. ঐ ঐ
২৪. ঐ ঐ
২৫. মাসিক বসুমতী—১৩৩৬ সাল।
২৬. ঐ
২৭. আমেরিকার ডায়েরী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।
২৮. মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্পাদনা "দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য"।
২৯. গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ স্মরণী কথা ও কাহিনী ১৯৪৮।
৩০. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩১. শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৩২. বালি সাধারণী সভা—শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৯৮১।
৩৩. ঐ ঐ
৩৪. ঐ ঐ
৩৫. Forward Friday 22nd Jan.—1926
(শীতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্যে)
৩৬. নগর হাওড়া—অলোককুমার মুখোপাধ্যায়।
৩৭. হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৮. নগর হাওড়া—অলোককুমার মুখোপাধ্যায়।

যাত্রা থিয়েটারের শিল্পসভায় আর এক নান্দনিক অভিনব সংযোজন হল সিনেমা—যাকে প্রথমে বলা হত বায়োস্কোপ। এদেশে বায়োস্কোপের আবির্ভাব হ'ল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শেষার্দ্ধে বা বিংশ শতাব্দীর একদম শুরু থেকেই। যাত্রা থিয়েটারের শিল্প নৈপুণ্য ও তার নান্দনিক শিল্পবোধ পরিশীলিত হয়ে সিনেমায় তা তিলোত্তমায় পরিণত হয়েছে। সিনেমা বিষয়ক গবেষক নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে—'আমাদের দেশে এই শিল্পের প্রদর্শন শুরু হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে—প্রথমে বোম্বাই তারপর কলকাতায়। তিনি আরও লিখেছেন—কলকাতায় প্রথম যে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন চালু করেন তিনি হচ্ছেন বাঙ্গালী—নাম হীরালাল সেন।[১]

আজকের মত সেদিনের সিনেমা কিন্তু সবাক ছিল না। তথাপি বাংলা দেশের সিনেমা জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কি নির্বাক কি সবাক চলচ্চিত্রে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও অভিনেতা রয়েছেন এই হাওড়ারই অধিবাসী। বিস্মৃতপ্রায় সেই সব কলাকুশলীদের অবদান খুঁজে পেতে দেখা যাবে তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল কত গৌরবের ও প্রশংসার।

আজকের মত নয়---তখনকার দিনে বায়োস্কোপ ছিল নির্বাক। কিন্তু নির্বাক হলেও সেই বায়োস্কোপ মানুষের কাছে ছিল এক লোভনীয় অবসর বিনোদনের বস্তু। ভারতে এই নির্বাক চলচ্চিত্রের এক নম্বর নির্মাতা ছিলেন বিখ্যাত জে. এফ. ম্যাডান এণ্ড কোম্পানী। এই ম্যাডানরা ছিলেন জাতিতে পার্শী। বোম্বের অধিবাসী হলেও ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন। সামান্য পুঁজি নিয়ে বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এখনকার মত কোন স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহও ছিল না। তাই ম্যাডান কোম্পানী কলকাতার গড়ের ময়দানে প্রথম তাঁবু গাড়লেন। সাল ১৯০৪-৫ হবে। ভিড় করে মানুষ তাঁবুতে বায়োস্কোপ দেখতে আসত। দু'তিন বছর যেতে না যেতেই ১৯০৭ সালে ধর্মতলায় হগ সাহেবের বাজারের কাছে 'এলফিনষ্টোন পিকচার প্যালেস' নাম দিয়ে স্থায়ী চিত্রগৃহ নির্মাণ করেন এই ম্যাডান সাহেব। ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হওয়ায় হাওড়াতেও তাঁরা চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। অমৃত বাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—

Howrah Cinema

Talkal Ghat Road,

Management—J. F. Madan & Co, Friday at 6 & 9-30 P. M.

এই হাওড়া সিনেমাই আজকের বঙ্গবাসী সিনেমা। প্রচুর অর্থ লাভ হওয়ায়

কোম্পানী নিজেরাই দেশী ছবি তোলার উদ্যোগ নেন। আর সঙ্গে ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সে যুগে জ্যোতিষবাবু ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক। ম্যাডান কোম্পানী তাঁর পরিচালনায় নির্বাক ও সবাক চিত্র তৈরি করে ধনকুবেরে পরিণত হয়েছিলেন। জ্যোতিষবাবুর প্রথম নির্বাক চিত্র হচ্ছে 'সতীলক্ষ্মী'। সে যুগে তাঁর হিট্ পিকচার ছিল 'জয়দেব'। বইটি থেকে ম্যাডান কোম্পানী তখনকার দিনে সাত লক্ষ টাকা মুনাফা করেছিল।'[২] এই বইটির কথা সবিস্তারে বলা হচ্ছে এজন্য যে, পরবর্তী যুগে এই বইটি ইতিহাস তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। সেই ইতিহাস জানলে হাওড়াবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত বোধ করবেন। 'জয়দেব' নাটকটি তখনকার দিনে মঞ্চেও অভিনীত হত। কিন্তু চলচ্চিত্রে বইটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'জয়দেবে'র ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেন শালিখার তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধিকার ভূমিকায় যে বালিকাটিকে জ্যোতিষবাবু খুঁজে বার করেছিলেন তার জন্য তো সারা বঙ্গবাসী মাত্রই আজ শ্লাঘাবোধ করেন। জ্যোতিষবাবুর নিজের কথায়ই তা ব্যক্ত করা হল—'রাধিকার ভূমিকায় যে ছোট্ট মেয়েটিকে আমি চিত্রে নামাই, আজ সে ভারতের একজন নামজাদা অভিনেত্রী। যে ছোট মেয়েটিকে আমি রাধিকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলাম সে না হ'লে আমার 'জয়দেব' বোধ হয় প্রকৃত সুষম ও সৌন্দর্য হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েই প্রকাশ পেত। ৮ বছরের মেয়েটিকে দেখলেই মনে হয় কি সুন্দর এর রূপ—অথচ কি সরল গঠন, পিঠ ছাওয়া থোকা থোকা কাল চুলের রাশ—বড় বড় নীলাভ আঁখি তাতে বিদ্যুতের ছটা ফুটে রয়েছে। অথচ যে দেখে তার আর দৃষ্টি ফিরাতে চায় না। তখনই মেয়েটির মুখ দেখে আমি ব'লে দিয়েছিলাম—মেয়েটির ভেতর ইস্পাত আছে—সান দিলে খুব ধারাল হবে। একে গড়ে তুললে আর্টের পুতুল গড়া হবে না—প্রতিমাই গড়া হবে। লোকে আমার কথা শুনে সেদিন হেসেছিল—তারা বল্লে শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাধা! (শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিল রেণুবালা যার আর এক নাম ছিল 'সুখ') আমি এই মেয়েটিকে হাওড়া শহরের কোন এক স্থান থেকে সংগ্রহ করি।[৩]

জ্যোতিষবাবুর জ্যোতিষের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়ায় হাওড়াবাসী মাত্রই উৎফুল্ল হবেন। কারণ এই জ্যোতিষবাবু দীর্ঘ দিন শালিখার রামলাল মুখার্জী লেনে বাস করেছেন। ঐ আট বছরের মেয়েটির নাম কিন্তু এখনও বলা হয়নি। ইনিই হচ্ছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের অতুলনীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী। জ্যোতিষবাবু নিজের জবানীতেই বলেছেন—'আমি জানিনা ভারতে আর কেউ সংখ্যায় আমার মত এত অধিক ছবি তোলবার সুবিধা পেয়েছেন কিনা।' তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ছবি তোলায় close up, Semi close up, Mid shot ও Long shot-এর প্রবর্তন করেন। Shot-Division-এরও প্রচলন তিনিই করেন এদেশে প্রথম।[৪] হাওড়া সিনেমারও (অধুনা বঙ্গবাসী) তিনি ম্যানেজার ছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি 'দাদু' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কাননদেবী তাঁর 'সবারে আমি নমি' গ্রন্থে জ্যোতিষবাবু সম্পর্কে লিখছেন—'জয়দেব চিত্রে রাধার ভূমিকায় আমার শিল্পী জীবন শুরু হল।...আমার ওপর বিধাতার অসীম করুণা যে একেবারে প্রথমেই জ্যোতিষ বাবুর মত হৃদয়বান মানুষের কাছে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি। উনি যেমন স্নেহপ্রবণ ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি কঠোর। আদরের সঙ্গে শাসন করতে ভুলতেন না।'

একবার 'নুরজাহান' ছবি তুলতে গিয়ে জ্যোতিষবাবু শোন ব্রীজের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে প্রায় দেড় বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। সে সময় নাকি কাননদেবী তাঁকে অর্থ সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন। কাননদেবীর জন্ম হয় হাওড়া শহরে হাড়কাটা লেনের বস্তিতে। এই জ্যোতিষবাবু শেষ জীবনে মধ্য হাওড়ার মধুসূদন বিশ্বাস লেনে থেকে ই মৃত্যুবরণ করেন।

এই ম্যাডানরা যখন বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা তুলে নেন তখন হাওড়ার প্রাচীন অ-বাঙ্গালী ধনাঢ্য ব্যক্তি রাধাকিষণ চামেরিয়া ও মতিলাল চামেরিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ঐ কোম্পানীটির এক মোটা অংশ কিনে নেন। রাধাবাবু রাধা ফিল্ম স্টুডিও এবং মতিবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী তৈরি করেন। রাধা ফিল্মের উল্লেখ করা হল এই জন্যই যে এদেশে বাংলার সঙ্গে হিন্দী, তামিল ও তেলেগু ছবি নির্মাণে এরা অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। চামেরিয়ারা হাওড়া মাছের বাজারের কাছে চামেরিয়া হাউসে (বর্তমান ভীমসেন হোটেল) দুপুরুষ ধরে বাস করে গেছেন।

নির্বাক যুগের আর এক সুদর্শন অভিনেতা ছিলেন হাওড়ার শালকিয়ার প্রাচীন বাসিন্দা ৺কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে জমিদার নন্দন তার উপর আবার সিনেমায় নামা—এটা জমিদার পিতা শিবগোপালের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না হলেও কান্তিভূষণ নির্বাক চলচ্চিত্রে দীর্ঘ বার বছর (১৯২৭—৩৯) পর্যন্ত অভিনয় করে গেছেন। কান্তিভূষণের প্রথম নির্বাক ছবি 'চণ্ডীদাস' (১৯২৭)। ১৯৩০ সালে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' নির্বাক ছবিতে নায়কের ভূমিকায় কান্তিভূষণ আর নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তাকুমারী। অন্যান্য নির্বাক বইয়ের মধ্যে 'শান্তি কি শান্তি', 'জীবনপ্রভাত', 'নিয়তি' প্রভৃতি বইতে তিনি অভিনয় করে সে যুগে প্রশংসা পেয়েছিলেন। একদিকে যেমন বিখ্যাত নট দানীবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী ও দুর্গাদাস ব্যানার্জী প্রভৃতির সঙ্গে অভিনয়ে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি নায়িকা ও সহযোগী শিল্পী হিসেবে পেয়েছিলেন পেসেন্স-কুপার, রিনি স্মিথ ও শান্তাকুমারীর মত নির্বাক যুগের কিংবদন্তী অভিনেত্রীদের। চিত্র শিল্পী হিসেবেও কান্তিবাবুর খ্যাতি ছিল। এ বিষয়ে তাঁর হাতেখড়ি হয় শান্তিনিকেতনে অসিত হালদারের কাছে। সুখের বিষয় সবাক যুগের 'শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী' চিত্রে জনপ্রিয় নায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল বন্ধুবৎ। কান্তিপুত্র গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুত্বের টানে উত্তম-কুমারের 'শালকিয়া হাউসে' অবাধ গতায়াত ছিল।

নির্বাক ও সবাক যুগের আর এক ক্যামেরাম্যানের কথা হাওড়াবাসী ভুলেই যেতে বসেছেন। তিনি হচ্ছেন শালিখার বিভূতি দাস। বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান ননীগোপাল সান্যালের কাছে তাঁর ছবি তোলার হাতেখড়ি। ১৯৩৭ সালে মধু বসুর পরিচালনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকের চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া হল। সে যুগে এটি হিট্ ছবি ছিল। এ ছবির আলোক চিত্র অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়। আর ঐ আলোক চিত্র গ্রহণ করেন শালিখার বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষ। নিশীথকুমার মুখার্জী তাঁর বাংলার চলচ্চিত্রকার গ্রন্থে লিখছেন—'আলিবাবা চিত্রে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছিলেন বিভূতি দাস ও গীতা ঘোষ। উভয়ের আলোকচিত্র গ্রহণ খুবই প্রশংসনীয় হয়েছিল।' ১৯৩৮ সালে অভিনয়, ঠিকাদার, জীবন-সঙ্গিনী ও পরশমণি ছবিতেও তিনি কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। 'তপোভঙ্গ' ছবিতে বিভূতিবাবু পরিচালক হিসেবে নিজ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
সিনেমায় অভিনয় করা বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে যেন একটা সামাজিক অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে শিক্ষিত ভদ্র-ঘরের বাঙ্গালী মেয়েরা সিনেমার অভিনয়ে আসতেন না। এমনকি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোন শিক্ষিতা বাঙ্গালী মেয়েকে পাওয়া যায় নি। তবে 'স্টেটসম্যান' কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কয়েকজন শ্বেতকায়া সুন্দরী মহিলা এই কাজে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে খ্যাতনাম্নী ছিলেন পেসেন্স-কুপার, রিনি স্মিথ, আইরিশ গ্যাসপার, মিস হিপোলাইট, ভায়োলেট কুপার প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে রিনি স্মিথকে ভারতীয় নাম দেওয়া হয় সীতাদেবী, আইরিশ গ্যাসপার হন সবিতাদেবী, মিস হিপোলাইট হন ইন্দিরাদেবী ইত্যাদি।
এইসব ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাদের বাংলা চলচ্চিত্রে নায়িকা করারও চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। একদা ধীরেনবাবুকে কলকাতার রাস্তায় সুন্দরী নায়িকার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হত। সিনেমাজগতে এই ধীরেনবাবুই ডি. জি. নামে সমধিক খ্যাত। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।
একদিন ধীরেনবাবু মোটর নিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার পাশেই একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সবে ছুটি হয়েছে। ভিড়ের মধ্যেই একটি মেয়ের সৌন্দর্য ধীরেনবাবুর চোখ কেড়ে নিল। মেয়েটি বাঙ্গালী না হলেও মুখে কিন্তু সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়ের ছাপ রয়েছে। গাড়িটি আস্তে আস্তে চালিয়ে ধীরেনবাবু তার পিছু নিলেন। তারপর ঐ রাস্তায়ই একটি বাড়িতে সে ঢুকে গেল। পরদিন সকালে ধীরেনবাবু ঐ বাড়িতে গিয়ে মেয়েটির মায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলে ভদ্রমহিলা ধীরেনবাবুর উপর ভীষণ রেগে গেলেন। সেদিন নিরাশ হয়ে ফিরে এলেও কিছুদিন পর আবার তিনি ঐ ভদ্রমহিলারই বাড়ি যান। এবার কিন্তু ধীরেনবাবু তাঁর মেয়েকে চাইলেন না—তিনি মেয়ের মাকেই তাঁর কোম্পানীতে স্টীল ফটোগ্রাফার হিসেবে নিয়োগ করতে চান। ভদ্রমহিলা সানন্দে সে কাজ গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, ঐ ভদ্রমহিলা আগে একটি দৈনিক ইংরেজী কাগজের ফটোগ্রাফার ছিলেন। এর কিছুদিন পরে ভদ্রমহিলা ধীরেন-

বাবুকে ফিল্মে তাঁর মেয়েকেও নায়িকার ভূমিকায় নামতে নিজেই মত দেন। এই সুন্দরী নায়িকার নাম ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে—তিনি হচ্ছেন মিস আইরিশ গ্যাসপার—আর মায়ের নাম হল—ম্যাডাম ইসমে।
নির্বাক যুগের ছবিতে এইসব বিদেশী নায়িকাদের নিয়ে ছবি তুলতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ ভাষা ছিল সেখানে গৌণ। আকার ইঙ্গিত ও সৌন্দর্যের মহিমায় নির্বাক ছবিকে তখন তাঁরা মাতিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সবাক ছবি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (১৯৩১ সাল) ভাষা একটি বিরাট অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সেরকম একটি ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। 'ঠিকাদার' নামে একটি ছবির কাজ হাতে নিয়েছেন বিভূতি দাস মশায়। নায়িকা হিসেবে মনোনীত করেছেন মিস গ্যাসপারকে। এই গ্যাসপারই হলেন সবিতাদেবী। কিন্তু বাংলা কথা বলানো নিয়ে বিভূতিবাবু মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। তাই সবিতাদেবীকে বাংলা শেখানোর ভার দিলেন তাঁর অনুজ প্রতিম প্রফুল্ল মিত্রকে। তাঁরই কাছে বাংলা শিখে মিস সবিতা ১৯৩২, ২৫-শে ফেব্রুয়ারী রেডিওতে প্রথম রবীন্দ্র সংগীত গাইলেন। গানটি ছিল—'না, নাগো না কোর না মানা।' এই প্রফুল্লবাবু শালিখায় তথা হাওড়াতে প্রবীণদের কাছে নানু মিত্র নামেই সমধিক পরিচিত। নানু মিত্র ছিলেন একাধারে ফটোগ্রাফার, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইয়ে, ভাল পিয়ানো বাজিয়ে এবং একজন উঁচুদরের প্রযুক্তিবিদ। তিনিই মিস সবিতাকে বাংলা কথা ও রবীন্দ্র সংগীত শেখাতেন। মিস সবিতা পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে গিয়ে ঘর সংসার করেছিলেন। সেখান থেকে বিভূতিবাবুকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে তাঁর ওপর মিস সবিতার আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবই ফুটে ওঠে। সেই চিঠিটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বিভূতিবাবুর স্ত্রীর কাছে।
এই নানু মিত্র প্রসঙ্গেও দু'চার কথা বলা দরকার বলে মনে হচ্ছে। তখনকার দিনে হিন্দুস্থান রেকর্ডে নানু মিত্রের গান ঘরে ঘরে গীত হত। রেকর্ডের এক পিঠে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'নুপুর বেজে যায় রিণি রিণি' এবং অপর পিঠে ছিল—'প্রখর তপন তাপে।' এ ছাড়া অন্য রেকর্ডও ছিল। যতদূর জানা যায় হাওড়া জেলা থেকে তিনিই কলকাতার রেডিওতে প্রথম রবীন্দ্র সংগীত (গান আমার যায় ভেসে যায়) পরিবেশন করেন—সালটি ছিল—১৯২৯, অক্টোবর মাস। স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯২৭-এর ২৬-শে আগষ্ট রেডিও স্টেশনের জন্ম। প্রফুল্ল মিত্র সম্বন্ধে যে বক্তব্য প্রকাশ করা হল তারও যাথার্থ প্রমাণ করবে সাহিত্য তপস্বী বিমলকুমার মিত্রের লেখায়। তিনি লিখছেন—'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা বাড়িতে না গিয়ে চলে যাই অক্রূর দত্ত লেনে। সেখানে চণ্ডীবাবুর রেকর্ডিং কোম্পানীর গানের আড্ডা। সেখানে গিয়ে বসি—সেখানে তখন সায়গল, রামকিষণ মিশ্র, নিতাই মতিলাল, শচীনদেব বর্মন, রবীন্দ্র সংগীত বিশারদ স্ফীতদেহ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বেহালা বাদক ভোম্বলদা, অনিল বাগচী, প্রফুল্ল মিত্র, সজনী মতিলাল, অনিল বিশ্বাস, পান্না ঘোষ আর প্রশান্ত মহালনবীশের ভাই বুলা মহালনবীশের

সঙ্গে মিশে সংগীতের জগতের সংগে একাকার হয়ে যাই।…অনুপম ঘটক আমার বন্ধু। তার সুবাদেই আমি সেখানে একটা বাঁধা আসন পেয়েছি। অনুপম ঘটক আর প্রফুল্ল মিত্রকে নিয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত কার্জন পার্কের ঘাসের ওপর বসে আজে-বাজে গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দিই। প্রফুল্ল মিত্র খুব রসিক মানুষ। হিন্দুস্থানের সমস্ত স্টুডিওটা প্রফুল্ল বলতে অজ্ঞান। এদিকে নিজে ভালো মুভি ক্যামেরাম্যান, আবার চন্ডীবাবুর রেফ্রিজারেটার খারাপ হয়ে গেলে তাও সারিয়ে দেয়। আবার কখনও পিয়ানো নিয়ে বসে পড়ে—'নূপুর বেজে যায় রিণি রিণি' গান রেকর্ড করে। রেকর্ড করে—'বন্ধু হে, চলো চলো।'[৫] এ ছাড়া প্রমথেশ বড়ুয়ার Dark Room In-charge হিসেবে প্রফুল্ল মিত্রের নিয়োগ প্রমাণ করে তাঁর যোগ্যতার কথা। যতদূর জানা যায় ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রফুল্ল মিত্র Royal Photography Society of London-এর সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার দুর্লভ সম্মান হাওড়াবাসীর পক্ষে খুবই গৌরবের কথা।

'আলিবাবা' ছবিতে…ক্যামেরাম্যান বিভূতি দাসের কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। কিন্তু মধু বসুর এই ছবিতে মধ্য-হাওড়ার আর এক অভিনেতা ছিলেন যাঁর নাম হচ্ছে বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং আলিবাবার ভূমিকায় এবং ফতিমার ভূমিকায় সুপ্রভা মুখার্জীর সংগে অভিনয় করে বংগবাসীর কাছে তখনকার দিনে প্রশংসা পেয়েছিলেন। 'জজ সাহেবের নাতনি' বইতেও প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন।

এরপরই যাঁর কথা মনে পড়ে তাঁর নাম হচ্ছে তুলসী চক্রবর্তী। মঞ্চে বা ছবিতে এই মানুষটি এলেই ছোট-বড় সব দর্শকের মনেই আনন্দের লহরী বয়ে যেত। সবাই অপেক্ষা করে থাকতো ঐ বড় বড় চোখ করে কখন একটি মজাদার কথা বলে ফেলবেন। যদি না কান খাড়া করে রাখা হয় তবে ঐ কথার রসাস্বাদন থেকেই বঞ্চিত হতে হবে। এই তুলসীবাবু অনেক ছবিতে ও মঞ্চে অভিনয় করে বঙ্গবাসীকে আনন্দ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সেরা অভিনয় ছিল—'সাড়ে চুয়াত্তর'। সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর' ছবিতে তিনি অনবদ্য অভিনয় করে আজও দর্শকদের মনে জাগরিত হয়ে আছেন।

পরশুরামের একটি মহৎ সাহিত্য কাহিনীকে মহত্তর করে তুললেন সত্যজিৎবাবু এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। আর কমেডিয়ান তুলসী চক্রবর্তীর অসাধারণ অভিনয় তাকেই করে তুলল মহত্তম। আর এই ছবিটি কেবল ভারতীয়দেরই অনিন্দ্য প্রশংসা লাভ করে ক্ষান্ত হয় নি। আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা লাভে যে কটি বাংলা ছবি সক্ষম হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি এই—'পরশ পাথর।' 'তেমন হাসির ছবি কই' প্রবন্ধে রবি বসু লিখছেন—পঞ্চাশের দশক বাংলা হাসির ছবির স্বর্ণযুগ—কারণ এই দশকেই এমন কয়েকজন অভিনেতার সন্ধান পেলাম যাঁদের কমেডি অ্যাকটিং তুলনাবিহীন। পুরাণো যুগের তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চ্যাটার্জি, হরিধন মুখার্জি, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতির পাশে পেলাম ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়,

সত্য ব্যানার্জি ও অজিত চ্যাটার্জি প্রমুখকে।[৬] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই—'পরশ পাথরে' অভিনয়ের জন্য মাত্র দেড় হাজার টাকা তুলসীবাবুকে দেওয়া হয়েছিল। অশোক মান্না তাঁর এক প্রবন্ধে লিখছেন—'পুরস্কার-টুরস্কার যা পেয়েছেন সবই থিয়েটার থেকে। সিনেমায় কিছু পাননি। তবে সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর'-এ অভিনয়ের জন্য দেড় হাজার টাকা পেয়েছিলেন। তুলসীবাবু দু'হাজার চেয়েছিলেন। ও'রা বলেছিলেন, আমরা নতুন, অত দিতে পারব না।'[৭] ১৯৬১ সালে তুলসীবাবু মধ্য-হাওড়ার রাজবল্লভ সাহা লেনের পাশের গলিতে নিজভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে হাওড়ার কয়েকজন প্রযোজক বাংলা ছায়াছবিতে উন্নতমানের ছবি প্রযোজনা করে বঙ্গবাসীর প্রশংসাধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চিত্র প্রযোজনায় প্রথমেই নাম করতে হয় জগৎবল্লভপুরের সত্যনারায়ণ খাঁ মহাশয়ের কথা। তাঁরই—'চণ্ডীমাতা ফিল্মস্'-এর প্রযোজনায় বহু হিট করা ছবি বঙ্গবাসীকে আনন্দ দিয়েছে ও শিক্ষা দিয়েছে। ইন্দ্রজিৎ সিং প্রযোজিত 'দেবী চৌধুরাণী', নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ত্রৈলঙ্গস্বামী, তরণী সেন বধ ও বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রযোজিত 'শ্যামলী', 'পণ্ডিতমশাই,' বিন্দুর ছেলে,' 'রামের সুমতি', 'সাধক বামাক্ষ্যাপা', তারু মুখার্জীর 'সৎভাই', ষাটের দশক পর্যন্ত মন মাতানো ছবি ছিল। এ'রা সকলেই হাওড়া শালিখার অধিবাসী। সাঁত্রাগাছির জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও সুপরিচালক ইন্দর সেনের নামও স্মরণ রাখার মত। কোন ছবির সাফল্যের জন্য নেপথ্য সঙ্গীতের প্রভাব বলার অপেক্ষা রাখে না। এরকম নেপথ্য সঙ্গীতে যাঁরা তাঁদের অনুপম কণ্ঠ দিয়ে বাংলা ছবিকে পুষ্ট করেছেন তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসংখ্য রেকর্ডসহ বহু ছবিতে ধনঞ্জয়বাবু প্লেব্যাক করেছেন। কিন্তু শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দূরে' হিট বইতে ধনঞ্জয়ের গানের তুলনা হয় না। সে যুগে পথে-ঘাটে-বাটে সর্বত্রই মুখে মুখে গুঞ্জরিত হত। 'রাধে ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমিক শ্যাম রায়' মতন মন মাতানো গানে সমৃদ্ধ 'শহর থেকে দূরে' ছিল সুপারহিট ছবি। 'পঞ্চাশের দশকে সাধক রামপ্রসাদ ছবিতে ধনঞ্জয়বাবু প'চিশখানা গান গেয়ে ছিলেন—যা ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটা রেকর্ড'।[৮] ঢুলি ছবির অনবদ্য গানগুলির সুর আজও যেন কানে বাজে। ধনঞ্জয়বাবুর প্রথম রেডিও গানের (১৯৩৮) সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ১৯৮৭ সালে উদযাপিত হয় তাঁর শিষ্য ও গুণগ্রাহীদের দ্বারা। এই পঞ্চাশ বছরে সিনেমাতে প্রায় হাজার খানেক বাংলা গান, হাজারখানেক বেসিক বাংলা গান আর আরও অন্য ধরনের বেশ কিছু গানের এক সম্পন্ন ভাণ্ডার শ্রোতার হাতে তুলে দিয়েছেন শিল্পী গত পঞ্চাশ বছরে।[৯]
ধনঞ্জয়বাবুরই সহোদর ভাই পান্নালাল ভট্টাচার্য আর এক গানের রাজা। তাঁর শ্যামাসংগীতের গানগুলি বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রাণে দোলা জাগায়। পান্নালালের গান

সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে ধনঞ্জয়বাবু বলেন—'ওর সঙ্গে আমার কোন তুলনা হতে পারে না।' এহেন গায়ক দু'ভাই-ই বালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। যদিও এ'দের জন্মস্থান ছিল হাওড়া সাঁত্রাগাছি গ্রাম। পরে মাতুলালয় বালি গ্রামে এসে বড় হন। তাঁদের সঙ্গীত শিক্ষার মূলে ছিলেন বড়দাদা প্রফুল্ল ভট্টাচার্য।

সিনেমার প্লেব্যাক সিঙ্গারদের যাঁরা রসদ যোগান সেইসব গীতিকারদের কথাই এবার আলোচনা করা যাক। হাওড়া তথা বাঙ্গালা দেশে প্রথম সারির গীতিকারদের মধ্যে রয়েছেন হাওড়ার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। শালকিয়ায় চার পুরুষের বাস। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাক যুগের নায়ক ৺কান্তিভূষণের একমাত্র তনয়। গান লেখার ঝোঁক স্কুল জীবন থেকেই। গান লেখার জন্য শরীর খারাপের অজুহাতে বাবাকে বলে দিদির বাড়ি ঘাটশিলায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের নামে একমাস কাটান। পঁচিশটি গান লিখে শালকিয়ায় আবার ফিরে এলেন। তারপরই হাফপ্যাণ্ট পরে লুকিয়ে সোজা গার্ষ্টিন প্লেসে ট্রামে করে গিয়ে রেডিওর ডিরেক্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'গানগুলিতো ভালই হয়েছে—কিন্তু এগুলি কি তোমার লেখা ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আর জিজ্ঞেস করারই তো কথা—কারণ ছেলেটি তখন পড়ে মাত্র ক্লাস নাইনে। গোঁফের রেখা পর্যন্ত তখন দেখা দেয়নি। 'সত্যি কথা বলছি—সবকটিই আমিই লিখেছি। বিশ্বাস না হয় বলুন—আপনার সামনেও একটি অন্য গান লিখে দিচ্ছি।'—ছাত্র পুলক হলপ করে বলল। পরে অবশ্য পুলকবাবুর একটি গান রেডিও কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান লেখার গুরু বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত গায়ক হিমাংশু ঘোষের সুরারোপিত ঐ গানটি রেডিওতে সেদিন গাইলেন খ্যাতনামা ছড়ার গায়ক সনৎ সিংহ মহাশয়। গানটির কলিগুলি আজও পুলকবাবু মুখস্থ করে রেখেছেন, যেমন—একবার শুধু বলগো মনে রেখেছি। অপর পিঠে ছিল—তোমারই অশেষ লীলা, আমারো হৃদয় ভরে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখার মত যে, যেহেতু পুলকবাবু ছিলেন তখন নাবালক তাই রেডিওর নিয়মানুযায়ী সেই গানটি পুলকবাবুর নামে প্রচার করা যায়নি। এই ঘটনাটি বলতে বলতে হিমাংশুবাবুর মুখে কি না-ই প্রশান্তির ছাপ আমি সেদিন দেখেছিলাম। সঙ্গীত জগতে তাঁর যেন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গীতিকার পুলক।* পুলকবাবু হাজার চারেক গান লিখলেও তাঁর হিট গান ছিল মান্না দে-র কণ্ঠে 'সে আমার ছোট বোন, বড় আদরের ছোট বোন'। এরজন্য তিনি রয়েলটি পেয়েছেন মোট ছেচল্লিশ হাজার টাকা। 'বাংলা গানের ক্ষেত্রে এটি একটি রেকর্ড'—বললেন পুলকবাবু। এই গানটি রচনার পেছনেও যে ইতিহাসটি আছে তা উল্লেখ না করে পারছি না। খ্যাতনামা বোম্বাইয়ের গায়ক মান্না দে-র সঙ্গে পুলকবাবু হৃদ্যতা ও অন্তরঙ্গতা প্রশ্নাতীত। একদিন মান্না বললেন—'পুলক পশ্চিমী ঢঙে 'ব্যালাড সং' লেখ। তবে দেখো যেন পুরোপুরি বাঙ্গালীর সুখদুঃখের কথা তাতে থাকে।'

* হিমাংশু ঘোষের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম ৫. ২. ৮৯ সালে তাঁর শালিখা ধর্মতলার বাড়িতে।

মান্নাদার কথামত লিখেও ফেললাম। মান্নাদার খুব পছন্দও হল। প্রাণ দিয়ে তিনি সুর দিলেন এবং গাইলেন। এই গানটি যখন গ্রামেগঞ্জে শহরে লক্ষকণ্ঠে গুঞ্জরিত হচ্ছে তারই মাঝে প্রায়ই ফোনে পুলকবাবুকে সহৃদয় শ্রোতারা জানতে চাইতেন যে তাঁর ছোট বোনটি কি সত্যই ক্যান্সারে মারা গেছে? পুলকবাবুর নিজের কথা—'মান্নাদাকেও শ্রোতারা জানতে চাইতেন আমার ছোট বোনটি কি শেষ পর্যন্ত ক্যান্সারে মারা গেছে না বেঁচে আছে।' পাঠকরা জেনে রাখুন পুলকবাবুর কোন ছোট বোন ছিল না। তথাপি গীতিকারের চরম সার্থকতা এখানেই যে তিনি অপরের ছোটবোনের দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন।

এরপরই আর এক খ্যাতনামা সুরকার ও গীতিকারের নাম এখানে উল্লেখ করার মত। তিনি হচ্ছেন হাওড়া-শালিখাব অনল চট্টোপাধ্যায়। দুই পুরুষ ধরে শালিখায় বাস করলেও আদিবাস ছিল বরিশালের (বাংলাদেশ) সিদ্ধকাটি গ্রামে। পিতার নাম জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কিশোর বয়স থেকে সাহিত্য রচনা করলেও কবিতার প্রতি আসক্তি ছিল প্রবল। সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চর্চাও চলতে থাকে। তিনি সঙ্গীতের প্রথম পাঠ লাভ করেন শালিখাতেই পঞ্চানন রায় নামে একজন সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে। এরপর যুবক বয়সে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সংস্পর্শে প্রথমে সলিল চৌধুরী, পরে সুখেন্দু গোস্বামী, বিশিষ্ট সুরকার-গীতিকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ সঙ্গীত শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এসে উন্নততর সঙ্গীত শিক্ষা ও রচনায় পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে অবশ্য অনলবাবুর কবিতার রূপান্তর ঘটল গীতি-কবিতায় আর গীতিকার থেকে হয়ে উঠলেন প্রথম শ্রেণীর সুরকার।

অনলবাবু প্রথম গানের রেকর্ড করেন ১৯৫৪ সালে এইচ. এম. ভি-তে। তাঁরই কথায় ও সুরে গানটি সেদিন গেয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্র। গানের বাণী ছিল—আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার, অপর পিঠে ছিল কোথায় সোনার ধান। ১৯৫৪ সালে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় কলম্বিয়া রেকর্ডে অনলবাবুর সুরে গাওয়া গানটি সেই সময়ে সুরকার ও গায়িকার দুজনকেই শ্রোতাদের কাছে সম্মানের আসনে বসিয়েছিল। গানের প্রথম স্তবকটি এখনও অনেকের মুখেই শুনা যায়—

ছলকে পড়ে কলকে ফুলে
মধু যে আর রয় না।
চাঁপার বনে গান ধরেছে
ভিন দেশী কোন ময়না ॥

এই গানটির সুরে এমনই ঠুংরী ও পল্লীগীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ছিল যে সুরের যাদুকর রবিশংকর ও আলী আকবর পর্যন্ত অনলবাবুকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—'একে শুধু ঠুংরী না বলে ফুংরীও বলব।' সুরকার হিসেবে শিল্পীর বেষ্ট সেলার রেকর্ড ছিল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া 'মধুমতী যায় বয়ে যায়' গানটি। গানটি ১৯৬৪ সালে এইচ. এম. ভি. রেকর্ড করে। শিল্পীর মুখের কথাই

বলি—'শ্রীকান্ত-এর লেখা এই গানটিতে সুর দিয়ে ভাবলাম এটি যদি হেমন্ত, শ্যামল, সতীনাথ বা মানবেন্দ্র গায় তবে খুবই তৃপ্তি পাব। কিন্তু রেকর্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ গাওয়ালেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। তখন তরুণবাবু আমাদের হাওড়ার কালী ব্যানার্জী লেনেই থাকতেন। বহু বছর তিনি হাওড়ায় ছিলেন এবং বিয়েও করেন হাওড়ার মেয়েকেই। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও রেকর্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলার সাহস ছিল না। পরে অবশ্য দেখলাম কর্তৃপক্ষের বিবেচনাই যথার্থ। প্রচুর সুনাম ও আর্থিক সম্মান দুই-ই তাতে পেয়েছি।' আর একটি গানের সুরও সত্তরের দশকের শেষ দিকে বাংলা গানের আসরকে মাতিয়ে দিত। সেটি হল শ্যামল গুপ্তের লেখা ও অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে সন্ধ্যা মুখার্জীর গাওয়া—জলতরঙ্গ বাজে·········গানটি।
এছাড়া বেশ কয়েকটি ছায়াছবির যেমন 'পাশের বাড়ি', 'মহিলা মহল', 'বাঁশের কেল্লা', 'রিক্সাওয়ালা', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'গঙ্গা' প্রভৃতি বইতে তিনি সলিল চৌধুরীর সঙ্গে সহকারীরূপে কাজ করেছেন। মৃণাল সেনের 'রাত ভোর' ছবিতে তিনি ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্মভাবে সুর সংযোজনা করে শ্রোতাদের মনে আজও জাগতে হয়ে আছেন।
আর একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতকার ও প্লেব্যাক সিঙ্গারের সম্বন্ধে দুচার কথা বলেই এই প্রসঙ্গটির ছেদ টানা হবে। তিনি হচ্ছেন বালি গ্রামের তথা হাওড়া জেলার আধুনিক গানের শিল্পী সনৎ সিংহ। দেশ স্বাধীন হওয়ার বছর থেকেই জনসমক্ষে গাইতে শুরু করেন। জীবনের প্রথম রেকর্ড (১৯৪৬)—মাটির বুকেতে নাই প্রেম। গানের হাতেখড়ি দাদা কিশোরী মোহন সিংহ-র কাছে। তারপর শিক্ষা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পরে চিন্ময় লাহিড়ী। সনৎ সিংহ-র 'বাপুরাম সাপুড়ে, কোথা যাও বাপুরে' ঘুমপাড়ানি গানের মত বাংলার ঘরে ঘরে মা দিদিরা গেয়ে বাচ্চাদের মনে ছন্দের দোলা জাগিয়ে ঘুম পাড়াতেন। অনল চ্যাটার্জীর সুরে 'সরস্বতী বিদ্যাপতি তোমায় দিলাম খোলা চিঠি' তাঁর গলায় এক অনুপম ভাবরসে বঙ্গবাসীকে আপ্লুত করার শক্তি আজও রাখে। 'হংস মিথুন' ছায়াছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া 'মান করে নয় রাগ করে আজ চলে গেছেন রাই' সঙ্গীত পিপাসু বাঙ্গালী আজও ভোলেনি। সনৎবাবু বাংলার তথা ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের আহ্বান এড়াতে পারেননি। তাই ১৯৮১ সালে লণ্ডনে কমনওয়েলথ দেশের শিল্পী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যান। ১৯৮৩ সালে উত্তর আমেরিকায় তথাকার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বানে গান গেয়ে আসেন। তবে সনৎবাবুকে গানের রেকর্ড করাতে প্রথম সাহায্য করেন প্রফুল্ল ভট্টাচার্য (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের দাদা) যাঁর কথা তিনি আজও স্বীকার করেন। সত্তরের দশকে হাওড়া-শালিখার আর এক উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের অভিনেতা ছিলেন শ্যামল ঘোষাল। একাধিক ছবিতে অভিনয় করলেও 'হেডমাষ্টার' ছবিতে প্রধান শিক্ষক ছবি বিশ্বাসের

সঙ্গে নায়ক (প্রাক্তন ছাত্র) শ্যামলবাবুর কথোপকথন এখনও হয়তো অনেকের মনে থাকবে।

---

১. বাংলায় চলচ্চিত্রকার—নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়।
২. দীপালি—রজত জয়ন্তী সংখ্যা ১৯৫৩।
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. দেশ সাহিত্য সংখ্যা—১৩৮২।
৬. তেমন হাসির ছবি কই—রবি বসু—সাপ্তাহিক বর্তমান ১২. ১০. ৯১।
৭. প্রখ্যাত নটের স্ত্রী বড় কষ্টে বেঁচে আছেন—অশোক মান্না (সানন্দা—২৫শে জুলাই ১৯৯১)।
৮. আনন্দবাজার পত্রিকা—কলকাতার করচা স্বর্ণ জয়ন্তী ২৭. ৭. ৮৭।
৯. ঐ

হাওড়া শহরের নাগরিকদের নগর-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি তৈরি হয়েছিল আজ থেকে একশ পঁচিশ বছরেরও আগে। আজ অবশ্য অনেক মহকুমা শহরেও মিউনিসিপ্যালিটি তৈরি হচ্ছে। তবে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে একদা এশিয়ার দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যালিটি বলে আখ্যা দেওয়া হত। বর্তমানে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নামে (১৯৮৪ সালে) অভিহিত হচ্ছে। হাওড়া জেলায় বর্তমানে আরও দুটি মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে, যথা—বালি মিউনিসিপ্যালিটি ও উলুবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের পুর-প্রশাসনের কিঞ্চিৎ আলোচনা অবান্তর হবে না বলে মনে হয়। বঙ্গদেশে কবে কোন্ জেলায় প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি তৈরি হয়েছিল সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য গবেষকরা দিয়ে থাকেন। সরকারী তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে, কলকাতা প্রেসিডেন্সি ছাড়া বঙ্গদেশে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনে প্রথম আইন তৈরি হল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু আইনটি দশ বছর পর্যন্ত মৃতবৎ হয়ে রইল।

পরে ১৮৫০ খ্রীঃ ২৬নং ধারা বলে এক বিশেষ আদেশ নতুন করে জারি হল। এই আইনের বলেই প্রথম যে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হল তা হ'ল হুগলী জেলার উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি। Bengal Municipal Act গ্রন্থের রচয়িতা Mr. Pergiter লিখেছেন —Only one Municipality in Bengal viz. Uttarpara dates its birth from 1850.' কিন্তু Howrah Civic Companion-এর লেখক J. Bonnerjee লিখেছেন —'The real facts are the Uttarpara Municipality was first constituted on 14. 4. 1853 under Act XXVI of 1850. অপরপক্ষে স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় (B. P. Singha Roy) তাঁর রচিত Introduction to Bengal Municipal Act পুস্তকে লিখেছেন—'Only two Municipalities took advantage of the Act XXVI of 1850, i.e. Jamalpur and Monghyr now in Bihar, then in Bengal.[১] অপর এক গ্রন্থের রচয়িতা এ. জে. দাস. আই. সি. এস. তাঁর Darjeeling District Gazetteer, ১৯৪৭ লিখেছেন 'The Darjeeling Municipality was first constituted on 1st of July 1850.'

এসব সত্ত্বেও বয়সের প্রবীণত্বে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি প্রাচীনতম না হলেও আয়তনের বিস্তৃতিতে, জনসংখ্যার আধিক্যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্তনের গুরুত্বে, নগরী-শ্রেষ্ঠ কলকাতার সান্নিধ্যে থাকার সুবাদে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এশিয়ার

দ্বিতীয় বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটি বলে আখ্যা লাভ করেছিল। আজ অবশ্য তা কর্পোরেশনে উন্নীত হয়েছে। ১৮৬২ খ্রীঃ ৩রা ডিসেম্বর তারিখে সরকারের এক আদেশ বলে (যার নম্বর ছিল ৪৯৭৯) তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকার চৌদ্দজন সদস্য বিশিষ্ট হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কমিটি নামে প্রথম একটি কমিটি তৈরি করেন। এই কমিটির প্রথম সভা হয় ১৯.১.১৮৬৩ খ্রীঃ বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার Mr. G. Glowden-এর সভাপতিত্বে। কিন্তু প্রথম হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত হয় ১৮৬৪ খ্রীঃ ৩নং ধারা অনুসারে। কলকাতা গেজেটের ৪ঠা মে ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রকাশিত সংখ্যায় এগারোজন সদস্য-বিশিষ্ট হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্যদের নাম প্রকাশিত হয়। তাঁরা হলেন—

1. Mr. E. C. Craster, District Magistrate, Chairman.
2. Mr. [illegible]. Macnicol, Vice-chairman.
3. Dr. R. Bird M. D.
4. Mr. C. H. Denham C. E.
5. Mr. R. W. King.
6. Mr. W. Stalkartt.
7. Mr. I. Stalkartt.
8. Mr. R. N. Burgess.
9. Mr. D. W. Campbell.
10. Babu Gopal Lal Chowdhury.
11. Babu Khetra Mohon Mitter.
12. Babu Raj Mohan Bose.

এই তালিকায় ১ নম্বর নামটিকে পদাধিকার বলে সদস্য হিসাবে বাদ দিয়ে এগারজনের তালিকাটি পড়তে হবে। এখানে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল আইনে তার অন্তর্গত অঞ্চলগুলির নামও কলকাতা গেজেটের ৪.৫.১৮৬৪ খ্রীঃ নোটিশরূপে ছাপা হয়েছিল। তাতে অতিরিক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ছিল—বালি, নিশ্চিন্দা, ঠাকুরান চক, অভয়নগর, জোরহাট, আন্দুল, মহিয়াড়ি, বাঁকড়া, বালটিকুরি, জগাছা, জিগাছা, কোনা, দুর্গাপুর, সাতাশি, একসরা প্রভৃতি জায়গারও উল্লেখ আছে।[২]

পরে অবশ্য ১৮৮৩ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল থেকে বালি মিউনিসিপ্যালিটি আলাদাভাবে গঠিত হয় যা এখনও নিজ সামর্থ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যত্র এর কথা বলা হবে।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বোর্ডের প্রথম সভায় (৬.৫.১৮৬৪) ঠিক হয় যে সাতাশি, আন্দুল-মৌড়ি, কোনা ও রাজগঞ্জ প্রভৃতি এলাকাকে হাওড়া পৌরসভা থেকে বাদ দেওয়া হউক।[৩]

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল প্রথম বোর্ডের এগারজন মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ৬, ৭,

১১ ও ১২ নম্বর সদস্যরা সকলেই শালিখার অধিবাসী ছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের অবদানই এই বোর্ড গঠনে সর্বাধিক ছিল বলে জানা যায়। এঁদের পরিচিতি অন্যত্র দেওয়া হল।

এই বোর্ডের এগার সদস্যের মধ্যে মাত্র তিনজন সদস্য ভারতীয় ছিলেন। তাই ১৮৮৪ খ্রীঃ ১লা আগষ্ট এক নূতন আইন প্রবর্তিত হল; তাতে ঠিক হল যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হবেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ২৯শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর সর্বপ্রথম হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম নির্বাচনে ভোটার ছিলেন ২৬৫২ জন। শতকরা ৬১'০৫ জন ভোট দিয়েছিলেন।[৪] এখানে মনে রাখতে হবে যে তিরিশজন সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডের কুড়িজন হবেন নির্বাচিত—বাকি দশজন হবেন সরকার কর্তৃক মনোনীত। প্রথম নির্বাচিত সদস্যদের নামের তালিকা হল নিম্নরূপ[৫]—

ওয়ার্ড নম্বর	কমিশনারের নাম
১	পূর্ণচন্দ্র কুমার ও জটাধারী হালদার
২	অক্ষয় চ্যাটার্জী
৩	উপেন্দ্রনাথ মিত্র, দীননাথ সান্যাল, অনুকূল মিত্র
৪	রামেশ্বর মালিয়া, গিরীশ বসু
৫	উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, শিবচন্দ্র বসু
৬	নরসিংহ দত্ত, গঙ্গাধর ব্যানার্জী
৭	অমৃতলাল পাইন, গোপালচন্দ্র মিত্র
৮	রামচন্দ্র রায়চৌধুরী, চন্দ্রকুমার ব্যানার্জী ও গুরুচরণ রায়চৌধুরী
৯	তুলসীদাস মুখার্জী, হরিনাথ শর্মা
১০	কেদারনাথ ভট্টাচার্য

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে এখনকার মত প্রতি ওয়ার্ডের জন্য একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। কোন কোন ওয়ার্ড অত্যধিক বড় থাকায় দুজন বা তিনজন করেও প্রতিনিধি একই ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হতেন।

তদানীন্তন বোর্ডে ইংরেজ সিভিলিয়নদের কর্তৃত্ব ছিল সর্বব্যাপী। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ক্র্যাষ্টার পদত্যাগ করেন। তাই ৭ই এপ্রিল শালিখার অধিবাসী উপেন্দ্র নাথ মিত্র (যাঁর নামে উপেন্দ্র মিত্র লেন) প্রথম ভারতীয় যিনি বে-সরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচনে বিধিগত ত্রুটি থাকায় তাঁর নির্বাচন অবৈধ বলে বিবেচিত হওয়ায় সিভিল সার্জেন ডাঃ পিলচার চেয়ারম্যান হন। আর সাঁত্রাগাছির অধিবাসী কেদারনাথ ভট্টাচার্য প্রথম বে-সরকারী ভারতীয় ভাইস-চেয়ারম্যান হন।

১৮৯১ খ্রীঃ আবার বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র বোর্ডের বে-সরকারী প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু এবার তিনি অসুস্থতাবশত উক্তপদে যোগ দিতে অসমর্থ

হয়ে ঐ পদে ইস্তফা দেন।[৬] সরকারী তথ্য বলছে যে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত জেলা শাসকরাই অর্থাৎ ইংরেজ সিভিলিয়নরাই বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে আসছিলেন। এতদিন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত ও নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগু-চেমস ফোর্ড অ্যাওয়ার্ডে স্বায়ত্ত-শাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি করা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে অবশ্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি নাগরিকদের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছে—যেমন ১৮৯৬ খ্রীঃ পানীয় জলের জন্য শ্রীরামপুরে ওয়াটার ওয়ার্কস চালু হল। তারপর ১৮৯৮ খ্রীঃ হাওড়া শহরে চালু হল গ্যাসের আলো। এই গ্যাস সরবরাহের ভার নিয়েছিল ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানি। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলতে লাগলো। 'নগর হাওড়া' গ্রন্থের রচয়িতা অলোককুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—সে যুগে সারা বর্ধমান ডিভিসনে যে কটি প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটি ছিল তাদের মধ্যে হাওড়া ছাড়া অন্য কোথাও আলোর ব্যবস্থা ছিল না।

১৯১৬ খ্রীঃ হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। এই সালেই দক্ষিণ হাওড়ার অধিবাসী মহেন্দ্রনাথ রায়-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হাওড়া পৌরসভার প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান (১৯১৬-২০)। শ্রীরায় চার বছরের জন্য চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে কিছু কিছু নূতন ব্যবস্থা চালু করে যান, যেমন—কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের প্রচলন, হাওড়া পৌরসভার একটি মুদ্রিত ম্যানুয়েল প্রকাশ ও পৌরসভায় সারভে বিভাগ প্রবর্তন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল তাঁরই আমলে হাওড়া শহরের বিভিন্ন পাকা রাস্তায় গ্যাসের বাতির অবসান এবং বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্তন। ১৯১৬ খ্রীঃ হাওড়া শহরের রাস্তায় গ্যাসের বাতি উঠে যায়।[৭]

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯১৯ খ্রীঃ মণ্টেগু চেমসফোর্ড অ্যাওয়ার্ডে স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগে ভারতীয়দের অংশগ্রহণে দাবি জানানো হয়েছিল। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনেও যে রাজনৈতিক দলের প্রভাব পড়বে তাতে আর সন্দেহের কি আছে! হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতেও তাই দেখা গেল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই পৌরসভার নির্বাচনে দলের প্রার্থী দিয়ে প্রথম নির্বাচনে অবতীর্ণ হল ১৯২৪ খ্রীঃ। এ ব্যাপারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রধান নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষ্যে দেশবন্ধুকে হাওড়া শহরে অনেক সভা করতে হয়েছিল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সেদিন জয়ী হয়েছিল ১, ২, ৩ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। আর তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রামকৃষ্ণপুরের চারুচন্দ্র সিংহ। তাঁর দল জিতলেন (স্বভাবতই ইংরেজ ঘেষা) ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। বলা বাহুল্য, দেশবন্ধুর অত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও চারু সিংহমশায়ের নিকট কংগ্রেস প্রার্থীদের সেদিন পরাজয় ঘটেছিল। পক্ষান্তরে

তদানীন্তন তিন নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুর মনোনীত তিনজন কংগ্রেস প্রার্থীই জয়ী হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন শালিখার বিজয়কুমার মুখার্জী, পঙ্কজকুমার ঘোষ ও খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এই নির্বাচন উপলক্ষে স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভা করেছিলেন। তার মধ্যে শালিখার ক্ষেত্রমিত্র লেনের আর্য সমাজ ও পারিজাত সিনেমার কাছে ধর্মতলা মাঠের সভার দৃশ্য এখনও অনেক প্রবীণদেরই স্মৃতিতে ভাসছে। আর্য সমাজের সভায় কিছু ইংরেজ শাসকের পক্ষপুষ্ট সমর্থক তাঁর সভায় বাধা দান করার অপচেষ্টা করে। ঐ সভা শেষ করে তিনি যখন ধর্মতলার সভায় বক্তৃতা করতে যান তখন তাঁকে সেই সভায়ও বক্তৃতা করতে দেওয়া হয়নি। কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধীরা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো বাতাসে ছড়িয়ে সভা পণ্ড করে দিয়েছিল। নির্বাচনের দিন রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলে স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ করজোড়ে ভোটারদের কাছে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবার আবেদন জানালেও বিত্তশালী চারুচন্দ্র সিংহের বিরোধীতায় সেদিন চিত্তরঞ্জনের আবেদন পর্যন্ত ব্যর্থ তায় পর্যবসিত হয়েছিল। ফলে চারুচন্দ্র সিংহ দ্বিতীয়বারও চেয়ারম্যান হন। তিনি ১৯২০ থেকে ২০. ৮. ২৮ তারিখ পর্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন।

হাওড়া পৌরসভা কর্তৃক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা তাঁরই আমলে প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে 'বীসে স্কীম' (Bisse Scheme) অনুযায়ী সরকারও পঞ্চাশ শতাংশ অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে এলেন। কার্যকালে আরো কয়েকটি সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত হয়। যেমন, কমিশনারদের মাসিক বা পাক্ষিক সভায় সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হল।[৮] তা আজও বহাল আছে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আজকে যে নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে তা হাওড়া পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রথম চালু হল ১৯২৫ সালের নির্বাচনে।

হাওড়া পৌরসভা স্থাপনাকাল থেকে এতদিন পর্যন্ত কোন শ্রমিক ধর্মঘট এখানে হয়নি। কিন্তু ১৯২৭ খ্রীঃ এই চারুবাবুর আমলেই জঞ্জাল পরিষ্কার বিভাগের মজুররা মাহিনা বৃদ্ধির দাবিতে প্রথম ধর্মঘট করল। কর্তৃপক্ষ মাসিক আট টাকা মজুরী বৃদ্ধি করে সে বছর ধর্মঘট মেটালেও ১৯২৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে আবার ধর্মঘট হয়। এবারও মাসিক আট টাকা মজুরী বৃদ্ধি করে ধর্মঘট মেটানো হয়।

চারুবাবুর আমলের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে হাওড়া বেলিলিয়াস পার্কের ভার পৌরসভার হাতে হস্তান্তরিতকরণ। বেলিলিয়াস পার্ক আসলে আইজ্যাক র‍্যাফিয়েল বেলিলিয়াস নামে জনৈক ইহুদী ধনাঢ্য ব্যক্তির বাগানবাড়ি ছিল। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই একশ বিঘার বিরাট বাগান বাড়ির স্বত্বাধিকারিণী হন তাঁর পত্নী রেবেকা আইজ্যাক। জনদরদিনী ও লোকপ্রিয়া শ্রীমতী রেবেকা তাঁর স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার্থে ও জনহিতার্থে উক্ত সম্পত্তিটিকে জনগণের সেবায়ই দান করে দেন। সুদৃশ্য বাগান, বিরাট জলাশয়, ফুটবল খেলার মাঠ, সুন্দর ফুলের বাগান ও কুঞ্জবন সহ এই বাগান বাড়িটির অন্যতম প্রধান

ন্যাস (ট্রাস্টি) সুরঞ্জন দত্ত চেয়ারম্যান চারুবাবুর হাতে পৌরসভাকে হস্তান্তর করেন। এই বাগানের বাড়িটিতেই হাওড়ায় প্রথম কলেজ নরসিংহ দত্ত কলেজ ১৯২৪ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাগানের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে হাওড়া সিভিক কম্পানিয়নের লেখক জে. বোনার্জী লিখছেন—It can be compared with any of the best Calcutta parks. কিন্তু দুঃখের হলেও বাস্তব সত্য এই যে আজ তার রূপ দর্শনে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই উদ্রেক করে না।

চারুবাবুর পরেই হাওড়া কোর্টের তথা বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ফৌজদারী ব্যবহারজীবী বরদাপ্রসন্ন পাইন চেয়ারম্যান হন। কিন্তু বিশেষ আইনঘটিত ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় শ্রীপাইন চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন। ফলে শালিখার খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রথমে ভাইস-চেয়ারম্যান ও পরে অ্যাকটিং চেয়ারম্যানও হন। বরদাপ্রসন্নের এই ইস্তফা নিয়ে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটিতেও ভীষণ তোলপাড় হয়েছিল। এ ব্যাপারে স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও আসরে নামতে হয়েছিল। কারণ শ্রীচট্টোপাধ্যায় ছিলেন তখন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। আর খগেনবাবুও তার আগেই ছিলেন জেলা কমিটি কংগ্রেস সভাপতি। খগেন্দ্রনাথের উপর শরৎচন্দ্রের যে কিরূপ আস্থা ছিল তা নিচের চিঠি[১] থেকেই প্রকাশ পাবে—

Samtaberia, Panitras P. O.
Dist.—Howrah
23.1.29

My dear Khagen Babu,

According to our party decision Babu Haran Chandra Bhattacherjee and some of his friends and fellow-members of the Ward V had come to me the other night and had expressed their perfect willingness to go on with their usual work in the Ward Committee as they had been doing previously to this unfortunate difference between themselves and the Chairman of the Municipality.

That it was a very very regretable affair all admitted and promised to forget without going into details any further. Whatever that might have happened due mainly to misunderstanding.

Yours affectionately,
S/d. Sarat Chandra Chatterjee

খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী অ্যাকটিং চেয়ারম্যান হিসেবে বছর খানেক থাকার পর রামকৃষ্ণপুরের বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত ১৯৩৮ পর্যন্ত চেয়ারম্যান হন। যদিও এই বরদাপ্রসন্ন পাইনই আবার নিজ ক্ষমতা বলে ১৯৩৮ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রীঃ এপ্রিল মাস পর্যন্ত আবার চেয়ারম্যান পদে আসীন হন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে বরদা-

বাবুর বোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন মৌলবী মহম্মদ শরিফ খান। খুব সম্ভবত তিনিই হাওড়া পৌরসভার প্রথম মুসলমান ভাইস-চেয়ারম্যান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুসলমানদের পক্ষে জনপ্রতিনিধিত্ব দেবার জন্য একটি বিশেষ কনস্টিটুয়েন্সি তৈরি করা হল। তাতে প্রথম যে পাঁচজন মুসলমান জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন—ওয়ার্ড এ—মুন্সী জেল্লার রহিম, ওয়ার্ড বি—মৌলবী মহম্মদ শরিফ, ওয়ার্ড সি—খান সাহেব গুলাম রবানি, ওয়ার্ড ডি—মৌলবী আব্দুল্লা আজিজ, ওয়ার্ড ই—ডাঃ শফিক আহমেদ।* খুব সম্ভব এই নির্বাচন শুরু হয় বিংশের দশকের দ্বিতীয় অর্ধে।

হাওড়া পৌরসভার আর এক উল্লেখযোগ্য চেয়ারম্যান হচ্ছেন শালিখার অধিবাসী শৈলকুমার মুখার্জী। শৈলকুমারের আমলে হাওড়া পৌরসভার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজ প্রবর্তিত হয়। যেমন জঞ্জাল পরিষ্কারে কাজে গো-যানের পরিবর্তে লরির প্রচলন, S. N. Modak's Award[১০] অনুযায়ী পৌরকর্মীদের প্রথম গ্র্যাচিউটি চালুকরণ, পে-স্কেলের গ্রেড পরিবর্তন, পৌরসভার বর্তমান সীল প্রবর্তন (আগে সীল ছিল রেল ইঞ্জিন), বেলগাছিয়ায় ট্রেনচিং গ্রাউণ্ডে দেশী সার প্রস্তুত কেন্দ্র স্থাপন এবং পৌরসভার নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে ঠিকাদারের বদলে পৌরসভার নিজস্ব কর্মী দিয়ে রাস্তা তৈরি বা মেরামতের ব্যবস্থা ইত্যাদি। শালিখায় তুলসীরাম লক্ষ্মীদেবী জয়সোয়াল প্রসূতি হাসপাতাল ও সত্যবালা সংক্রামক হাসপাতাল দুটি স্থাপন তাঁর জনহিতকর কাজের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কুড়িটি আসনে নির্বাচন হত—বাকি দশটি ছিল মনোনীত আসন। শৈলবাবুর আমলেই এই দশটি আসনেও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে হাওড়া পৌরসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা তাঁরই আমলে চালু হয়। হাওড়া ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক সংবর্ধনা তাঁর পৌর প্রধানের কার্যকালের আর এক স্মরণীয় ঘটনা। পরবর্তী জীবনে তিনি স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দ্বিতীয় স্পিকার ও স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী ও আরও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী পদেও আসীন হয়েছিলেন।

পৌরসভাগুলিকে সুপারসিড করা বা সরকার কর্তৃক পরিচালনার ভার গ্রহণ করা আজকে একটি সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় স্বায়ত্ত-শাসনের ধ্যানধারণার পরিপন্থী বলে অনেকেই মনে করেন। কিন্তু হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ইতিহাসের পাতা উলটালে দেখা যাবে যে ইংরেজ আমলেই তদানীন্তন বিদেশী সরকার সর্বপ্রথম এই পৌরসভাটিকে সুপারসিড করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল খুবই রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। ইংরেজ রাজপুরুষরা বিশ্বযুদ্ধে সর্বক্ষেত্রেই প্রায় পিছু হটছেন। ভারতের অভ্যন্তরে চলছে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়'

---

* হাওড়ার প্রথম ভারতীয় জেলা জজ।

আন্দোলনের চরম সংগ্রাম। অধিকাংশ স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিই কংগ্রেসের দ্বারা চালিত হচ্ছে। এর প্রতিফলন হাওড়া পৌরসভায়ও দেখা দিল। তদানীন্তন বোর্ডের সঙ্গে বিদেশী শাসকদলের প্রচন্ড মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেস দলের সভা হল শালকের 'রামাবাসে' বিজয়কুমার মুখাজীর (শৈলবাবুর দাদা) উপস্থিতিতে। সভায় ঠিক হয় কংগ্রেস নেতা বরদাপ্রসন্ন পাইনই চেয়ারম্যান হবেন। সদস্যরা সকলেই বাড়ি চলে যান। কিন্তু এই প্রস্তাব শৈলকুমারের পছন্দ হল না। রাতারাতি তিনি পাইনের বিরুদ্ধে সই সংগ্রহে তৎপর হলেন। তাঁর এই কাজে শালকের কমিশনার বনওয়ারীলাল রায় এবং মধ্য হাওড়ার কমিশনার সন্তোষকুমার দত্ত প্রধান সহায় হন। এই সন্তোষবাবুই স্বাধীন ভারতে লোকসভার হাওড়া শহরের প্রথম সদস্য নির্বাচিত হন। ভোটাভুটিতে শৈলবাবু হাওড়া পৌর-সভার সেবার চেয়ারম্যান হলেন। ফলে বরদাপ্রসন্ন কংগ্রেস ছেড়ে তদানীন্তন খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই তিনি ভারতরক্ষা আইনের জরুরী ক্ষমতায় এক সরকারী আদেশ বলে ৯. ৬. ১৯৪৪ খৃীঃ হাওড়া পৌরসভাকে সুপারসিড করলেন। জেলার তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. H. M. Nomani-কে প্রশাসক নিয়োগ করা হল।

সরকারের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড কোন প্রতিবাদ না করলেও ব্যক্তিগতভাবে শালিখার তিন কমিশনার মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আনন্দের কথা, হাইকোর্টের বিচারে সরকারী আদেশ খারিজ হয়ে যায়। Howrah Civic Companion লিখছে—But on a representation by three Commissioners, the Hon'ble High Court restrained him from acting as Executive Officer and the order was declared null and void.—এই তিন কমিশনারের নাম সিভিক কম্প্যানিয়ানে উল্লিখিত হয়নি। এঁরা হলেন শালিখারই আমৃত্যু বাসিন্দা শৈলকুমার মুখাজী, বনওয়ারীলাল রায় ও জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র।[১১]

ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়। বিদেশী শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় তদানীন্তন বাংলাদেশের সরকার মর্যাদার প্রশ্নে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন। এবারে কিন্তু বনওয়ারীলাল রায়কে সরকারের বিরুদ্ধে একাই লড়তে হল। সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়েছিল। তিনি মোকদ্দমা লড়বার জন্য লন্ডনের বিখ্যাত আইনবিদ্ স্যার ডি. এন. প্রিট্‌কে নিয়োগ করেছিলেন। সুখের কথা, শেষ পর্যন্ত ওখানেও বনওয়ারীলালের জয় হল। আজ সেটি একটি ইতিহাসের নজির হয়ে রয়েছে।

রাজনীতি এমন এক ব্যাপার যে তার রং পরিবর্তন হতে বেশি সময় লাগে না। যে আদর্শের ধ্বজা উড্ডীন রাখতে শৈলকুমারের নেতৃত্বে হাওড়া পৌরসভাকে সুপার-সেশনের হাত থেকে বাঁচানো হল, সেই শৈলকুমার মুখাজীই পুরোভাগে থেকে ১৯৫৪ খ্রীঃ তদানীন্তন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লকের (ইউ. পি. বি.) নেতৃত্বে

পরিচালিত হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিকচন্দ্র দত্তের বোর্ডকে সুপারসিড করা হল।

১৯৫১ খ্রীঃ হাওড়া পৌরসভার এই নির্বাচন শুধু হাওড়াবাসীকেই ভাবিয়ে তোলেনি এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমস্ত নির্দল ও বামপন্থীরা একত্রিত হয়ে সেবার নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। হাওড়া পৌরসভার নির্বাচন যুদ্ধে এই প্রথম প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচন যুদ্ধে ইউ. পি. বি. দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে হাওড়ার কার্তিকবাবু চেয়ারম্যান হন এবং শালিখার শঙ্করলাল মুখার্জী ভাইস চেয়ারম্যান হন। কংগ্রেসের এই পরাজয়ের সংবাদ 'নিউইয়র্ক টাইমস' পর্যন্ত বড় করে ছেপেছিল এবং কংগ্রেসকে বামপন্থীদের আগমন সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দিয়েছিল।

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট গঠন শৈলকুমার মুখার্জির অন্যতম কৃতিত্ব হাওড়া পৌরসভাকে কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনাও তিনি প্রথম করেছিলেন। কর্পোরেশন পর্ব শুরু হওয়ার আগে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির শেষ চেয়ারম্যান হলেন নির্মলকুমার মুখার্জী। নির্মলবাবুর পর আবার সুপারসিড হয় এবং ১৯৭৭ খ্রীঃ বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এলে সরকার মনোনীত বোর্ড গঠিত হয়—যার সভাপতি ছিলেন শালিখার আলোকদূত দাস। পরে অবশ্য এক সরকারী আদেশে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত করা হল ১৪. ২. ৮৩ তারিখে।

হাওড়া কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন হয় ৮. ৭. ৮৪ তারিখে। এই নির্বাচনে পৌরসভার সীমাবৃদ্ধি করা হয়। পূর্বের আসন সংখ্যা (৩০) বৃদ্ধি পেয়ে কর্পোরেশনের আসন সংখ্যা নির্ধারিত হয় পঞ্চাশে। উনসানী, কোনা, বালটিকুরী, জগাছা ও ইছাপুর অঞ্চল নূতন করে কর্পোরেশন এলাকাভুক্ত করা হয়। অল্ডারম্যানের আসন রাখা হল মোট তিনটি। কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে (১৯৮৪) বামফ্রণ্ট পেল ছাব্বিশটি আর কংগ্রেস (ই) পেল চব্বিশটি আসন। আনুপাতিক হারে বামফ্রণ্ট পেল অল্ডারম্যানের ২টি আসন আর কংগ্রেস (ই) পেল একটি আসন। হাওড়া কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হলেন শালিখার অধিবাসী আলোকদূত দাস। মেয়র নির্বাচনের দিন ছিল ৯. ৮. ৮৪ তারিখ। নতুন নিয়মে কর্পোররেশনের কাজ শুরু হয় ২১. ৮. ৮৪ তারিখ থেকে। হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের প্রথম অল্ডারম্যান হন—বামফ্রণ্টের প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও স্বদেশ চক্রবর্তী এবং কংগ্রেস (ই) পক্ষ থেকে অশোককুমার মল্লিক।

বালি পৌরসভা—হাওড়া পৌরসভা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে প্রথমে বালিও ঐ পৌরসভার অন্তর্গত ছিল। ১৮৬৪ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রিলের সরকারী আদেশে এই বিজ্ঞপ্তিই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীঃ **Bengal**

Municipal Act স্বায়ত্তশাসনের পরিধি আরও বিস্তৃত করে। ফলে ১৮৮৩ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল থেকে হাওড়া পৌরসভা থেকে আলাদা করে বালিকে একটি স্বতন্ত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌরসভা করা হল।[১২] সেই থেকে আজও পর্যন্ত এই পৌরসভাটি চলে আসছে। এখনকার দিনে ইংরেজ রাজপুরুষেরাই পৌরসভাগুলির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতেন। কিন্তু বালি পৌরসভা সে পথে না গিয়ে গ্রামের সুযোগ্য সন্তান ডাঃ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম চেয়ারম্যান করে পৌর বোর্ড তৈরি করল। বাকি এগারজন কমিশনারকে ঐ বোর্ডের সদস্য রূপে মনোনীত করা হল। এঁদের নাম হল—বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (শাস্তিরাম বাবু), শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ গোস্বামী, জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন ঘোষাল, গোপাল গাঙ্গুলি, নবীন পাঠক, মতিলাল সরখেল ও হরি চক্রবর্তী। প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান হন অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।[১৩] সে যুগে ইংরেজ রাজপুরুষ-বর্জিত এই বোর্ড গঠনে 'বালি সাধারণী সভার' কর্তৃপক্ষের জাতীয়তাবোধের এটি এক নির্ভীক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কারণ বালি পৌর বোর্ড গঠনের মূল প্রেরণাদাতা হচ্ছে 'বালি সাধারণী সভা।' ১৮৮০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত এই সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানটি বালির নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এগিয়ে আসে।

সর্বপ্রথম খাস বালি নিয়ে পৌর বোর্ড গঠিত হলেও ১৮৮৪ খৃীঃ বেলুড় গ্রাম এতে সংযুক্ত হয় এবং আরও পরে ১৯২৪-২৫ লিলুয়া গ্রামও এই পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৪] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাওড়া পৌরসভার মতই কিছু সদস্য নির্বাচিত ও কিছু সরকার কর্তৃক মনোনীত হবার প্রথা ছিল। বালি পৌর প্রতিষ্ঠানের শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থে 'শতবর্ষের আলোয় পুরদর্শন' প্রবন্ধে শীতাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌর সভার সকল সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। তৃতীয় পর্যায়ে ১২ জন সদস্য ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত ও ৬ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ছিলেন। এই প্রথম নির্বাচনটি (১৮৯০) পরিচালনা করেন হাওড়ার জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সম্ভবত তৎকালে কর্মরত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।* উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিকদের ভোটাধিকার থাকলেও, তখনও জনগণের কম উৎসাহ ছিল না। ভোট এলে শুধু কলকাতায়ই উৎসাহের সৃষ্টি হত না—ক্রমে ক্রমে সারা শহরেও ভোটরঙ্গের প্রভাব বেশ ছড়িয়ে পড়তো। বালির ভোটরঙ্গ সেদিক থেকে উল্লেখ্য ছিল—বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

'ধুম শুধু কলিকাতায় নয় ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল জেলায়—আজ কলিকাতা, কাল ঢাকা পরশু বালি, ওতোরপাড়া।'

---

* বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় (তখন হাওড়াকে 'হাবড়া' লেখা হত) তিনবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। প্রথম ১৮৮৩, দ্বিতীয় ১৮৮৫ ও তৃতীয় বার ১৮৮৭ খ্রীঃ।

হাওড়া পৌরসভার মত বালি পৌর সভাতেও বহু বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত সুনাম, প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা ভোটাররা প্রভাবিত হতেন। রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়ে বালি পৌর সভায় প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৮-২৯ খৃীঃ। তাতে কংগ্রেস মাত্র চারটি আসন লাভ করেছিল।[১৫]

অপরপক্ষে ১৯৫৬ খৃীঃ বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত 'নাগরিক সমিতি'র নামে একতাবদ্ধ হয়ে ভোট লড়ে। আসলে কিন্তু প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই ভিন্ন ভিন্ন নিজ দলের প্রতীক নিয়েই পৌর নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। বর্তমানে এই নাগরিক সমিতির প্রতিনিধিরাই পৌরসভা চালাচ্ছেন। তবে সরকারী অধিগ্রহণ যে হয়নি তাও নয়। ১৯৫৩ ও ১৯৬৩ খৃীঃ দুবার সরকারী প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে বালি গ্রামের পৌর উন্নতিতে যেমন 'ছিরে' (শ্রীচরণ মুখার্জী), বীরে (বীরেশ্বর চ্যাটার্জী) শান্তিরাম (অবিনাশ ব্যানার্জী) তিন নিয়ে বালী গ্রাম' প্রবাদে পরিণত হয়েছিল তেমনি একই পৌর এলাকা বেলুড়ের উন্নতিতেও লোকমুখে প্রচারিত হত—

'হারান* বিপিন দীননাথ এই তিন নিয়ে বেলুড় মাত।'[১৬]

উলুবেড়িয়া পৌর সভা—বালি পৌরসভা স্বতন্ত্র হয়ে গড়ে উঠার পর ১৯০৩ খৃীষ্টাব্দে উলুবেড়িয়াতেও একটি পৌরসভা তৈরি হয়। কিন্তু ঐ পৌরসভাটির অস্তিত্ব ১৯০৭-এ লোপ পায়। পরে ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতায় এলে পৌরসভাটি নূতন করে আবার গঠিত হয় ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সাল। তবে সরকার বটকৃষ্ণ দাস ও প্রদীপ দাসকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনিত করে কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু প্রথম নির্বাচন হল ২২.৫. ১৯৮৮ সালে। পৌর সভার মোট নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা হচ্ছে উনিশ। প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান হন যথাক্রমে বটকৃষ্ণ দাস ও অলক বিকাশ সিংহরায়।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত ঃ জনগণের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েত প্রথা চালু হল দেশ স্বাধীন হবার পর। পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৪টি সালে ১৬টি জেলা পরিষদ গঠিত হল। হাওড়া জেলা তার মধ্যে অন্যতম। হাওড়া জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রথম সভাপতি ও সহ-সভাপতি হলেন যথাক্রমে ডোমজুড়ের বিশ্বরতন গাঙ্গুলী ও বাগনানের জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার। তাঁরা কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হন।

'ইংরাজ আমলে এই জেলা পরিষদের নাম ছিল হাওড়া ডিষ্ট্রিকট বোর্ড। এটি গঠিত হয় ১৮৮৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর। প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সমকালীন আইনানুসারে জেলা শাসক মিঃ ই. ভি. ওয়েষ্ট ম্যাকট্।'[১৭] বলা বাহুল্য, পদটি

* হারান=হারানচন্দ্র মুখার্জী, বিপিন=বিপিন কৃষ্ণ কুমার, দীননাথ=দীননাথ ঘোষ।

ছিল পদাধিকার বলে। ১৯২০ সালে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রথম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে আশুতোষ বসু ও ব্যারিস্টার এস. পি. রায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে গান্ধীজির স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৯৫৬ সালে সারাদেশে পঞ্চায়েত আইন পাশ হল। পশ্চিমবঙ্গে চার স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৬৪ সালে। ১৯৭৩ সালে আইন সংশোধিত হয়ে চারস্তরের পরিবর্তে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা হল। কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত হল ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। এই নির্বাচনে জেলার পঞ্চায়েতগুলিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করল বামফ্রন্টের প্রার্থীরা। এই বারের নির্বাচনের উল্লেখ্য তাৎপর্য হল আঠার বছর পর্যন্ত সব যুবক-যুবতীরা এই নির্বাচনে ভোট দিতে প্রথম অধিকারী হয়। ত্রিস্তরের প্রথম জেলা সভাধিপতি ও উপ-সভাধিপতি হন যথাক্রমে শিবপদ সেনগুপ্ত ও সিরাজউদ্দিন আহমেদ।

এ প্রসঙ্গে একটি নতুন তথ্য সংযোজন করার লোভ ছাড়া যাচ্ছে না। পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েতী রাজের পথ প্রদর্শক হচ্ছে এই হাওড়া জেলা। সারা ভারতে পঞ্চায়েতী প্রথা দেশ স্বাধীন হবার কয়েক বছর পরেই শুরু হলেও পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এটা সকল রাজ্যের শেষেই চালু হয়েছিল। কারণ পশ্চিমবঙ্গের তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে কোন কারণেই হউক এই ব্যবস্থা চালু করতে প্রথমে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁকে এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে অনুরোধ করেন। কারণ ভারতের এ রাজ্যটি ছাড়া সব রাজ্যেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সেইমত ডাঃ রায় পশ্চিম বঙ্গের হাওড়া জেলার শ্যামপুর ব্লকে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করলেন ১৯৫৭-৫৮ সালে। আনন্দের কথা এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে শ্যামপুরের গ্রামীন মানুষের সার্বিক উন্নতিতে জনসমর্থন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হল। তারপর থেকে পশ্চিম বাংলার সব কটি জেলাতেই এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। আজ সেই পঞ্চায়েতীরাজ পশ্চিম বাংলার উন্নতিতে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। সুতরাং হাওড়া জেলাকে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত গঠনের অগ্রদূত বলতে বাধা কোথায়।*

হাওড়া টাউন হল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেই এই অধ্যায়টি শেষ করা হবে। হাওড়া জেলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে টাউন হলের প্রভাব উল্লেখ করার মত। আজ শহরের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু পাবলিক হল ও মঞ্চ তৈরি হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে হাওড়ার এক সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন নাগরিকরা এরকম একটি বড় সভামঞ্চের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেন। তাই 'দি হাওড়া পিপলস এসোসিয়েশন' নামে একটি নাগরিক সমিতি তদানীন্তন জেলা

---

* এই তথ্যটি আমাকে জানিয়েছেন হাওড়া জেলার প্রথম নির্বাচিত জেলা বোর্ড সভাপতি বিশ্বরতন গাঙ্গুলী।

শাসক সি. ই. বাকল্যাণ্ডকে একটি হল নির্মাণে ১৮৮৩ সালে লিখিত আবেদন করেন।[১৮] বাকল্যাণ্ড সাহেব তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একটি নক্সাও তৈরি করান। মিউনিসিপ্যাল অফিসের দোতলায় হলটি করার জন্য আনুমাণিক ব্যয় ধরা হয় ২৬ হাজার ৫ শত টাকা এবং আসবাবপত্র ও দরজা জানালার জন্য আনুমাণিক ব্যয় ধরা হয় ২৮ হাজার ৫ শত টাকা।[১৯] 'একটি ট্রাস্ট ডীড' তৈরি করা হয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার্সদের নামে। ১৮৮৩ সালের ৩০শে মার্চ উক্ত ডীডের দলিল তৈরি করা হয়। এক বছরের মধ্যে হলটি তৈরি হয়ে যায়। '১৮৮৪ সালে মার্চ মাসে এই হলটি উদ্বোধন করেন তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট। সে সময় চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ এফ. এইচ. স্ক্রীন।'[২০] যদিও খরচ মেটাবার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সু-প্রসস্ত কাঠের পাটাতনের এই হলটির পূর্বদিকের দেওয়ালে আছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব তৈল চিত্র, আর পশ্চিম দেওয়ালে আছে মানবজাতির অন্যতম মুক্তি সাধক ধ্যানরত গৌতমবুদ্ধের তৈল চিত্র। মহাত্মা গান্ধীর দুই পাশে আছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের পূর্ণাবয়ব তৈল চিত্র। এছাড়া উল্লেখযোগ্য চিত্র হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কাজী নজরুল ও আরও অনেকের। এই সব চিত্রগুলির মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাসের তৈলচিত্রটিই যে সর্বপ্রথম টাঙানো হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহাত্মা গান্ধীর তৈল চিত্রটি মাঝখানে থাকলেও ওটি টাঙানো হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। কিন্তু দেশবন্ধুর চিত্রটি স্থাপিত করা হয় ১৯২৬ সালের ১০ই জুলাই। আর ওটি স্থাপনা করেন দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু। সেই অনুষ্ঠানে তদানীন্তন হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী হাওড়া বাসীর পক্ষ থেকে শ্রীমতী নাইডুকে মানপত্র দিয়েছিলেন।[২১]

পাঠক হয়তো জেনে থাকবেন যে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ মুরারি পুকুরের বোমার মামলায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন। জেলের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দ মা ভবতারিণীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি প্রকাশ্য যে সভায় প্রথম বক্তৃতা করেছিলেন সেটি ছিল হাওড়া টাউন হল। আর সেই সভাটি ছিল টাউন হলের উদ্যোক্তা 'দি হাওড়া পিপলস এসোসিয়েশন'-এর বার্ষিক সভা। সেদিন ছিল রবিবার, ২৭শে জুন, ১৯০৯ সাল।[২২] বক্তৃতার বিষয় ছিল—'দি রাইট অব এসোসিয়েশন।' সেই বৃহৎ বক্তৃতা এখানে তুলে ধরার অবকাশ নেই। তবে বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয়দের স্বাধীন মত প্রকাশ ও সংঘ-সংগঠন করার উপর ইংরেজ শাসকের বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতনমূলক আইন কাননের বিরুদ্ধে। শ্রীঅরবিন্দ বক্তৃতার শেষে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগঠন গড়ার অধিকার রক্ষার জন্য যে কোন মূল্য দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। শেষ কটি লাইন উল্লেখ করা হল। তিনি বলেছিলেন--Our nation will rise whatever law they make ; our nation will rise and live

by the force of the law of its own being. For the fiat of god has gone out to the Indian nation, 'unite, be free, be one, be great.' শ্রীঅরবিন্দের হাওড়া টাউন হলের সেদিনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আজ ভারতের সর্বদলীয় নেতাদের মুখে কি একই কথা শুনতে পাচ্ছি না ? তাই তো তিনি হয়েছিলেন ঋষি অরবিন্দ। সেই বক্তৃতার গৌরব হাওড়াবাসীর স্মৃতিতে ধরে রাখবার জন্যই এই কটি কথা লেখা হল। অবশ্য ঐদিনই পরের বক্তৃতা দিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরীর (জয়কৃষ্ণ পাঠাগার) গঙ্গাধারের মাঠে।

---

১. Howrah Civic Companion—J. Bonnerjee.
২. ঐ
৩. ঐ
৪. Municipal Administration in Bengal--Part I. Howrah
Bijoy Krishna Bhattacharjee 1936.
৫. Howrah Civic Companion—J. Bonnerjee.
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. ঐ
৯. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০. Municipal Administration in Bengal—Part I. Howrah
Bijoy Krishna Bhattacharjee 1936.
১১. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২. বালি পৌর প্রতিষ্ঠান শতবর্ষের স্মারক গ্রন্থ।
১৩. ঐ
১৪. ঐ
১৫. ঐ
১৬. ঐ
১৭. শতবর্ষের আলোকে হাওড়া জেলা পরিষদ—দেবী ব্যানার্জী—১৮৮৬-১৯৮৬।
১৮. Howrah Civic Companion vol I.—J. Bonnerjee.
১৯. ঐ
২০. ঐ
২১. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২২. Speeches by Sri Aurobinda—2nd Edition. Nov. 1948.

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা হল। একদিকে উহা যেমন ভারতের গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস করল তেমনি বিলেতী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র কায়েম করার কাজও দ্রুত হাসিল করল। এর দ্বারা ভারতের দূর দূরান্ত থেকে শিল্পের কাঁচা মাল দ্রুত সংগ্রহ করে ভারতের তিন প্রধান বন্দরের মাধ্যমে ইংলণ্ডে চালান দেওয়ার পথও সুগম হল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ পুলিশ ও সেনাদলের গমনাগমনের দ্রুততা বাড়িয়ে প্রয়োজনমত ভারতীয়দের প্রতিরোধ আন্দোলনও দমন করার পথ সুগম হল। এক কথায় ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার কায়েমী স্বার্থ দৃঢ় করার পক্ষে এটা একান্তই প্রয়োজন ছিল। তাই ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলওয়ের প্রবর্তক লর্ড ডালহৌসী তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন—**The great social, political and commercial advantages to be gained from connecting the three Presidency cities.**[১]

বলা বাহুল্য, ভারতের শ্রমজীবী আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল রেলওয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। যদিও ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব হেতু মেশিনের প্রবর্তন হয়েছে—গড়ে উঠেছে পাট ও কাপড়ের মিল। ভারতের প্রথম পাটের কল তৈরি হল হাওড়া জেলারই পাশের জেলা হুগলীতে।[২] ১৮৫৪ সালে ভারতের প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠা হল রিষড়ায় 'অকল্যাণ্ড' নামে জনৈক নৌবিভাগের কর্মচারীর উদ্যোগে। যার বর্তমান নাম ওয়েলিংটন জুট মিল। তারও আগে ভারতে প্রথম কাপড়ের মিল গড়ে উঠেছিল এই হাওড়া জেলায়ই। ১৮১৮ সালে উলুবেড়িয়া মহকুমার বাউড়িয়াতে 'ফোর্টগ্লষ্টার মিল' নামে কাপড়ের কলটি গড়ে ওঠে। এইভাবে বাংলায় ও বোম্বাইতে যথাক্রমে পাটকল ও কাপড়ের কল অধিক সংখ্যায় অল্প কয়েক বছরের মধ্যে গড়ে উঠলো। ফলে শ্রমিকের সংখ্যাও প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যেতে লাগলো।

আস্তে আস্তে অপরাপর শিল্পের মধ্যে কয়লা, চা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্যই ইংরেজরা বাণিজ্যিক প্রয়াস শুরু করে দিল।

শুধু কলেকারখানায় কেন—ইংরেজরা কৃষিতেও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে মুনাফা লোটার জন্য কৃষিজীবী গ্রামবাসীদের উপরও অত্যাচার শুরু করে দিল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে চাষীরা অতিষ্ট হয়ে উঠলেই দেখা দিল 'নীল বিদ্রোহ।' কৃষিজীবী লোকেদের এই বিদ্রোহকে অমর করে রেখেছেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণ' নাটকে ও হরিশ মুখার্জীর "হিন্দু প্যাট্রিয়ট"-এ। অবশ্য এইভাবে সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ বা আন্দোলন শিল্পক্ষেত্রে এত তাড়াতাড়ি না হলেও কিন্তু বেশি দেরী

লাগলো না। কারণ বিদেশীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুনাফা—ভারতকে শোষণ করে, ভারতীয় শ্রমিককে বঞ্চিত করে কি করে এ দেশ থেকে টাকা ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাই ছিল তাদের মূলমন্ত্র। সুতরাং শ্রমিকদের সঙ্গে যে অর্থনৈতিক সংঘাত দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি !

শ্রমিকদের মজুরীর কথা বাদ দিলেও কাজের সময়-সীমার তেমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। মালিক শ্রেণী তখন সারা বিশ্বেই শ্রমিকদের ইচ্ছামত দিনে বার তের ঘণ্টা করে খাটাতো। আমরা জানি তারই প্রতিবাদে এবং দিনে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হে মার্কেটে'র শ্রমিকরা এক রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু শ্রমিকের জীবন উৎসর্গের ফলে পুঁজিপতিরা আট ঘণ্টা কাজের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। তাই ১৮৯০ সাল থেকে ১লা মে তারিখটি বিশ্বের 'শ্রমিক দিবস' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটলেও তাদের দেশের শ্রমিকরা কিন্তু এই দিবসটি শ্রমিক দিবস হিসেবে আজ আর পালন করে না।

কিন্তু পাঠক জেনে পুলকিত হবেন যে শিকাগো শহরে 'হে ডে'-র আগেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওড়া স্টেশনের রেল মজুররা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে প্রথম ধর্মঘট করেছিল। সালটি ছিল ১৮৬২, মে মাস।

তদানীন্তন 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়—'সম্প্রতি হাবড়ার (তখন হাওড়াকে হাবড়া বলা হত) রেলওয়ে স্টেশনে বারশ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমটিভ ডিপার্টমেন্টের মজুরেরা প্রত্যহ আট ঘণ্টা কাজ করে কিন্তু তাহাদিগকে দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্যস্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানী মজুরদিগের প্রার্থনা পূরণ করুন—নচেৎ লোক পাইবেন না।'

'সোম প্রকাশ' কেবল সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত ছিল না। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জোরালো ভাষায় কুলীদের দাবি সমর্থন করেছিল।

ভাবতেই অবাক লাগে যে ১৮৫৪ সালে হাওড়া স্টেশনে রেল চালু হবার আট বছরের মধ্যেই আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে হাওড়া স্টেশনের শ্রমিকরা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিল। সেই অর্থে হাওড়ার রেল শ্রমিকদের ঐ বীরত্বপূর্ণ লড়াই মে দিবসের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে সোম প্রকাশের সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-[৩] মহাশয়ের ঐ সংবাদ ছাপাবার দূরদর্শিতা ও আন্দোলনকে সমর্থন করে লেখনী পরিচালনা করার সৎ সাহস বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

যদিও এই ধর্মঘটের আগে গঙ্গার অপর পার কলকাতাতে ১৮২৩ সালে পাল্কী বেহারাদের ও ১৮৫৩ সালে কলকাতার নদী পরিবহনের কুলীরাও ধর্মঘটের শামিল হয়েছিল। তবে এগুলি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক অসংগঠিত প্রচেষ্টা। যার ফলে ১৮৬২ সালে হাওড়া স্টেশনের রেলওয়ে কুলীদের এই সংগ্রাম ছিল আধুনিক শিল্প

শ্রমিকদের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের এক নতুন সোপান।

এরপরই ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও শ্রমিক ধর্মঘটের ঘটনা ঘটতে লাগলো বিশেষ করে শিল্প নগরী বোম্বাই শহরে। অবশ্য এই কাজে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫ সাল) জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যেও প্রেরণা যোগাতে থাকে। রেলের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের সুতোকলের শ্রমিকরাও আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে শুরু করল।

হাওড়া শহরের ঘুষুড়ী অঞ্চলে 'ঘুষুড়ী কটন মিলে'র মালিকপক্ষ কারবারে লোকসান হচ্ছে এই অজুহাতে শ্রমিকদের মজুরী কমাতে চাইলেন। ফলে ১৮৮১ সালে সুতোকলের শ্রমিকরা ধর্মঘটের শামিল হয়ে তার প্রতিবাদ করে—যদিও প্রতিরোধে তারা সমর্থ হয়নি। একই কারণে ঐ মিলে আবার ধর্মঘট হয় ১৮৯০ সালে। সেবারও শ্রমিকদের ভাগ্যে একই ফল জুটেছিল।[8]

এরপর ইস্টার্ণ রেলের হাওড়া শাখাতে আর একটি রেল শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল যার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত জাতীয় মর্যাদার প্রশ্নে। সেজন্য এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আজকের শ্রমিকদের কাছেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে। ১৯০৬ সাল। জুলাই মাস। তদানীন্তন ব্রিটিশ মালিকাধীন ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে সাদা ও কালো চামড়াভেদে মজুরী নির্ধারণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বণ্টনে প্রবৃত্ত হলেন। এরই প্রতিবাদে হাওড়া স্টেশন থেকে আসানসোল পর্যন্ত রেল শ্রমিকরা রেল চলাচল বন্ধ করে দিল। মাইনে বৃদ্ধি ছাড়াও যে ভারতীয়রা আত্মমর্যাদা রক্ষার দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘট করে রেলের চাকা বন্ধ করে দিতে পারে তা এই ধর্মঘটীরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। তাদের প্রধান দাবি ছিল 'নেটিভ' কথাটি তুলে দিয়ে 'ভারতীয়' শব্দটি রেলের সব আইন কানুনে চালু করতে হবে। এটা কি কম শ্লাঘার ব্যাপার! এই ধর্মঘটটি চলেছিল জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।[5] এই ধর্মঘট অবশ্য বিদেশী শাসকদের পুলিশী নির্যাতনে ভেঙে যায় এবং অনেক প্রবীণ-স্থায়ী রেলকর্মীরা নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে কর্মচ্যুতও হয়েছিলেন।

হাওড়ার রেল কর্মীদের এই ধর্মঘট আর এক দিক দিয়ে বিশেষ যুগান্তকারী ছিল। তা হচ্ছে 'দি ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন' নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে এটি রেলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে অগ্রদূত হিসাবে পরিচিত। ১৯০৬ সালের এই ধর্মঘটটি রেলের কর্মীদের মধ্যে সারা দেশে এমনই উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেছিল যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল পর্যন্ত কলকাতায় রেলকর্মীদের এক সভায় আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করিয়ে ধর্মঘটী রেল কর্মীদের প্রতি সমর্থন জানান। ধর্মঘটী রেল শ্রমিকদের এই অর্থ-নৈতিক আন্দোলন দেশের জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক হয়ে ওঠে। ১৯০৬ সালের রেল ধর্মঘটই পরবর্তী বছরে ভারতের অন্যান্য রেলপথের কর্মীদের মধ্যেও সাহস এনে দিল। ফলে ১৯০৭ সালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রেলকর্মীরা

ধর্মঘটের আহ্বান জানালো। এই ধর্মঘটটিকে ভারতের বৃহত্তম রেল ধর্মঘট বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। আর এই ধর্মঘটের সমস্ত উৎসাহ, সাহস ও প্রেরণার মূলে ছিল ১৯০৬ সালের হাওড়া স্টেশনের ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের কর্মীদের বীরত্ব-পূর্ণ আন্দোলনের ফলশ্রুতি। ১৯০৬ সালের ধর্মঘটের ফলে যেমন সুতোকলের কর্মীদের কাজের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় তেমনি ১৯০৭ সালের রেলের এই ধর্মঘটের ফলে মিঃ মোরিগনের নেতৃত্বে ফ্যাকটরী লেবার কমিশন নামে একটি কমিশন তৈরি হয়। ঐ কমিশনের সুপারিশে শ্রমিকদের কাজের সময়ের হার কমাতে বলা হলেও ভারতীয় ও বিদেশী মালিকদের তীব্র বিরোধীতায় তা মানা সম্ভব হয়নি। যদিও ১৯০৭ সালের ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের দশদিন ব্যাপী (১৮ই নভেম্বর—২৮শে নভেম্বর) এই ধর্মঘট কলকাতা ও হাওড়াকে ভারতের অন্যান্য শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বিখ্যাত রুশ-ভারত বিশেষজ্ঞ মিঃ এ. এল. লেভোস্কি এ সম্পর্কে লিখেছিলেন—It was a serious blow to the prestige of British rule—a blow which undermined the belief its might.[৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই ধর্মঘটটির মূলে ছিল ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কর্মীরা। কিন্তু ভারতীয়রা এই আন্দোলনে পূর্ণ ভাগ গ্রহণ করেছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে ধর্মঘটের যে প্রচারপত্র বিলি হয়েছিল তাতে 'বন্দেমাতরম' শ্লোগানটি পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। এইভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি রেল ধর্মঘটীরা রাজনৈতিক সমর্থনও জানিয়েছিল।

দেখতে দেখতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল। ১৯১৪—১৯১৮ পর্যন্ত চার বছরের যুদ্ধে এদেশে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিল্প কারখানা ও মিল প্রসার লাভ করল। উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল—'বৃদ্ধি পেল মালিকদের মুনাফাও। কিন্তু মজুরদের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হল না। অপর দিকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতাকে দমিয়ে দেবার জন্য ব্রিটিশ প্রভুরা নানারকম পুলিশী নির্যাতন চালাতে লাগলো! তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দেশবাসীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের কর্মীরাও তাদের সমর্থন রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের প্রতি জানাতে লাগল। সন্দেহ নেই ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বরের বিপ্লবের জয়যাত্রা ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯২০ সালের মাঝামাঝিতে হাওড়ায় প্রায় একশ দশটির মত ধর্মঘট হয়েছিল চটকলগুলিতে। এ ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবহন, ধাতু ও কয়লা শিল্পেও ধর্মঘট হয়েছিল। এতে ২,১১,৪৭৮ জন শ্রমিক জড়িয়ে পড়েছিল।[৭]

এরপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট দেখা দিল ১৯২৭ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলের খড়্গপুর স্টেশনে। এই ধর্মঘটে যোগদান করে প্রায় ২৬,০০০ কর্মচারী।[৮] প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ছিলেন ঐ সংস্থার সভাপতি। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ

সহ কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতারাও খড়্গপুরের ধর্মঘটে অকৃপণ সমর্থন জানালেন। ইংরেজ সরকার শ্রমিকদের ওয়ার্কসপের লক আউটের দিনগুলিতে মজুরী দিতে স্বীকৃত হলেও ১৭০০ কর্মীকে পদচ্যুত করে ছাড়েন।[৯] এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী বহু ক্ষতি স্বীকার করেও শিক্ষা পেয়েছিল সুসংবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট কি ভাবে চালাতে হয়।

ইতিপূর্বে হাওড়ার চটকলগুলিতে এককভাবে নিজেদের মত করে বহুবার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে। কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মে তেমন কোন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা যায় নি। ১৯২৫ সালে রাশিয়া ও ইংলণ্ড থেকে শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে হাওড়ার বাসিন্দা শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশে ফিরে এলেন। এই শিবনাথবাবু আবিদুল্লাহ সিন্ধির নেতৃত্বে মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসীয় দর্শন পড়ার জন্য ছাত্র হিসেবে যোগ দেন ১৯২৩ সালের শেষের দিকে। সেখানে স্বয়ং লেনিনের বক্তৃতাও তিনি শোনেন। এমনকি লেনিনের শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সজল বসু লিখছেন—'In 1923 Sibnath went to Russia crossing the inaccessible Hindukush mountain in Sept. under the leadership of Obeidullah Sindhi. He took part in the funeral of Lenin.'[১০] শ্রমিক ইউনিয়ন করার জন্য তিনি ক্ষেত্র সন্ধান করতে থাকেন। এই সময় চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ার শ্রমিক নেতা কালিদাস ভট্টাচার্য ও মহিলা শ্রমিক নেত্রী সন্তোষকুমারী দেবীকে নিয়ে তিনি চটকল শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা দূরীকরণে ব্রতী হন। এমনিভাবে তাঁরা চব্বিশ পরগনার গৌরীপুর নদীয়া জুট মিল থেকে হাওড়ার বাউড়িয়া জুট মিল পর্যন্ত শ্রমিক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কালিদাসবাবু সভাপতি হলেও লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না। অপর পক্ষে শিবনাথ বাবুর শিক্ষা দীক্ষা খুব উঁচু মানের। উভয়ের সাংগঠনিক দক্ষতাগুণে চটকল মজুরদের একত্রে সংগঠিত করে তাঁরা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেই সময়ে গঙ্গার দুই তীরে প্রায় একশটি চটকলের দেড় লক্ষ শ্রমিকের এক সংগঠন গড়ে তুললেন।[১১]

একই সময়ে কমিউনিষ্ট শ্রমিক নেতৃবৃন্দ চটকল শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে এই হাওড়াতেই একটি সম্মেলন ডাকেন। তাতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী শিবনাথবাবুর সঙ্গে কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের মতের অমিল হয়। সভাপতি কালিদাস বাবুকে দলে টেনে নিতে পারলেও সম্পাদক শিবনাথবাবুকে তাঁরা সঙ্গে পেলেন না। তিনি স্বাধীনভাবে টিটাগড়ে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে একাকী কাজ চালাতে লাগলেন। চটকলের শ্রমিকদের সে সময়ে বিদেশীদের হাতে কি পরিমাণে বঞ্চনার স্বীকার হতে হতো তা তদানীন্তন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও ঐ দেশের জুট টেক্সটাইলস ইনডাষ্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক মিঃ জনস্টোনের মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। তিনি লিখছেন—The employer makes a profit of 400% exploiting the workers while they get two pence a day.[১২]

চটকলের শ্রমিকদের সংগঠিত করতে করতে এবং ১৯২৭ সালের খড়্গপুরের রেল কর্মীদের আন্দোলনের জের নষ্ট হতে না হতেই ১৯২৮ সালে লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে এক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এই শ্রমিক অসন্তোষের নেতৃত্বে ছিলেন কে. সি. মিত্র নামে জনৈক শ্রমিক নেতা। এই কে. সি. মিত্র শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য আউধ রেলওয়ে সেক্সসনে দুবার লখনউ ও দানাপুর থেকে চাকুরীচ্যুত হন। তারপর তিনি বাংলায় এসে লিলুয়ার রেলওয়ের ওয়ার্কশপের শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে নামেন। এই কে. সি. মিত্রই শ্রমিক আন্দোলনে 'জটাধারী বাবা' নামে সমধিক পরিচিত। তখনকার দিনে লিলুয়া ওয়ার্কশপে রেলের মজুররা দিনে ছ আনা থেকে আট আনা মজুরী পেত। প্রধানত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ও কর্মচ্যুত দুজন শ্রমিকের পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেন জটাধারী বাবা। পুনর্বহালের দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ লিলুয়ার ওয়ার্কশপে লক আউট ঘোষণা করলেন। ফলে রেলশ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য—বালি জুট মিল, বার্ন এণ্ড কোম্পানী, জেসপ কোম্পানী, হাওড়া জেনারেল ষ্টোর্স সহ বামুনগাছি রেল ওয়ার্কশপেও ধর্মঘট হয়। এমনকি চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিলের ছশ নারী শ্রমিকরা পর্যন্ত মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে এক গৌরবময় সংগ্রামের ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই বছরই চেঙ্গাইলের ল্যাডলো জুট মিলের শ্রমিকরা পর পর চার বার একই মিলে ধর্মঘট করে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় ধর্মঘটটি হয় যথাক্রমে মার্চ ও এপ্রিল মাসে। ধর্মঘটের কারণ ছিল একাধিক শিফটের পরিবর্তে একটিমাত্র শিফট চালু করার প্রতিবাদে। তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মঘটটি হয় মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে। তৃতীয় ধর্মঘটটি করে মিলের ছশ মহিলা শ্রমিকরা ৪ঠা জুন ১৯২৮ সালে। ধর্মঘটে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের উপর বলপ্রয়োগ করলেও মজুরী বৃদ্ধির দাবি তাদের মেনে নিতে হয়। চতুর্থ ধর্মঘটটি চলে ১৯শে নভেম্বর থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত। এতেও আংশিক সাফল্যলাভ করে শ্রমিকরা। কিন্তু এই চারিটি ধর্মঘটেরই বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে শ্রমিকরা কোন ইউনিয়ন নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হত না। এটা জানা যায় ইউনিয়নের (AITUC) সম্পাদক কিশোরী-লাল ঘোষের এক চিঠি থেকে। তিনি লিখছেন—"The (first) strike has lasted for ten days and we were informed on the 9th day. We could not go to the place till after the workers had gone back." যদিও শ্রমিকদের বিপদে ইউনিয়ন তাদের পাশে সর্বদাই ছিল।[১৩]

অবশেষে বাউড়িয়া ফোর্ট গ্লষ্টার জুট মিলে ইংরেজ পুলিশ গুলি চালায়। এই সময়ে উক্ত চটকল শ্রমিকদের সারা বাংলা সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন খ্যাতনাম্নী মহিলা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী ডঃ (মিস) প্রভাবতী দাশগুপ্ত।[১৪] বাউড়িয়া জুট মিলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে আন্দোলন দমাতে গেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সরকার ভারতে তদানীন্তন শ্বেতকায় ইংরেজ মার্কসিষ্ট নেতা ফিলিপ স্প্র্যাটকে

দায়ী করেন।[১৫]

লিলুয়া ওয়ার্কশপের রেল কর্তৃপক্ষের কঠোর দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে ২৮ শে মার্চ সকাল দশটা নাগাদ জটাধারী বাবা ও শিবনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে পূর্ব ভারত রেলের কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের প্রধান কার্যালয়ের সামনে দশ হাজার শ্রমিকের এক প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যাওয়া হয়। সমাবেশের খবর পেয়ে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার টেগার্ট তাঁর স্লিপিং ড্রেস পরেই ঘটনাস্থলে এসে পড়েন। শোভাযাত্রী শ্রমিকরা তাঁকে দেখে যে ধ্বনি দিয়েছিল তা খুবই কৌতুকজনক। তারা চীৎকার করে বলেছিল—'টেগার্ট সাহেবকো পেন্টুলন ঢিলা হো গিয়া।'[১৬]

কলকাতায় বিক্ষোভ দেখানোর পর শ্রমিকরা হাওড়ায় ফিরে এসে বামুনগাছির লোকো শেডে বিক্ষোভ দেখায়—তখন প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছে। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন লিলুয়া ওয়ার্কশপের এক কর্মী—শালিখার অধিবাসী শান্তিরাম মণ্ডল। বামুনগাছি লোকো শেডের কাছে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের উপর পুলিশ সেদিন গুলি চালায়। তাতে নিহত হয় দুজন রেল কর্মী, আহত হয় অনেকে।[১৭]

বামুনগাছি তথা শালকিয়া অঞ্চল সেদিন উত্তেজনায় ছিল টানটান। সেদিনে আবার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন ছিল। সুভাষচন্দ্র বসু শালকিয়া ধর্মতলায় নির্বাচনী কাজের তদারকি করে ফেরবার সময় শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার সংবাদ শুনতে পান। শালকিয়া চৌরাস্তা হয়ে বামুনগাছি পোলের দিকে যেতেই হাওড়ার তদানীন্তন জেলা শাসক 'ব্রতচারী আন্দোলনে'র প্রবর্তক গুরুসদয় দত্তের সঙ্গে তাঁর দেখা।[১৮] উভয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গুরুসদয় দত্তের আদেশে বামুনগাছি লোকো শেডের ডি. সি. এম. ই. মিঃ মোল্ড সাহেবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

শান্তিরাম মণ্ডলের পাঁচ বছর জেল হয়। মামলাটি চলেছিল হাওড়া কোর্টের বিচারক এস. এন. মোদকের (আই. সি. এস.) এজলাসে। শ্রীমোদক সরকারী মেধা বৃত্তি পেয়ে তখনকার দিনে আই. সি. এস. পড়তে বিলেতে যান। তিনি আবার শালকিয়ার প্রাচীন বাসিন্দা ব্রজনাথ দাসের ভাগে ছিলেন। সরকারের বিপক্ষে মামলাটির কৌঁশলী ছিলেন তদানীন্তন হাওড়া কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ও হাওড়া কোর্টের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইনবিদ বরদাপ্রসন্ন পাইন। বরদাবাবুর সওয়ালে সরকার পক্ষের উকিল নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিলেন। এই মামলার গুরুত্ব এতই বেশি ছিল যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পর্যন্ত জনৈক লেবার পার্টির সদস্যকে মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল—'**Who is Mr. Pain ?**' অবশ্য ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত ঐ মামলাটি বেশিদিন চলতে দেন নি।

বামুনগাছির ঐ গুলি চালনার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক আন্দোলন ইংরেজ শাসন-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিল। পূর্বভারত রেলের অণ্ডাল, আসানসোল ও অন্যান্য বড় বড় রেল স্টেশনের শ্রমিকদের মধ্যেও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ল। বিচার অসমাপ্ত থাকলেও রেল কোম্পানী যে বিভাগীয় তদন্ত করেছিলেন তাতে কোম্পানীর

কর্তৃপক্ষের ত্রুটিকেই দায়ী করা হয়। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—But in its turn was condemned, alongwith the East India Railway authorities, for high-handed action and wanton repression, including firing on the striking railway workers.

লিলুয়া ওয়ার্কশপের রেল শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে ভারতের রেলকর্মীদের সংগ্রামের ইতিহাসে এক 'দিগ্‌দর্শক' বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যার অন্যতম নায়ক ছিলেন কে. সি. মিত্র., শিবনাথ ব্যানার্জী ও শান্তিরাম মণ্ডল।

বিদেশী রেল কর্তৃপক্ষ কেবল শ্রমিক হত্যা ও শ্রমিক ছাঁটাই করেই ক্ষান্ত হলেন না। উপরন্তু লিলুয়ার সব অর্ডার কাঁচরাপাড়ার রেল ওয়ার্কশপে হস্তান্তর করলেন। তারই প্রতিবাদে পাঁচ-ছ হাজার শ্রমিক লিলুয়া থেকে কাঁচরাপাড়া অভিমুখে প্রতিবাদ শোভাযাত্রা বের করেছিলেন। শোভাযাত্রীরা কাঁচরাপাড়ায় পেঁছলে চটকল শ্রমিকরাও বিপুলভাবে তাঁদের সংগ্রামে একাত্ম হয়ে সম্বর্ধনা জানায়। রেল শ্রমিকদের সংগ্রামে চটকল শ্রমিকদের একাত্ম হওয়ার কাজে শিবনাথ ব্যানার্জীর অবদান স্মরণ রাখার মত।

এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক পদযাত্রার কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। লিলুয়ার ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হলেও শ্রমিকদের মনোবল ছিল বেশ সতেজ। ১৯২৮ সালে ডিসেম্বরে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছেন। রেল শ্রমিকদের ওপর ইংরেজ সরকারের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কি মনোভাব তা জানবার জন্যই কে. সি. মিত্রও শিবনাথ ব্যানার্জীর সহায়তায় এক লক্ষ শ্রমিকের এক শোভাযাত্রা কংগ্রেস অধিবেশনে নিয়ে গিয়ে গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বেচ্ছাসেবক বিভাগের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। সুভাষচন্দ্র শিবনাথ বাবুকে টেলিফোন করে ঐ সম্মেলনে শ্রমিকদের নিয়ে হাজির হতে নিষেধ করেন। সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল হয়তো কমিউনিষ্টরা সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং প্রদর্শনীর ক্ষতি সাধন করবে। সজল বসু 'Shibnath Banerjee and his times' পুস্তকটিতে লিখেছেন—He (Subhas chandra) apprehended that communist would create disturbances and looted the exihibition. কিন্তু শিবনাথবাবু সুভাষচন্দ্রের অভিমত অগ্রাহ্য করেই সেখানে ঐতিহাসিক মিছিল নিয়ে হাজির হন। যদিও চেয়ারম্যান যতীন্দ্রমোহন ইতিমধ্যেই গান্ধীজীকে বলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সম্মতি আদায় করে নিয়েছিলেন। কে. সি. মিত্র ও শিবনাথ ব্যানার্জী ছাড়া আর যাঁরা সেদিন ঐ মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন গোপেন চক্রবর্তী, বঙ্কিম মুখার্জী ও রাধারমণ মিত্র।[১৯]

গান্ধীজী শ্রমিকদের সঙ্গে সভায় মিলিত হন। অধিবেশন মণ্ডপ ত্যাগ করার সময়ে

শ্রমিকরা মুহুর্মুহু ধ্বনি তোলে 'গান্ধীজী কি জয়'। সুভাষচন্দ্র পরে অবশ্য তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন। সেদিনের ঐ শ্রমিক সমাবেশ যে কত সুশৃঙ্খল ছিল তা প্রতিনিধি সম্মেলনে সদস্যদের উদ্দেশ্য করে মতিলাল নেহরু যে মন্তব্য করেছিলেন তা থেকেই স্পষ্ট হয়। **Rebuking the delegates he said, Just a few minutes before, the workers held their meeting here in such a disciplined way, the delegates should learn from them.**[২০] এই উক্তিই কে. সি. মিত্র ও শিবনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বের বিরাট পুরস্কার। এই আন্দোলন শুধু তদানীন্তন সর্বভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দেরই আশীর্বাদ লাভ করেনি, সেন্ট্রাল কমিটি অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেও এই আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। কে. সি. মিত্র এরপর শ্রমিক আন্দোলন থেকে আস্তে আস্তে অবসর নিলেও শিবনাথ ব্যানার্জী আমৃত্যু শ্রমিক কল্যাণে কাজ করে গেছেন। ১৯৩৭ সালে শিবনাথবাবু প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হাওড়া শ্রমিক কেন্দ্র থেকে এ. আই. টি. ইউ. সির-সভাপতি থাকাকালীন শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে ঐ একই শ্রমিক কেন্দ্র থেকে তিনি পুনঃনির্বাচিত হন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এই জেলায় কংগ্রেস সোসালিস্ট আন্দোলনের তিনিই ছিলেন অগ্রদূত।
হাওড়া-বেলুড়ে বঙ্কিম মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালে। প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। সেই কারাগারেই কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ঐ দলে যোগ দেন ১৯৩৬ সালে। ঐ সালেই আসানসোল লেবার কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদে সভ্য নির্বাচিত হন। তিনিই ভারতের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্য। স্বাধীন ভারতেও বিধান সভার সভ্য ছিলেন।

রাজনীতিতে কংগ্রেস তথা কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে শিবনাথবাবুর তীব্র মত-পার্থক্য ছিল। কিন্তু সেই রাজনৈতিক মত-পার্থক্য কখনও ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ককে শত্রু সম্পর্কে-পর্যবসিত করত না। সে রকম একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯২৮ সাল। হাওড়ার বাউড়িয়া জুট মিলে ধর্মঘট চলছে। ধর্মঘটীদের সমর্থনে সারা বঙ্গদেশে চটকলে হরতাল পালিত হল ১৯২৯ সালে। এই ধর্মঘটটিকেই চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট বলে আখ্যা দেওয়া হয়।[২১] এই ধর্মঘটের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সাধনার দাবি সংযুক্তিকরণ। ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য মালিক পক্ষ তখনকার দিনেও ভাড়া করা গুন্ডা পুষতেন। উল্লেখ্য, এই চটকল ধর্মঘটে কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতৃবৃন্দও পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ছ'মাস ব্যাপী ধর্মঘট চলাকালীন একদিন সন্ধ্যার মুখে শিবনাথবাবু সাইকেলে চেপে বাউড়িয়া জুটমিলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের ক্যাম্পে যাচ্ছেন। মিলের কিছু দূরে একটি

পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কোন লোকের গোঙানি শুনতে পান। শিবনাথবাবু সাইকেল থেকে নেমে দেখেন যে পুকুরের পাশে কমিউনিষ্ট শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। শিবনাথবাবু বঙ্কিম মুখার্জীকে কোন মতে শ্রমিকদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে ঘটনা শুনতে পেয়ে বুঝলেন এটা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাদেরই ঘৃণ্য কাজ। এমনি ছিল সেদিনের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সম্পর্ক।* এই ধর্মঘট উপলক্ষে পণ্ডিত জহর লাল নেহরু বাউড়িয়ায় এসে একটি বিবৃতি প্রচার করে ধর্মঘটকে সমর্থন করে যান।[২২]

শিল্প শ্রমিকদের মত হরিজনদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য জেলায় প্রথম শ্রমিক-ইউনিয়ন গড়া হল হাওড়া পৌর সভায়। সালটা ছিল ১৯৩০। উদ্যোক্তা ছিলেন অতুল রায় নামে মধ্য হাওড়ার জনৈক ব্যক্তি। তিনি অবশ্য কোন রাজনৈতিক মতাবলম্বীর সমর্থক ছিলেন না। নেহাৎ সমাজ সেবামূলক মনোভাব থেকেই হরিজনদের সংঘবদ্ধ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র সংশোধনেরও চেষ্টা করেছিলেন—যেমন মদ, জুয়া বা অন্যান্য বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি। রেলের শ্রমিক নেতা জটাধারী বাবাও ঐ একই মানসিকতা নিয়ে শ্রমিক আন্দোলন করতে নেমেছিলেন। অতুলবাবুর প্রতিষ্ঠিত পৌর ইউনিয়নটির নাম ছিল 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। পরবর্তীকালে মনসা চরণ দে হরিজনদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হরিজনদের সেবা করতে গিয়ে অতুলবাবু একজন হরিজন মহিলাকে বিবাহ করে হরিজন পল্লীতেই জীবন কাটিয়ে যান।

১৯৩৯ সাল। হাওড়া পৌর সভার তদানীন্তন চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট আইন-বিদ বরদাপ্রসন্ন পাইন। হরিজন কর্মীরা তখন ধর্মঘট করল। সেই সময়ে মোষের গাড়ি দিয়ে শহরের 'নাইট সয়েল' পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ছিল। ধর্মঘট বানচাল করার জন্য বরদাবাবু কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েকটি মোটর গাড়ী মারফৎ নাইট সয়েল পারিষ্কার প্রথা চালু করে ধর্মঘট ভেঙ্গে দিলেন।

এদিকে মনসাচরণ দে প্রতিদিন হরিজনদের পল্লীতে গিয়ে তাদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে পৌর কর্মীদের এক সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়। তখন হাওড়া পৌর সভার চেয়ারম্যান ছিলেন শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়—পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পিকার ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীও হয়েছিলেন। এই ধর্মঘটের বছর দুই পরে আবার শ্রমিকরা দাবি পত্র পেশ করে। এবার দাবিপত্রটির বিরুদ্ধে লেবার ট্রাইবুন্যালে মামলা করা হল। এই ট্রাইবুন্যালের রায়কেই S. N. Modak's Award আখ্যা দেওয়া হয়। এই সুপারিশ অনুযায়ী হাওড়া পৌর সভায় ন্যূনতম মজুরী (Minimum Wage) (Rs 50/-) আইন

* এই ঘটনাটি আমাকে বলেন হাওড়া পৌর সভার সোসালিষ্ট শ্রমিক নেতা অর্ধেন্দু শেখর বসু।

প্রথম চালু হল। মাহিনা বৃদ্ধি ছাড়া চাকুরী স্থায়ীকরণ ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু হল। এরপর উচ্চশ্রেণীর বাবুরা 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী সংঘ' নামে একটি পৃথক সংস্থা তৈরি করেন। যেটা আজও বর্তমান রয়েছে। আর হল 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন'। এখানে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন—কারণ এই ঘটনাটির মাধ্যমে তদানীন্তন শ্রমিক নেতাদের নৈতিক মানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মনসাবাবু ও তাঁর সহকারী অর্ধেন্দু শেখর বসু দাবি তুললেন যে পৌর সভার 'ডাবল সার্ভিস' (Double service) করা চলবে না। এই দাবিকে স্বয়ং তদানীন্তন কংগ্রেসী ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ বেণী দত্ত-ও পূর্ণ সমর্থন করেন। ফলে প্রায় সাতশোর মত কর্মীর কাজ চলে যায়। স্বভাবতই শ্রমিকদের একটা অংশ তাঁদের উপর ভীষণ রুষ্ট হয় এবং অপর একটি ইউনিয়ন আর. সি. পি. আই-র নেতৃত্বে সংগঠিত হয়—কিন্তু বেশি দিন সেটি স্থায়ী হয়নি।

১৯৪৯ সালে পৌর সভার জঞ্জাল বিভাগের কর্মীদের বাদ দিয়ে অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের নতুন বেতন হার ও ইনক্রিমেণ্ট চালু করা হয়। এতে মনসাবাবুরা আবার হরিজন ইউনিয়নের ধর্মঘট শুরু করেন। মনসাবাবুকে চাকরীচ্যুত করা হল। কিন্তু ১৯৫০ সালে 'ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লক' কংগ্রেস বোর্ডকে হারিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে। চেয়ারম্যান হন কার্তিক চন্দ্র দত্ত। মনসাবাবু আবার চাকরী ফিরে পান। কিন্তু এই বোর্ড সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হওয়ায় প্রশাসক নিযুক্ত হন। নির্বাচনে আবার কংগ্রেস পৌর সভা লাভ করলে রবীন্দ্র লাল সিংহ (পরে মন্ত্রীও হন) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। মনসাবাবুর নেতৃত্বে একদিন বোর্ডের সভার পর চেয়ারম্যান সমেত সব কমিশনারদের রাতভোর জঞ্জাল সাফাই বিভাগের কর্মীরা আটকে রাখে। পরেরদিন সকাল বেলা পুলিশ এসে তাঁদেরকে মুক্ত করে। আবার মনসাবাবুর চাকরী যায়। এবার অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে মনসাবাবু চাকরী ফিরে পান। ১৯৬৩ সালে মনসাবাবুর মৃত্যু হলে তাঁর সহকর্মী অর্ধেন্দু শেখর বসু ঐ ইউনিয়নের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তাঁরই আমলে হাওড়া পৌর সভায় ১৯৬৫ সালে এক দীর্ঘস্থায়ী জঞ্জাল সাফাই বিভাগের ধর্মঘট হয়। চলে আশিদিন ধরে। ধর্মঘটের কারণ ছিল তাঁদের নেতা অর্ধেন্দু বসুকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা নিয়ে। যদিও শ্রমিকরা মাত্র দশদিনের মাইনে পেয়েছিল—কিন্তু তাঁদের নেতাকে চাকরীতে আবার বহাল করে ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় করেছিল।

আবার শিল্প কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। ১৯৩০-৩১ সাল। সালকিয়ার জি. টি. রোডে ব্রিট্যানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার উত্তর প্রদেশীয় শ্রমিক ধরমবীর সিংহের নেতৃত্বে এক ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট খুবই জঙ্গী ছিল। তিনি কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু পরে

তাঁকে Terro-Communist বলে চিহ্নিত করে পার্টি থেকে বার করে দেওয়া হয়।

বঙ্গদেশে তখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল দুটি জায়গায়—একটি মেটিয়াবুরুজ অপরটি ঘুষুড়ি। ঘুষুড়ির পুরানো বাজারে একটি দোতলা ঘরে ছিল 'বেঙ্গল লেবার পার্টির' অফিস। ১৯৩৬-৩৭ হবে। ডঃ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের (ব্যারিষ্টার) তৈরি এই লেবার পার্টির অফিসেই তখনকার দিনে হাওড়া শহরে শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

পাটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বস্ত্র শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চল এই ঘুষুড়িতে তখন আনাগোনা হোত বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক নেতাদের। তাঁদের অনেকেই আজ হয়তো আমাদের মধ্যে নেই—শুধু আছে তাঁদের রেখে যাওয়া স্মৃতি কথা ও শ্রমিক স্বার্থে সুকর্মের কিছু ফল। সেদিনের উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জী, তারকনাথ ব্যানার্জী, কালী মুখার্জী, বলাইচন্দ্র সিংহ, বঙ্কিম মুখার্জী, কেশব ব্যানার্জী, ডাঃ রণেন সেন, আবদুল মোমিন, বীরেন ব্যানার্জী, এম. এ. জামান, জীবন মাইতি, শিশির গাঙ্গুলী, পতিতপাবন পাঠক, কমল সরকার, অবনী মুখার্জী প্রমুখ।

শ্রমিকদের অর্থ নৈতিক দাবি-দাওয়া ও কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট করার দাবিতে সে-সময় বঙ্গদেশের শিল্প কারখানাতে শ্রমিক সংগঠনগুলির কাজ বেশ জোর কদমে চলছে। শুধু অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক দাবিও এর সঙ্গে যোগ হল। হাওড়া শহরের শ্রমিক শ্রেণী সেই আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ইংরেজকে 'মেন এ্যান্ড মানি' কোনটা দিয়েই সাহায্য না করার দাবিতে ঘুষুড়ির ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং কোম্পানীতে দুমাস ধরে ধর্মঘট চলেছিল। শ্রমিকদের শ্লোগান ছিল—'না এক পাই, না এক ভাই'—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে যুদ্ধে এক পাইও দেব না এবং যুদ্ধে এক ভাইও যাবে না। এটি পরিচালিত হয়েছিল এ. আই. টি. ইউ. সি-র উদ্যোগে। শালকিয়ার সন্তোষ গাঙ্গুলী, বীরেন ব্যানার্জী, আতঙ্কহরি পাঁজা ও সুরেন দাস নেতৃত্বে ছিলেন। শেষোক্ত, দুজন ছিলেন ঐ কোম্পানীরই কর্মী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই মার্টিন বার্ন, শালিমার পোর্ট এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, নামার লরী, হুগলী ডক, গেষ্টকিন উইলিয়মস, রাধেশ্যাম কটন মিল, হোড়মিলার কোম্পানী প্রভৃতিতে ইউনিয়ম গঠিত হয়েছে। যুদ্ধের সমরাস্ত্র তৈরির জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিতে বাড়তি শ্রমিকের চাহিদা—কিন্তু সুতো কলগুলিতে মন্দাহেতু ছাঁটাই শুরু হল।

এতদিন রাজনৈতিক মতবাদ গৌণ করে জাতীয়তাবাদী, সোসালিষ্ট ও কমিউনিষ্টরা একযোগে শ্রমিকদের স্বার্থেও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়ে আসছিল। কিন্তু হিটলার সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করলে কমিউনিষ্টরা এদেশে 'জনযুদ্ধে'র আওয়াজ তুলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় এগিয়ে গেলেন।

ফলে দেশের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাই বিভিন্ন শিল্প সংগঠনে জাতীয়তাবাদী ও সোসালিষ্টদের প্রভাব শ্রমিক শ্রেণীর উপর ভীষণ ভাবে দেখা দিল। ইংরেজ এই প্রভাব কমাবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বড় বড় কারখানায় কিছু নতুন সুযোগ সুবিধা চালু করে। অবশ্য এর আর একটি কারণও ছিল যাতে শ্রমিকরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে না যায়। উল্লেখ্য, সেই সময় কলকাতা ও হাওড়া শহর প্রায় যুদ্ধাতঙ্কে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় শিবপুরের গেষ্টকিন উইলিয়ামসে দুই শ্রমিক নেতা হরিপদ মজুমদার ও মহম্মদ আবদুল্লার নেতৃত্বে কুড়ি টাকা করে মহার্ঘ্যভাতা আদায়ে ধর্মঘট করে সফল হন। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীর সান্নিধ্যে এসে সোসালিষ্ট শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হরিপদবাবু '৫২ সাল পর্যন্ত শালিমার থেকে বালি অবধি 'ইঞ্জিনিয়ারিং মজদুর সভা' নামে একচ্ছত্র ইউনিয়ন গড়েন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমর উপকরণ উৎপাদন চালু রাখার জন্য ইংরেজ শাসক 'সাইরেন অ্যালাউন্স' চালু করেন। দিনে যতবার বিমান সঙ্কেত বাজবে ততবার বার আনা হারে ঐ টাকা শ্রমিকরা বাড়তি ভাতা পাবে। এ ছাড়া শ্রমিকদের সহানুভূতি পাবার জন্য বড় বড় কারখানায় ন্যায্যমূল্যে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এমনকি রেশনে জামা কাপড়ও দেওয়া হত।

যুদ্ধের জন্য কয়েক বছর ধর্মঘটের ঘটনা কম থাকলেও ১৯৪৪ সালের শেষ থেকে আবার শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। এই আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিকদের উপর ভীষণ প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। সে সময়ের উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হল ইংরেজ পরিচালিত কলকাতার ট্রাম কোম্পানীতে। শালিমার থেকে বালি পর্যন্ত সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও চটকলে সোসালিষ্ট নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীর অসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চটকলগুলিতে কমিউনিষ্ট নেতাদের সংগঠন অবশ্য ভালই ছিল। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে 'জনযুদ্ধের' শ্লোগান তাঁদেরকে শ্রমিক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল ১৯৪৬ সালে হাওড়া শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাচনে বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয় সোসালিষ্ট শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীর কাছে। ১৯৪৬ সালে ২৯শে জুলাই পি এণ্ড টি (পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ) শ্রমিকদের সমর্থনে কলকাতার মনুমেণ্টের তলায় (বর্তমান শহীদ মিনার) যে বিরাট শ্রমিক শোভাযাত্রা হয়েছিল তা হাওড়া থেকে পরিচালনা করেন শিবনাথবাবু ও সৌম্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর। ১৯৪৫-৪৬ সালে মার্টিন বার্ন ও নিসকোতে ধর্মঘট হয়, শিবপুরের অবনী মুখার্জীর নেতৃত্বে। এই সময়ে শালিমার ওয়ার্কসের এক কর্মী উক্ত কোম্পানীর ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে শ্রমিক আন্দোলনে এক বিশেষ স্থান করে নেন— তাঁর নাম মহম্মদ ইলিয়াস। মহম্মদ ইলিয়াসের নিজের কথায় বলি—'সাম্রাজ্যবাদ, সোসালিজম ও ট্রেড ইউনিয়নের উপর শিবনাথবাবুর তিন মিনিটের এক বক্তৃতা আমার মনে বিশেষ দাগ কাটে। সেই অর্থে তিনি ছিলেন আমার 'গুরু'। পরে

তিনি কম্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বে আসীন হন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে দুবার হাওড়া সদর কেন্দ্র কম্যুনিস্ট প্রার্থী হিসেবে লোক সভায় নির্বাচিত হন। মহম্মদ ইলিয়াস স্বাধীনোত্তর যুগে শ্রমিক শ্রেণীর এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু তাঁর 'শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে মহম্মদ ইলিয়াসকেই শিকল ছেঁড়ার নায়ক হিসাবে অঙ্কিত করেছিলেন। এই উপন্যাসের জন্য দিনের পর দিন ইলিয়াসের সঙ্গে সমরেশবাবু আলোচনা করেছেন।[১৩] ইলিয়াস সাহেবের মৃত্যু ঘটে ২৫শে নভেম্বর, ১৯৯০ আর্থিক দৈন্যের মধ্যে।

এখানে আব্দুল মোমিন নামে অপর এক শ্রমিক নেতার কথা উল্লেখ করতে হল। উড়িষ্যার বারীপদার অধিবাসী হয়েও বঙ্গদেশের হাওড়া জেলায়ই তাঁর ঘর বাড়ি ছিল। শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন করে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রমিক নেতায় উন্নীত হন। তিনি 'মণিদা' ছদ্মনামে শালিখাবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য তিনি এই ছদ্মনাম নেন। কারণ তিনি ছিলেন বিপ্লবীদলের কর্মী।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। শ্রমিকদের নিয়ে নিজস্ব পতাকাতলে একটি আলাদা শ্রমিক সংগঠন করলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—যার নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সংক্ষেপে আই. এন. টি. ইউ. সি. নামে খ্যাত। এতদিন কিন্তু এ. আই. টি. ইউ. সি. শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ মঞ্চ হিসেবে পরিগণিত হত।

বলা বাহুল্য, এই সময় আই. এন. টি. ইউ. সি-র পতাকাতলে শ্রমিক শ্রেণী এসে মিলিত হ'ল। কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন শিল্পে ট্রাইবুন্যাল বসাতে শুরু করলেন। ফলে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি, শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ইত্যাদি হতে লাগল। অপরপক্ষে, কম্যুনিষ্ট নেতারা 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে শ্লোগান তুলে শ্রমিকদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। কংগ্রেসের শ্রমিক নেতাদের মত সোসা-লিষ্ট শ্রমিক নেতারাও কম্যুনিষ্টদের সঙ্গ ত্যাগ করে 'হিন্দ মজদুর সভা' নামে একটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন তৈরি করলেন। ১৯৪৮ সালে এই সংগঠনেরও প্রথম বার্ষিক শ্রমিক সমাবেশ হয় হাওড়া ময়দানে। সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আর. এস. রুইকর এবং সম্পাদক হন বিখ্যাত অশোক মেটা। ১৯৪৭ সালের পর হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে আই. এন. টি. ইউ. সি-র শক্তি খুবই বেড়ে যায়। এ. আই. টি. ইউ. সি. থেকে বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতা কালী মুখার্জী আই. এন. টি. ইউ. সিতে যোগ দেন। বেলুড়ের তারাদাস ভট্টাচার্য উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন সুতো কলের শ্রমিকদের মাইনে বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ে সক্ষম হন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে শালকিয়ার ধর্মতলায় কেদারনাথ জুট মিলের ধর্মঘটে মালিকপক্ষের দালালদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে অহিংস আন্দোলন জঙ্গী আন্দোলনে পরিণত হয়। সেই সময় নেপালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৈরালা

ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে নেপালে কংগ্রেস আন্দোলন করছিল। তিনি তাতে যোগ দেন। সেখানে বোমা তৈরি করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২৪]

প্রথমে বিরূপ মনোভাব থাকলেও পরে শিল্প ট্রাইব্যুন্যালে কম্যুনিষ্টরা অংশগ্রহণ করতে থাকে। এই ট্রাইব্যুন্যালের সুপারিশ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য প্রথম প্রভিডেন্ড ফান্ড চালু হয়। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে মালিকদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট শ্রমিক নেতারা কংগ্রেস নেতাদের ছাড়িয়ে দাবি-দাওয়া পেশ করতে লাগলেন। ফলে দয়ারাম বেরী, শিশির গাঙ্গুলী, তারক ব্যানার্জী, কেশব ব্যানার্জী ও শ্রীমতী কমলাদেবীর মত ঝানু কংগ্রেসী শ্রমিক নেতারাও চটকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১৯৫২ সালের পর থেকে এ. আই. টি. ইউ. সি-র বীরেন ব্যানার্জী, মহম্মদ ইলিয়াস, সমর মুখার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, জহর ঘোষ, কালী চক্রবর্তী, হরলাল দত্ত. সন্ন্যাসী পট্টনায়ক, রবীন ভট্টাচার্য, হরিসাধন মিত্র প্রমুখ কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের প্রভাব বাড়তে থাকে। এই সময় মুখার্জীই একাধিক বার হাওড়া শহর থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। তিনি আজ আর কেবল পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক নেতা নন—ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। হাওড়া বেলিলিয়াস অঞ্চলে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে শ্রমিক সংগঠনে ছিলেন আর. সি. পি. আই-এর অনাদি দাস ও শৈলেন হাইত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উলুবেড়িয়া, সাঁকরাইল ও বাউড়িয়া অঞ্চলে ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রমিক নেতা নানু ঘোষ, ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য (মন্ত্রী)। লিলুয়া ও বালি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের নেতা ছিলেন তদানীন্তন (১৯৫৪—৬২ সাল) ফরওয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা সরোজ কুমার ঘোষাল। হিন্দু মজদুর সভার বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ছিলেন রামচন্দ্র শর্মা, ফাঁকিরা সিং ও যুবরাজ কাঁড়ার। শিবপুরে রামসেন ও ভজন দাশগুপ্ত বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের অন্যতম।

কিন্তু ষাটের দশকের মধ্যেই হাওড়া জেলার শ্রমিক সংগঠনগুলি বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিষ্টদের হাতেই বেশির ভাগ চলে যায়। অর্থনৈতিক দর কষাকষিতে তাঁরাই শ্রমিকদের বেশি সমর্থন লাভে সক্ষম হন। অবশ্য কংগ্রেস শ্রমিক নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্বই কমিউনিষ্টদের অনুপ্রবেশে আরও সুযোগ করে দিয়েছে। মূলতঃ অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কমিউনিষ্টরা তাদের হারানো স্থান ফিরে পেলেন। অস্বীকার করে লাভ নেই যে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাছে আপাতমধুর দাবি দাওয়া রেখে শ্রমিকদের দলে টানা হয়েছে। পরে অবশ্য এর কুফলও দেখা গিয়েছে—যেমন অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান উঠে গেছে। একথা আজ অনেকেই স্বীকার করেন যে বিগত পঞ্চাশ বছরেও শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। সরকার বদলের সঙ্গেই দেখা যায় ইউনিয়ন বদলের পালা।

---

১. Working Class of India—Sukumal Sen.

২. ঐ

৩. ভারত শ্রমজীবী—অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৪. Working Class of India—Sukumal Sen.

৫. ঐ

৬. ঐ

৭. Howrah Labour Union—1920.

৮. Working Class of India—Sukumal Sen.

৯. ঐ

১০. Shibnath Banerjee & his times—Sajal Bose.

১১. ঐ

১২. Working Class of India—Sukumal Sen.

১৩. The Quarterly Review of Historical Studies —Labour Protest in Howrah Jute Mills—Amal Das. Vol XXV 1986 Nov. 4.

১৪. ঐ

১৫. এই স্প্র্যাট সাহেবই আবার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। অন্যরা ছিলেন হাচিনসন সাহেব, মুজফ্‌ফর আমেদ, শিবনাথ ব্যানার্জী ও অমৃত বাজারের কিশোরীলাল ঘোষ।

১৬. Shibnath Banerjee & his times—Sajal Bose.

১৭. Amrita Bazar Patrika—4th April 1928. কিন্তু সজল বসু তাঁর Shibnath Banerjee & his times বইতে পাঁচ জন মৃত বলে উল্লেখ করেছেন।

১৮. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯. Shibnath Banerjee & his times—Sajal Bose.

২০. ঐ

২১. শ্রমিক নেত্রী সন্তোষ কুমারী—মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়।

২২. শতবর্ষের আলোকে হাওড়া জেলাপরিষদ—দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী।

২৩. যুগান্তর—২৭শে নভেম্বর—১৯৯০।

২৪. শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ—বালি সাধারণী সভা।

বিপ্লবী আন্দোলনে—হাওড়া

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মত-পার্থক্য ও বিরোধ এক বিশেষ অধ্যায়। চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা মহারাষ্ট্র কেশরী বালগঙ্গাধর তিলকই ইংরেজ শাসককে বলেছিলেন, Swaraj is my birth-right, I must have it.' চরমপন্থীদের মধ্যে থেকে আবার সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন শুরু হল যার ফল হল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা। মহারাষ্ট্রের সুসন্তান বাসুদেব ফাড়কে ও চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় শুরু করলেও বঙ্গদেশে তা সংগঠিতভাবে শুরু করলেন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, রাসবিহারী বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়ী বীররা।

তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনই হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা পর্ব। বঙ্গদেশের সবত্র স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বইতে শুরু করে। কারণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত নরমপন্থীদের প্রেয়ার, প্লিজ ও প্রোটেষ্টের (থ্রি পি) কথা অনেকেরই জানা আছে। তাই ইংরেজের অত্যাচারের জবাব দেবার জন্য প্রয়োজন হল 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' জ্ঞানে আত্ম বলিদানে সংকল্পবদ্ধ যুবক দলের।

হাওড়ায় তারই প্রথম প্রকাশ ঘটল ১৯১০ সালের মার্চ মাসে 'হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা'র মাধ্যমে। ইতিপূর্বে ১৯০৮ সালে শিবপুরে স্বদেশী ডাকাতি হয়। ১৯০৯ সালে আলিপুরের বোমার মামলায় সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস আলিপুর ফৌজদারী আদালতে খুলনার চারুচন্দ্র বসুর রিভলবারের গুলিতে নিহত হন। ১৯০৯ সালে ইংরেজ পুলিশ দার্জিলিং থেকে ললিতমোহন চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্যক্তিকে রাজসাক্ষী হিসাবে ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে আনেনে হয়। তিনি ডায়মণ্ডহারবারের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিভিন্ন ডাকাতিতে বিপ্লবীদের নাম বলে দেন। যে বত্রিশ জনের নাম তিনি বলেছিলেন তার মধ্যে ননীলাল সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), শরৎ মিত্র, কেশব দত্ত, তারানাথ চৌধুরী, চারু ঘোষ, সুরেশ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ললিতবাবু আরও বলেন যে হাওড়া ও সন্নিহিত জায়গায় ডাকাতির নায়ক হচ্ছেন ননীলাল সেনগুপ্ত। আর তার পেছনে আছেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী। এমনকি এই ষড়যন্ত্রে যতীন্দ্রনাথের আইনজীবী ছোট মামা ও তাঁর মুহুরীকেও জড়ানো হয়।[১] ললিতবাবু আরও বলেন যে পুলিশের গোয়েন্দা নন্দলাল ব্যানার্জীকে যতীন্দ্রনাথই ষড়যন্ত্র করে হত্যা করিয়েছে। হাওড়া ষড়যন্ত্রের তদন্তের ভার পড়ে সামসুল আলম নামক জনৈক ব্যক্তির ওপর। ইতিপূর্বে আলিপুর

বোমার মামলায় তদন্তের সময় বারীন্দ্র ও উল্লাস কর সামসুল আলমের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁকে ১৯১০ সালে ১০ই জানুয়ারী কলকাতা হাইকোর্টের সিঁড়িতে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করে বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত নামে এক বিপ্লবী বালক। পুলিশের জালিয়াতি ও কারচুপিতে সে স্বীকার করে যে বাঘা যতীনের প্ররোচনায় সে আলমকে হত্যা করে। ১৯১০ সালে ২৭শে জানুয়ারী যতীন্দ্রনাথকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। লালবাজারে লকআপে কয়েকদিন থাকার পর তাঁকে তাঁর দুই মামাসহ মুহুরী নিবারণ মজুমদারকেও হাওড়া জেলে পাঠানো হয়। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে ৫০ জনের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার 'হাওড়া ষড়যন্ত্র' মামলা শুরু করে। হাইকোর্টের সেসনে এই মামলা এক বছর চলে। এই সময় যতীন্দ্রনাথকে দুঃসহ যন্ত্রণা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। অবশেষে ১৯১১ সালে এপ্রিল মাসে মামলার অবসান হয়। প্রধান বিচারপতি জেংকিন্স আসামীদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন। ব্যারিস্টার জে. এন. রায় যতীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।[২]

সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজকে তাড়াতে হলে চাই আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোপনে উহার শিক্ষাদান কেন্দ্র। এ ব্যাপারে আত্মোন্নতি সমিতি, যুগান্তর পার্টি ও মুক্তি সংঘ কলকাতায় গড়ে উঠল। বিভিন্ন সেবামূলক কাজ ও সবল দেহের জন্য ব্যায়াম সমিতিও গড়ে উঠল। তারই ভেতর দিয়ে চলল ইংরেজ বিতাড়নের গোপন কার্যকলাপ। যদিও কলকাতায় এই সব কেন্দ্র গড়ে ওঠে তথাপি হাওড়ার যুব সমাজের কেউ কেউ তার প্রেরণায় আকৃষ্ট হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। এই রকমই একটি দুঃসাহসিক কাজ করেছিল হাওড়া জেলার রসপুর নামে এ গ্রামের ছেলে—নাম তার শ্রীশ চন্দ্র মিত্র। ডাক নাম ছিল হাবু। 'মাতামহ প্রাকণ্ঠ নিয়োগী বালক হাবুকে কলকাতার বহুবাজারস্থিত নিজ বাটিতে রাখিয়া পালন করেন।'[৩]

হাবু বহুবাজারের 'আত্মোন্নতি সমিতির' সভ্য হয়ে শরীরচর্চা ইত্যাদি করতে থাকে। সমিতির বিপ্লবী নায়ক বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাজে হাবু বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। দেশমুক্তির কাজে সেও অংশীদার হতে চায়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইংরেজ যুদ্ধে খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই বিপ্লবীরাও এই সুযোগে বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য অস্ত্র যোগাড়ে প্রবৃত্ত হয়। সুযোগও এসে গেল নেহাতই আচমকা।

শ্রীশ চন্দ্র তখন ডালহৌসী অঞ্চলে প্রসিদ্ধ অস্ত্র ব্যবসায়ী মেসার্স আর. বি. রডা কোম্পানীতে কাজ করেন। শ্রীশ চন্দ্র কর্মী হিসাবে গোপন সূত্রে জানতে পারেন যে তিব্বতের দালাইলামা মতান্তরে নেপাল সরকারের অর্ডার মত জার্মানী থেকে পঞ্চাশটি জার্মান মসার পিস্তল (Mauser Pistol) ও ৪৬০০ রাউন্ড কার্তুজসহ বহু অস্ত্র কাস্টম হাউসে এসেছে। ঐ অস্ত্রগুলি কাস্টম হাউস থেকে খালাস ক'রে রডা কোম্পানীর ঘরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পেয়েছে শ্রীশ চন্দ্র মিত্র।

দেশপ্রেমিক শ্রীশ চন্দ্র (হাবু মিত্র) বিপ্লবীদের কাজে অস্ত্র সংগ্রহে সাহায্য করার জন্য ১৯১৪ সালে ২৬শে আগস্ট দুপুর বেলা শ্রীশ চন্দ্র মিত্র, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, শ্রীশ চন্দ্র পাল, প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই অস্ত্রশস্ত্র লুটের ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। রডা কোম্পানীর গুদাম-সরকার শ্রীশ চন্দ্র মিত্র পরিকল্পনামত কোম্পানীর গুদামে যথারীতি মাল তুললেও···দশ পেটি মাল আর কোম্পানীর ঘরে না তুলে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেন। এই ঘটনার পর শ্রীশ চন্দ্রবাবু কালবিলম্ব না করে বন্ধু শ্রীশ চন্দ্র পালকে নিয়ে প্রথমে রংপুর (অধুনা বাংলাদেশ) পরে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় পার্বত্য উপজাতি ধীরেন রাভারের বাড়িতে যান। 'সেখান থেকে আমার (হরিদাসবাবুর) ছোট ভাই ৺ যামিনীকান্ত দত্ত ও নীলকমল বৈরাগীর সঙ্গে বীরেন রাভারের বাড়িতে যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আসাম বর্ডার পার হইয়া চীনদেশে যাইবার সময় সীমান্তরক্ষী-পুলিশের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। বীরেন রাভাকে পুলিশ ধরে। বীরেন রাভা মহাশয় বলেন, পথ দেখাইয়া দিবার জন্য কিছু তাঁহাকে অর্থ দেওয়া হয়। সেই কারণে তিনি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিতে আসেন। ইহা ব্যতীত তিনি অন্য কিছু অবগত নন।'*

বলা বাহুল্য, এই রডা কোম্পানীর অপহৃত পিস্তল ও কার্তুজ ব্যবহৃত হয়েছিল দেশের বিভিন্ন বিপ্লবীদের আখড়ায়। তার মধ্যে হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের দফরপুর ও শালিকয়ার নামও উল্লেখ আছে। রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুটের ঘটনা যে ব্রিটিশ সরকারকে কি রকম ভাবিয়ে তুলেছিল তা মণ্টেগু—চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়। রিপোর্টের একাংশে বলা হয়েছে—'৫০টা মসার পিস্তল বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টকে প্রায় অচল করে তুলেছিল।' সিডিসন কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে—**This arms theft was an event of greatest importance in the development of revolutionary crime in Bengal.**

মনে রাখতে হবে এত বড় দুঃসাহসিক কাজের প্রধান রূপকার ছিলেন আমতা থানার রসপুরের বীর সন্তান শ্রীশ চন্দ্র মিত্র ওরফে হাবু মিত্র। হাওড়া-বাসী তার জন্য গর্ব করতে পারেন। শুধু তাই নয়—'বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে এই মশার পিস্তল ও কার্তুজ লইয়া সঙ্গীসহ যুদ্ধ করিতে করিতে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে বালেশ্বরের হাসপাতালে নীত হন।[8]

এই প্রসঙ্গে এক বঙ্গললনার কথা না বললে ইতিহাস রচনায় ত্রুটি থেকে যাবে। সেই

* এই তথ্যটি জানা যায় হরিদাস বাবু (দত্ত) ২৫মে, ১৯৬৮ সালের এক সাক্ষাৎকারের লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে। উল্লেখ্য রডা কোম্পানীর অস্ত্র চুরির ব্যাপারে তিনি ছিলেন গাড়ীর গাড়োয়ান। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন প্রবীণ ও বিদগ্ধ ব্যক্তি পাঁচুগোপাল রায়।

বঙ্গললনার নাম ননীবালা দেবী। বালি (দক্ষিণপাড়া) গ্রামের এক তরুণী বিধবা। আগেই বলা হয়েছে রডা কোম্পানীর পিস্তল ও কার্তুজ দেশের বিভিন্ন অংশে বিতরিত হয়েছিল। তার মধ্যে কলকাতার 'শ্রমজীবী সমবায়' অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুধাংশু মুখার্জী পুলিশের হাতে অতর্কিতে গ্রেপ্তার হন। ফলে তাঁদের লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। উক্ত বিধবা ননীবালা রামবাবুর স্ত্রী সেজে প্রেসিডেন্সী জেলে সধবার বেশে দেখা করে অস্ত্রের সন্ধান বিপ্লবীদের সব জানিয়ে দেন। এই ননীবালা তের বছর বয়সে বিধবা হন। কিন্তু চন্দননগরে বিপ্লবী আস্তানায় পুলিশকে প্রতারিত করার জন্য একজন সধবা গৃহিণীর একান্ত দরকার। উত্তরপাড়ার বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে ননীবালা সেই কাজ করতে রাজী হন। 'চন্দন নগরের আস্তানায় তখন আত্মগোপন করে যাঁরা থাকতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী নায়ক ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, মন্মথ বিশ্বাস, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।'[৫] এ সম্বন্ধে আরও জানা যায় 'স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা' (হাওড়া) লেখক দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তীর এক নিবন্ধে লিখছেন 'পুলিশ পরে সব বুঝতে পেরে ননীবালা দেবীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে কাশী থেকে পেশোয়ার যাবার পথে ননীবালাকে গ্রেপ্তার ক'রে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্সী জেলে আনে। সেখান থেকে 'ইলিসিয়াম রো-'তে এনে অশালীন জিজ্ঞাসাবাদ করায় ননীবালা স্পেশাল সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট মিঃ গোল্ডির গালে চড় মারেন। পুলিশ তাঁকে 'ষ্টেট প্রিজনার' করে। ননীবালা দেবীই বাংলাদেশে প্রথম মহিলা ষ্টেট প্রিজনার।'[৬] একথা জেনে শুধু বালি নয়, হাওড়া নয় বঙ্গবাসী মাত্রই গর্বিত হবেন।

উড়িষ্যায় বুড়ীবালামের তীরে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সশস্ত্র খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। কিন্তু বুড়ীবালামের তীরে যাবার আগে বাঘা যতীন যে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে হাওড়ার বাগনান ষ্টেশনের ধারেই অবস্থিত বাগনান হাই স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিলেন তার খবর কজনেরই বা জানা আছে! এই আশ্রয় দাতাই ছিলেন বিপ্লবী দলের অন্যতম কর্মী বাগনান হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতুল সেন। গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সপ্ত—শিখা' পুস্তকে লিখছেন—'যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় বিশ্বস্ত সহযোগিগণকে আগামী বিপ্লবের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিয়া বালেশ্বরে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিলেন চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও যতীশ। এই পঞ্চবীর প্রথমে বাগনানে পরে বাগনান স্কুলের হেডমাষ্টার বিপ্লবী অতুল সেনের সহায়তায় কয়েকদিন কাটাইলেন বাগনান স্কুলের বোর্ডিংয়ে; তারপর তাঁরা চলিলেন বালেশ্বরের অভিমুখে।'

ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পর্যালোচনা করার জন্য ইংরেজ সরকার এক কমিটি তৈরি করেছিলেন—এই কমিটিই কুখ্যাত রাওলাট কমিটি নামে খ্যাত। সরকারকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দমনমূলক আইন প্রবর্তনে সুপারিশ করলেন এই

রাওলাট সাহেব। এই সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল সরকার বিরোধী ব'লে যাদের সন্দেহ হবে তাদেরই বিনা বিচারে খুশিমত গ্রেপ্তার এবং অন্তরীণ করা। এমনকি তাদের গতিবিধির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরামর্শ দেওয়া হয়। জুরী ছাড়াই রাজনৈতিক মামলাগুলি বিচার করার ক্ষমতা বিচারককে দেওয়া, এবং ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল না করতে দেওয়ার ক্ষমতাও গ্রহণ করতে সরকারকে সুপারিশ করা হয়। সরকার বিরোধী কোন পুস্তিকা রাখাও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার কথাও রিপোর্টে বলা হয়। জনগণের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও রাওলাট আইন প্রবর্তিত হল। স্বভাবতঃই এই আইনটি গান্ধীজীর কাছে প্রকাশ্যে এক চ্যালেঞ্জের চেহারা নিয়ে হাজির হ'ল।

এর বছর খানেক আগেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিহারের চম্পারণের নীল চাষীরা তিন কাঠিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে নির্যাতিত চাষীরা ইংরেজ প্রবর্তিত ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করল। ১৯১৮ সালেই গুজরাটের কইরা জেলাতে অজন্মাহেতু 'নো ট্যাক্স' আন্দোলনে ইংরেজের রক্তচক্ষু স্তিমিত হল। ঐ একই সালে আমেদাবাদের কাপড়ের মিলের শ্রমিকদের মজুরী শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়াতে মালিকদের বাধ্য করেছিলেন।[৭]

পর পর জনগণের সংগ্রামে জয়ী হবার দৃষ্টান্তে রাওলাট সাহেবের দমনমূলক প্রস্তাবগুলি কিছুতেই গান্ধীজীর পক্ষে তথা ভারতীয়দের পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়। তারই ফলশ্রুতি হল জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক শোচনীয় ঘটনা। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে ঢেউ সারা ভারতে দেখা দিয়েছিল তার ধাক্কা হাওড়া জেলাতেও এসে লেগেছিল। বিপ্লবাত্মক কার্যাবলীর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে ডোমপাড়া লেনের (বর্তমান গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লেন) তারিণী ঘোষ মহাশয়ের বাড়িটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।

একতলা এই বাড়িটির পাশেই ছিল অধর কুণ্ডুর দোতলা বাড়িটি। ১৯১৬ সাল। রাত্রি ৯টা কি ১০টা হবে। হঠাৎ পুলিশের গাড়ি বাবুডাঙ্গা রোড, বাড়ুজ্যে ঘাট ও হালদার পার্কের (তখন হালদার পুকুর) কাছে এসে জমা হয়েছে। তদানীন্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পরে পুলিশ কমিশনার) চার্লস টেগার্ট সাহেব বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেললেন ডোমপাড়া লেনের সেই বাড়িটি। একে রাত তার ওপর আবার গোরা পুলিশের আগমন। ফলে ডোমপাড়া লেনের সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল। দরজা ভাঙ্গা হলো কুণ্ডুর বাড়ির। প্রহার করা হলো অধরবাবু ও তাঁর শ্যালককে। প্রহারের কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না অধরবাবু কিন্তু বিনা প্রতিবাদে প্রহার সহ্য করতে হলো। পুলিশের একটিই মাত্র কথা, "বিপ্লবীরা কোথায় বল্।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঐ বাড়ির পাশেই একতলা বাড়িটিতে (তারিণী ঘোষের বাড়ি) একদল বিপ্লবী বাস করতেন। এই বিপ্লবীরাই হচ্ছেন বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী) দলের লোক। বিপিন গাঙ্গুলী ও বাঘা যতীনও এই বাড়িতে আসতেন। এই বাড়িতে যাঁরা ছিলেন

তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিপ্লবী উল্লাস কর দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যাদুগোপাল মুখার্জী, যুগলকিশোর মণ্ডল প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। এই বাড়িটি ছিল রাজনৈতিক আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের একটি আড্ডা। সেদিন কেউ কেউ এ বাড়ি থেকে পালাতে সক্ষম হলেও উল্লাস কর টেগার্টকে একবার সম্মুখ সমরে দেখে নিতে চাইলেন। শুরু হলো উল্লাস করের রিভলবারের গর্জন। প্রত্যুত্তরে গোরা পুলিশেরও বন্দুক চলল। বেঁধে গেল এক খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু টেগার্ট তাঁর ব্যূহ রচনা এমনভাবেই করেছিলেন যাতে বিপ্লবীরা পালাতে না পারে। কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর উল্লাস কর ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে পড়েন। উদ্দেশ্য ছিল সাঁতরে অপর পাড়ে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু উল্লাস কর গ্রেপ্তার হলেন পুলিশের হাতে। প্রচণ্ড প্রহার করা হ'ল তাঁকে। রিভলবারটি পাওয়ার জন্য পরদিন ঐ পুকুরে জাল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য রিভলবারটি পাওয়া যায়নি।'* বলা বাহুল্য, উল্লাস করের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এঁদের মধ্যে যুগলকিশোর মণ্ডলও পরে ধরা পড়েন। এই ঘটনার পর থেকে শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম বেশ জোর গতিতে চলতে লাগল। শালকিয়ার বিপ্লবী-ঘাঁটির সঙ্গে উল্লাস করের যুক্ত হওয়ার কারণও ছিল। উল্লাস কর প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তদানীন্তন কালে ঐ কলেজের বেশির ভাগ ইংরেজ অধ্যাপকই ভারতীয়দের বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীদের সম্পর্কে ক্লাসে বিরূপ মন্তব্য করতেন বলে শোনা যেতো। প্রতিবাদ অবশ্য দু'চারজন স্বজাত্যাভিমানী তেজী ছাত্রই করতেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদের কথা আমাদের অতি পরিচিত ঘটনা। কিন্তু উল্লাসকরও যে অনুরূপ প্রতিবাদ আগেই করেছিলেন তা আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত। আর সেই প্রতিবাদ করতে গিয়েই উল্লাস কর কলেজ ছেড়ে বিপ্লবী কর্মে যোগদান করেন। পরে শালকিয়ার বিপ্লবী ঘাঁটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটে। এই প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হুগলী জেলার ইতিহাস' প্রবন্ধে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ১৩৪২ সালে লিখেছেন: "১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর কলেজে কৃষি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল। দ্বিজদাস দত্ত (উল্লাস কর দত্তের পিতা) এই কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন (এখন উঠে গেছে)। উল্লাস কর প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন। তিনিও ঐ কলেজের অধ্যাপক ডঃ রাসেলকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্যের জন্য প্রহার করেন এবং 'বন্দেমাতরম্' ব'লে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে College-এ Poster দিয়েছিলেন House to let. Apply to Lord Curzon. এরপর তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে Shibpore-এ থাকেন।"

বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে সারা ভারতব্যাপী যে বিপ্লবী চিন্তার ঢেউ উঠেছিল তার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে হেরম্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র

* বীরেন ব্যানার্জী ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর জবানীতে এটা জানা যায়।

বিজন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ভারত মাতার শৃঙ্খলমোচনে উৎসর্গ করেন।* ইংরেজ পুলিশের কাছে এ খবর প্রকাশ হ'তেই ১৯১৬ সালে বাবুডাঙ্গার এক বাড়ি থেকে বিজনবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের দু'বছর কারাবাসের পর কৈশোরোত্তীর্ণ বিজন ১৯১৮ সালে মুক্ত হন। কিন্তু এতে তিনি ভীত ও নিরুৎসাহিত না হ'য়ে জোর কদমে দেশসেবায় নেমে পড়েন। বিপ্লবী কার্যকলাপের সংগঠনকে আরও জোরদার করায় ইংরেজের কোপদৃষ্টি আবার তাঁর ওপরে পড়ে।

১৯২১—২২ সালে বিজন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বাবুডাঙ্গার অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপেন চৌধুরী, সতীশ চ্যাং, বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, সুধাংশু চৌধুরী, গৌর দাস, জীতেন চ্যাটার্জী, ডাঃ মলিন চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রেই চলতো বিপ্লবী কাজকর্ম। তারপর কেন্দ্রটি স্টলকার্ট লেনে উঠে আসে। পরিচালনার ভার পড়লো ডাঃ মলিন চ্যাটার্জী, ডঃ জীবানন্দ মুখার্জী ও বিজয় মুখার্জীর ওপর।

ইত্যবসরে বালি, উত্তর পাড়া, ডোমজুড়, মধ্য হাওড়া, তারকেশ্বর, জনাই, দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা, দক্ষিণেশ্বর, ব্যারাকপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ চললো শালিখা কেন্দ্রের। বিপিন গাঙ্গুলীর চেষ্টায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল। ফরিদপুরের (বাংলাদেশ) বিপ্লবী নরেন সাহা ঘুষুড়ি নস্করপাড়া রোডের একটি দেয়াশলাইয়ের কারখানায় যুক্ত ছিলেন। এসবই গোপন কর্মকাণ্ড চলতো প্রকাশ্য কেন্দ্রে। তবে প্রত্যেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতো।

ইতিমধ্যে সরকারীভাবে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হ'ল। বিজনবাবু আত্মগোপন ক'রে বালিতে (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে) ধোপা পাড়ায় আশ্রয় নেন। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে বিজনবাবুর পরিচয় ঘটে। বিপিনবাবুর 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শাখা সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। শালকিয়া বাবু-ডাঙ্গায়ও তার একটি শাখার জন্ম হ'ল যুবক বিজনবাবুর উদ্যোগে। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর নাম বিশেষভাবে জড়িত থাকলেও উহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'জাগরণ ও বিস্ফোরণের' লেখক কালীচরণ ঘোষ লিখছেন—"১৮৯৭ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আত্মোন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়। গোড়ায় উদ্যোক্তা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরে ১৯০৫ সালে সেবা ও শিক্ষা ছেড়ে উহা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা পরিচালিত হয়।"

* বিপ্লবী কাজের জন্য বিপ্লবী রাসবিহারী বসু স্বল্পকালের জন্য কাটলিয়ার সিংহ পরিবারে এবং কোলড়ার সরকার পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দ্রঃ শতবর্ষের আলোকে হাওড়া জেলা পরিষদ।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরনের সমিতির মাধ্যমেই সে সময়ে বিপ্লবী কাজকর্ম ও দেশসেবা হতো—ইংরেজ পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য। বিজনবাবুর আহ্বানে এই সমিতিতে যোগ দিলেন বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, গৌরমোহন দাস, সতীশচন্দ্র ঢ্যাং, সুধাংশু চৌধুরী, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, বসন্ত ঢেঁকী (সকলেই শালকিয়ার) ও ডোমজুড়-পার্বতীপুরের গোষ্ঠ মুখার্জী। আর এঁদের সঙ্গে ছিলেন ডোমজুড়ের আশুতোষ ভট্টাচার্য, ধীরেন মুখার্জী ও বালি উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী প্রমুখ বিপ্লবীরা। এই বসন্ত ঢেঁকীই ১৯২৪ সালে শিশির ঘোষকে হত্যা করার জন্য বোমা ছোঁড়ে। কলকাতার মীর্জাপুর স্ট্রীটে শিশিরবাবু 'স্বদেশী বস্ত্রালয়' নামে একটি দোকান দেয়। তখনকার দিনে এইরকম নামাঙ্কিত দোকান থেকেই দেশসেবকরা বস্ত্রাদি খরিদ করতেন। এইভাবে শিশিরবাবু বিপ্লবীদের গোপন কথা বন্ধু সেজে জেনে নিয়ে পুলিশকে পাচার করতেন। এটা জানতে পারায় বসন্তকুমার ঢেঁকী মালিককে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন। যদিও শিশিরবাবুর সহকারী প্রকাশ বণিক নিহত হয়।[৮] বসন্তবাবুর প্রাণদণ্ডের আশংকা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জুরীদের বিচারে তিনি কয়েক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন। শোনা যায়, এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিখ্যাত 'বিগ ফাইভের' (Big Five) তুলসী গোঁসাই তদানীন্তন প্রিভি-কাউন্সিলে নাকি বসন্তবাবুর হয়ে মামলা লড়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৩-২৪ সালে Eastern Bengal Railway-তে রেল কোম্পানীর আঠারো হাজার টাকা যাচ্ছিল। বিপ্লবী কাজে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের জন্য অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, সূর্য সেন (মাষ্টারদা) ও দেবেন দে (পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন) ঐ ট্রেন আক্রমণ ক'রে পুরো টাকা লুঠ করেন। পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য ওঁরা ওখান থেকে পালিয়ে এসে আস্তানা নেন প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে, আহিরিটোলায় ও পরে বাবুডাঙ্গাতে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৫) জনৈক আসামী ও চট্টগ্রামের বিপ্লবী গণেশ ঘোষকে বাবুডাঙ্গার মন্মথনাথ খাঁয়ের (মনা খাঁ) বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য রাখা হয়েছিল। আর খোকাবাবুকে রাখা হয় ওপাড়ারই সুরমণি চ্যাটার্জীর বাড়িতে। আর এঁদের দেখাশুনার ভার পড়েছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি'র শালিখা শাখার সদস্য বিজন ব্যানার্জী, বীরেন ব্যানার্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী প্রমুখ বিপ্লবীদের ওপর। মনে রাখতে হবে, বিজনবাবুই ছিলেন শালিখার বিপ্লবী আন্দোলনের নায়ক। পুলিশ শালিখা কেন্দ্রের বিপ্লবীদের খুঁজে বেড়াতে থাকে। তাই পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য উপরিউক্ত বিপ্লবীরা বিভিন্ন আড্ডায় ছড়িয়ে পড়লেন। প্রথমে তাঁরা গেলেন ৪ নম্বর শোভাবাজার স্ট্রীটের এক বাড়িতে—তারপর সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায়। বিপ্লবী দেবেন দে ছিলেন বাবুডাঙ্গার সুরমণি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ১৯২৩ সালে বিজন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে শালিখায় যে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে তার কাজকর্ম পুরোদমে চলতে থাকে। 'আত্মোন্নতি সমিতির' শালিখা শাখার ওপর ভার পড়ে বোমা তৈরির জন্য এক

হাজার লোহার খোল তৈরি করার। এই শাখার সদস্যরা এই কাজের ভার সানন্দে নিয়েছিলেন। কারণ এঁদের সভ্য লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ও গৌরচন্দ্র দাস কারখানায় কাজ করতেন। বেনারস রোডের এক কারখানায় ওই খোল ঢালাই হলো। আর জি. টি. রোডের সত্য কুণ্ডুর কারখানায় (শালকিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোঃ) তা ছেঁদা করা হয়। সন্দেহ হ'লেও সত্যবাবু বেশি জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে কাজটা ক'রে দিয়েছিলেন। আর এই বোমার প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল ডোমজুড়ের গুহর মাঠে। এই বোমার ফরমুলো বার করেছিলেন চুঁচুড়ার হরিনারায়ণ চন্দ। হরিনারায়ণবাবু একজন নিজে রসায়নবিদ্ ছিলেন। তাঁর টি. এন. টি. (Tri-Nitro-Toluene) ফরমুলোটি অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। এই খোলগুলির কিছু ডোমজুড়ে, কিছু উত্তরপাড়ায়, কিছু কলকাতায়, অল্পকিছু মধ্য হাওড়ায় ও বাকিগুলি শালিখায় ভাগ করা হয়। শালিখার হাজরা বাড়িতে ও জগবন্ধু ঘোষের বাড়িতে সতীশচন্দ্র ঢ্যাং ও গৌরচন্দ্র দাসের হেফাজতে ঐ বোমাগুলি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মির্জাপুর বোমার মামলায় শালিখায় তৈরি বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল। চৈতন্যদেব চ্যাটার্জীর মতে এই বোমা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনেও ব্যবহৃত হয়েছিল। বসন্ত ঢেঁকির আসামী হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য জেল হয়। শালিখার বোমার মামলায় বীরেন ব্যানার্জী ও বিজন ব্যানার্জী বাড়ি থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে।

১৯২৭ সালে শালকিয়া-বোমার মামলায় ধরা পড়েন বাবুডাঙ্গার সতীশচন্দ্র ঢ্যাং, গৌরমোহন দাস এবং উভয়ের পাঁচ বছর করে জেল হয়। এ সময় বিপ্লবীরা ডাকাতির পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই ঘর থেকে টাকা এনে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় ক'রতে লাগলেন। এ কাজে বিত্তবান পরিবারের সন্তানরাও পিছিয়ে রইলো না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উত্তরপাড়ার বিত্তবান ঘরের ছেলে ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী সাবালক হ'য়ে তাঁর সম্পত্তির অংশ বিক্রী ক'রে তখনকার দিনে সাড়ে এগার হাজার টাকা বোমা তৈরি ও অন্য অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য দান করেছিলেন।

এরপরই হলো দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা। ১৯২৫ সাল, ১০ই নভেম্বর। এই মামলায় ধরা পড়েন বীরেন ব্যানার্জী, রাজেন লাহিড়ী, (কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) হরিনারায়ণ চন্দ, নিখিল ব্যানার্জী, অঙ্কুর মুখার্জী, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী (নুদুদা), ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী (তিনজনই উত্তরপাড়ার) প্রমুখ বিপ্লবীরা। বিচারে রাজেনবাবুর ফাঁসী হয়। বীরেনবাবুর পাঁচ বছর জেল হয়। ১৯২৬ সালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্পেসাল সুপারিটেনডেণ্ট রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার অপরাধে বীরেন ব্যানার্জী, অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন সেন (ফাঁসী হয়) প্রমুখের ফাঁসীর হুকুম হয়। বীরেনবাবু হাইকোর্টে আপীল ক'রে ফাঁসীর হুকুম থেকে রেহাই পান। পাঁচ বছর জেল ভোগের পর ১৯৩০ সালে তিনি ছাড়া পান। কিন্তু পুলিশ পরক্ষণেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এরপর ছাড়া পান ১৯৩৮ সালে।

শালিখার বিপ্লবীদের আড্ডায় উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ চাটুজ্জ্যে বাড়ীর সন্তানরা যেমন অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী ও ঐ অঞ্চলের অঙ্কুর মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীদের যোগাযোগের সূত্র কি, এই প্রশ্ন আমাকে ভাবিত করে। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি যে, বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর বোনের সঙ্গে বাবুডাঙ্গার প্রসিদ্ধ মুখার্জী বংশের যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জীর বিয়ে হয়। তাঁরই পুত্র ছিলেন শঙ্করলাল মুখার্জী (হাঃ মিউঃ ভাইস চেয়ারম্যান)। সেই সূত্রেই অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখের এই অঞ্চলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গাঢ় হ'য়ে ওঠে। চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী অবশ্য আর একটি সূত্রের কথা অর্থাৎ শিল্পী সুধাংশুশেখর চৌধুরীর বন্ধুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। স্বদেশপ্রেমের অপরাধে যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জীর হাতে গরম Hand Press দিয়ে জলে তাঁর হাত ডুবিয়ে রাখার ঘটনা প্রবীণদের অনেকেরই জানা আছে।

সশস্ত্র আন্দোলনে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৭) একটি বড় ঘটনা। এ ব্যাপারেও শালিখার বিপ্লবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দুমকার কাছে বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে ঐ মামলা করেন ইংরেজ শাসক। বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্দেহবশতঃ কয়েকজনকে ধরা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুরেন ভট্টাচার্য ও বীরেন ভট্টাচার্য (দুভাই), বিজন ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বাবু), লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ (তিনজনই শালিখার), তেজেশ ঘোষ (জলপাইগুড়ির জনৈক চা বাগানের মালিকের ছেলে)। এই মামলা সরকার পক্ষ দুমকা সাবজেলে চালানো নিরাপদ নয় ভেবে দেওঘর কোর্টে নিয়ে যায়। তাই এ মামলার নাম হয় 'দেওঘর ষড়যন্ত্র' মামলা। বিচারে বিজনবাবু ও লক্ষ্মীবাবুর জেল হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই মামলা ১৯২৯ সালে দেওঘর কোর্টে ওঠে। বিচারপতি স্বভাবতঃই ইংরেজ। আসামীপক্ষের উকিল ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী নিশীথ সেন (মেয়র), দেশনেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, ব্যারিস্টার এ. সি. মুখার্জী। আসামীরা নিজেরাই দোষ স্বীকার করায় মামলার কোন মেরিট নেই ভেবেই চূড়ান্ত সওয়ালের দিন ঐ তিনজন ব্যবহারজীবীই কোর্টে দাঁড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে তাঁদেরই জুনিয়ার শালিখার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী জগন্নাথ পোড়েল মশায় আইনের অনুশাসনের ওপরে মানবিকতারও যে একটা দিক আছে তা স্মরণ করিয়ে দিলে বিদেশী বিচারকের হৃদয়ে নাড়া দেয়। ফলে শাস্তির মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।

১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় শালিখার সন্তোষ গাঙ্গুলী ও উত্তর-পাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী আত্মগোপন ক'রে কটকে এক দেয়াশলাইয়ের কারখানায় কাজ করতে থাকেন। এই কারখানাটি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাই সুরেশ বসু মশায়ের। সেখানে ঐ যুবকদ্বয় অমল সাহা (চৈতন্যদেব) ও বিমলসাহা (সন্তোষ গাঙ্গুলী) নাম নিয়ে কাজ ক'রতে থাকেন। শুধু তাই নয়। ঐ কারখানার চীফ কেমিস্ট নরেন সাহা যখন তাঁদের পারিশ্রমিকের কথা তোলেন তখন তাঁরা শিক্ষানবীশ কালে বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ ক'রতে রাজী হন। বলা বাহুল্য, বসুজায়া এই

সংবাদ শুনতে পেয়ে প্রতিদিন ঐ যুবকদ্বয়ের জন্য দুপুরের খাবার কারখানায় পাঠিয়ে দিতেন। অবশ্য বেশী দিন তাঁদেরকে সেখানে থাকতে হল না। নেতা বিজনবাবুর নির্দেশে আবার তাঁদেরকে শালিখায় ফিরে আসতে হয়। শালিখায় ফিরে আসার পরই সন্তোষ গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হন। সন্তোষ গাঙ্গুলী ও তারকেশ্বরের শচীন ঘোষ হাজারীবাগ জেলেতে ১৮ দিন অনশন করেন।

১৯৮১ সাল। ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবীদের অন্যতম প্রথম সারির নায়ক ভগৎ সিংয়ের ফাঁসীর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। ভগৎ সিংহের আত্মবলিদানের ঘটনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে শালিখার বিপ্লবী ঘাঁটির যোগাযোগ ছিল। আর এই যোগাযোগ ঘটেছিল তাঁরই সহযোগী বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের মাধ্যমে।

১৯২৮ সাল। সাইমন কমিশনকে ভারতে পাঠান হ'ল এদেশীয়দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করার জন্যে। ভারতীয় প্রতিনিধি বিহীন এই কমিশনকে ভারতবাসী অভ্যর্থনা জানিয়েছিল 'কালো পতাকা' দিয়ে। চরমপন্থী নেতাদের অন্যতম নায়ক লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে লাহোরে যে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছিল সেই মিছিলেই পুলিশের লাঠির ঘায়ে তিনি আহত হন এবং পরিণতিতে হয় তাঁর মৃত্যু। লাহোরের সহকারী পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট সাণ্ডার্সের লাঠির আঘাতে যাদের শরীরের রক্তকে টগবগিয়ে তুলেছিল ভগৎ সিং তার মধ্যে প্রধান। এই ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে বটুকেশ্বর দত্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। বর্ধমানের এক গ্রামের ছেলে বটুকেশ্বর। কিন্তু গ্রামের সংশ্রব ছেড়ে যুবক বটুকেশ্বর এলো শহরে। সেই শহরটিই হচ্ছে হাওড়া শহরের শালিখা অঞ্চল। এই বটুকেশ্বর ছিল বর্তমান অতুল ঘোষ লেনে বঙ্কু দত্তের বাড়িতে (ডাঃ প্রকাশচন্দ্র আঢ্যের পুরাতন বাড়ির পিছনে)। বঙ্কুবাবু ছিলেন বটুকেশ্বরের পিতৃব্য। ভগৎ সিংয়ের কাছেই বটুকেশ্বরের রিভলভার ছোঁড়ার শিক্ষা। যুবক বটুকেশ্বর বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লেও সঙ্গীতচর্চায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেনের মোড়ের মুখে Jolly Friends' Association and Concert Party নামে একটি ক্লাব ছিল। বটুকেশ্বর হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ক'রতে ভালবাসতেন। বটুকেশ্বরের বয়স তখন ১৯—২০ হবে। হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক পার্টির সদস্য ভগৎ সিং লালাজীর (লালা লাজপত রায়) হত্যাকারী অত্যাচারী সাণ্ডার্সকে হত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না আরও সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করবার তিনি পরিকল্পনা করলেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন বটুকেশ্বর দত্ত। ভগৎ সিংয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী বটুকেশ্বর শালিখার বাড়ি থেকে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে দিল্লী রওনা হন। তারপরের ঘটনা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। ৮ই এপ্রিল, ১৯২৯ সাল। নয়াদিল্লী অ্যাসেম্বলী হাউসে কুখ্যাত 'ট্রেড ডিসপিউট' বিল আলোচিত হচ্ছে। যে মুহূর্তে সভাপতি বিলটিকে গৃহীত হ'ল ব'লে ঘোষণা করলেন সঙ্গে সঙ্গে দর্শক গ্যালারী থেকে এক বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন

বোমা হলের মেঝেতে ভগৎ সিং ছুঁড়লেন। কয়েক সেকেন্ড পরেই অনুরূপ আর একটি বোমা ছুঁড়লেন বটুকেশ্বর দত্ত। দু'জনে পলায়নের কোন চেষ্টা না ক'রে বীরের মত ধরা দিলেন ইংরেজ পুলিশের হাতে। ফল দু'জনেরই মৃত্যু। তবে সেই মৃত্যু ছিল তাঁদের পায়ের ভৃত্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বটুকেশ্বরের খুড়তুতো দাদা শ্যামাপদ দত্ত তখনকার দিনে কলকাতা পুলিশের একজন সাব্‌ইনসপেক্টর ছিলেন।*

বটুকেশ্বর দত্ত প্রসঙ্গে অমিয় ঘোষের 'বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ' প্রবন্ধটিও লক্ষ্য করার মত। তিনি লিখেছেন—'হাওড়ার অমৃত পাইন লেনের বাসিন্দা বিপ্লবী গণেশ মিত্র 'সেবা সংঘ' ও 'হাওড়া ভলান্টিয়ার্স' সংস্থার সদস্য সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (সোনা), কমিউনিষ্ট নেতা জীবন মাইতি প্রমুখ হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আত্মগোপন করার পর ধরা পড়লে দীর্ঘ কারাবাস হয়। এক সময়ে বটুকেশ্বর দত্ত বেশ কিছুদিন হাওড়ায় আত্মগোপন করেছিলেন। বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড ও চিন্তামণি দে লেনের সংযোগস্থলে (পুরাতন খুরুট রোড) যে তিনতলা পুরানো বাড়িটি যা 'হরি বিরাজ আশ্রম' হোটেল বলে পরিচিত সে বাড়িটির উপর তলায় তিনি ছিলেন। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে দেখাশোনা করতেন।'

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন বিপ্লবী যতীন দাস। চৌষট্টিদিন অনশন করে ১৯২৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর জেলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর শবদেহ হাওড়া স্টেশনে পেঁছলে প্রথমে হাওড়া টাউন হলে রেখে হাওড়াবাসীর সঙ্গে জেলার বিপ্লবী কর্মীরাও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়।

১৯৩০ সাল। ১৮ই এপ্রিলে চট্টগ্রামে ঘটল এক হাড় কাঁপানো ঘটনা। সূর্য সেনের (মাষ্টারদা) নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করল বিপ্লবীরা। মাষ্টারদার সঙ্গে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল সহ আরও অনেকে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে বন্দুকের লড়াই চালিয়ে যান। এখান থেকে মাষ্টারদা ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসেন হাওড়া শহরে। প্রথমে কিছুদিন বাউড়িয়া চটকলে শ্রমিকের কাজ করেন—পরে শালকিয়ায় বাবুডাঙ্গার মনা খাঁর বাড়ি এবং বেলুড়ে একটি ইঁটখোলায়ও আত্মগোপন করে ছিলেন।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র পরিচালক বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রায়ই হাওড়ায় আসতেন তাঁর মামা হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কারণ ছিল একটাই—কিছু অর্থ

* বটুকেশ্বরের শালিখায় বাস ও ভকৎ সিংয়ের সঙ্গে বিপ্লবী কাজের এই মূল্যবান তথ্যটি দিয়ে হাওড়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছেন তদানীন্তন স্বদেশকর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু ব্যায়াম সমিতির অন্যতম সংগঠক নরসিংহ ভকৎ। বর্তমানে সাধু হয়ে ঝাড়গ্রামে নিজ আশ্রমে আছেন।

সাহায্য চাই। হাওড়াতে বিপিনবাবুর উৎসাহে 'আত্মোন্নতি সমিতির' (অনুশীলন সমিতি) শাখা সংগঠন বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যায়ামচর্চা ছাড়াও সবকটি কেন্দ্রেই স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের ট্রেনিং দেওয়া হত। বিপিনচন্দ্র তাঁর মামা শরৎচন্দ্রের কাছে সমিতির কাজের জন্য অর্থ সাহায্য চাইলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু জেলার সব দলের বিপ্লবীদেরই কাজে উৎসাহ দিতেন সাধ্য মত অর্থ দিয়ে। বিপিনচন্দ্রের হাওড়ায় আনাগোনার সুবাদে শিবপুরেও অনুশীলন সমিতির শাখা গড়ে ওঠে। স্বয়ং বিপিনচন্দ্র শিবপুরে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ বেণী দত্তের বাড়িতে এসে আত্মগোপন করে থাকতেন। তাই ডাঃ দত্তের বাড়িতে বিপ্লবীদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। শিবপুর বোমার মামলায় জড়িত ছিলেন বলাইচন্দ্র সিংহ, পুলিনবিহারী রায়, গুরুদাস দত্ত, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তারজন্য ইংরেজ পুলিশের হাতে তাঁদের অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় যে শিবপুর, মধ্য হাওড়া, ডোমজুড় ও শালকিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন কেন্দ্র ও ক্ষেত্র হলেও বালিতে কিন্তু অগ্নিযুগে বা তার পরেও প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী বালি গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসেনি। তবে বালি সে যুগে অনেক আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে, অসুস্থদের সেবা করে ও গোপন সংবাদ আদান-প্রদান করে বিপ্লবীদের কাজে সাহায্য করেছে তদানীন্তন বালির যুব সমাজ। এই রকম একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। যার নাম ছিল 'বাণী মন্দির'। এই কাজে উল্লেখযোগ্য সাহায্যকারীরা ছিলেন রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ দাস, বীরেন দত্ত, শৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও সতীশ চক্রবর্তী। এর কারণ ব্যাখ্যা করে 'বালি সাধারণী সভা' তার শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থে লিখেছে—'চাকুরীজীবী নিম্নবিত্ত পরিবারের সংখ্যা বালিতে অধিক। বে-পরোয়া হইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়া সেজন্য অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।' মন্তব্যটি খুবই ভেবে দেখার মত।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে হাওড়া জেলার বিপ্লবাত্মক ভূমিকা স্মরণ করার মত। দেশ আজ স্বাধীন। ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনে সারা দেশের সঙ্গে হাওড়াও যে তার সাধ্যমত অংশ নিতে পেরেছে এতে হাওড়াবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত। সে সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীররা আজ হয়তো অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। তবে যাঁরাও বা আছেন তাঁদেরও আমরা ভুলতে বসেছি—বর্তমান জাগতিক সুখভোগের মধ্যে।

---

১. সপ্তশিখা—গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়।
২. ঐ
৩. স্মারক গ্রন্থ—বিপ্লবী শ্রীশ চন্দ্র মিত্র (হাবু)—পাঁচুগোপাল রায়।
৪. স্মারক গ্রন্থ—বিপ্লবী শ্রীশ চন্দ্র মিত্র—পাঁচুগোপাল রায়।
৫. স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলা সোনালীবৃন্দ—সম্পাদনা প্রফুল্ল দাসগুপ্ত।
৬. শতবর্ষের আলোকে—হাওড়া জেলা পরিষদ ১৯৮৬।
৭. স্বাধীনতা সংগ্রাম—অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপান চন্দ্র ও বরুণ দে।
৮. স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা—দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী—"সান্ধ্য বিবরণ" দৈনিক পত্রিকা—হাওড়া।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ অন্যতম। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষভাবে তদানীন্তন বঙ্গদেশের সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হ'লেও অপ্রত্যক্ষভাবে তা জাতীয় আন্দোলনকেই সাহায্য করেছিল। এই আন্দোলন সারা দেশের হ'লেও হাওড়ার অবদান এ ব্যাপারে স্মরণ করার মত।

'তারকেশ্বরের মঠ' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অতি পরিচিত নাম। শিবের পুজোর জন্য সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা উপস্থিত হ'লেও একথা বাস্তব সত্য যে, বাঙ্গালীর লালন-পালনেই আজও তারকেশ্বর মঠ সজীব হ'য়ে আছে। কিন্তু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে বাঙ্গালীর কোন দান ও চিন্তা নেই। এই মঠ স্থাপন উত্তর ভারতের 'দশনামী শৈব' সম্প্রদায়ের মোহান্তবাদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মোহান্তবাদীদের কোন সম্পর্কই নেই। তাই বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে বলেছেন—'প্রকৃতপক্ষে মোহান্ত কালচার বাংলার বাইরে থেকে অ-বাঙ্গালীরা আমদানী করেছে।'

'দশনামী' সাধুদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক। শংকরাচার্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকে বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণার্থে সারা ভারতে চারটি মঠ তৈরি করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে শৃঙ্গগিরি মঠ, সারদা মঠ, গোবর্ধন মঠ ও যোশী মঠ। শংকরাচার্যের চারজন প্রধান শিষ্যের আবার দশজন শিষ্য ছিলেন। এই দশজন মোহান্ত থেকেই দশনামী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর ২য় ভাগে বলেছেন, "এই চার মঠাচার্যের দশজন শিষ্য থেকে পরবর্তী কালে প্রচলিত দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।"[১]

তারকেশ্বরের মঠ প্রতিষ্ঠা করেন পশ্চিম ভারতের একজন রাজার ভ্রাতা—নাম তাঁর রাজা ভারামল্ল সিং।[২] অত্যাচারী পাঠান দস্যুদের অত্যাচারে তিনি বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন। ভারামল্লের একটি পয়স্বিনী গাভী ছিল। জনশ্রুতি তাঁর ভাই ঐ গাভীটিকে নিয়ে বনে চরাতে যেত। মজার ব্যাপার হল, গাভীটি যখনই একটি শিলাখন্ডের ওপর এসে দাঁড়াতো তখনই তার বাঁট থেকে দুধ গড়াতে শুরু করতো। রাজা নিজেও ওই ব্যাপারটি একাধিক দিন লক্ষ্য করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও ঐ শিলাখণ্ডটি তোলা গেল না। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে তিনি সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'মোহান্ত' নামধারী এক সন্ন্যাসী এসে পুজো ক'রতে লাগলেন।[৩] পুজারী মাধব গিরির সময়ে এখানে এক কুৎসিত ঘটনা ঘটে। জনৈক নবীনের স্ত্রী এলোকেশী নামে এক অসামান্যা সুন্দরী স্বামীর সঙ্গে তারকেশ্বরে পুজো দিতে আসেন। মাধব গিরির লোক তাকে মঠের ঘরে নিয়ে

যায়। স্ত্রীকে উদ্ধার করা অসম্ভব ভেবে তিনি বঁটী দিয়ে স্ত্রীর গলা নিজেই কেটে দেন। বিচারে তাঁর চরম দণ্ড হ'ল এবং মাধব গিরিরও ছ'মাস জেল হয়।

মাধব গিরির পরেই মোহান্ত হলেন তাঁরই শিষ্য সতীশ গিরি। মোহান্ত এঁদের উপাধি হ'লেও মোহের অন্ত কিন্তু এঁদের তখনও হয়নি। অপর পক্ষে ঘটনা এই কথা ই প্রমাণ করবে যে, ওঁরা মোহের প্রতিই আসক্ত ছিলেন। ফলে কোর্ট কাছারী হয়েছে অনেক। আদালতের রায়ও তাই প্রমাণ করে। সতীশ গিরিও ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না। প্রথম জীবনে এই সতীশ গিরি জমিদারের দারোয়ান ছিলেন। শোনা যায়, তিনি এক সময় স্টেশনের পানিপাঁড়ের কাজও করেছেন। এহেন ব্যক্তি গুরুদেবের মৃত্যুর পর মঠের বিপুল সম্পত্তির মালিক হ'য়ে পড়লেন। এই সতীশ গিরির বিরুদ্ধে জনসাধারণের নানা অভিযোগ ছিল। এমনকি নারী-ঘটিত ব্যভিচারের অভিযোগও ছিল। তদানীন্তন বিদেশী ইংরেজ সরকার এসব দেখে শুনেও চুপ ক'রে থাকতেন। কিন্তু এমনই এক মারাত্মক ঘটনা ঘটলো এই সতীশ গিরিকে নিয়ে যার বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে গর্জে উঠল সারা বঙ্গাদেশ। ঘটনাটি হ'ল এই—

১৯২৩ সাল। হাওড়ার এক উকিলবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তারকেশ্বরে তীর্থ করতে যান। সতীশ গিরির লোকেরা ঐ ভদ্র মহিলাকে একটি ঘরে তালা দিয়ে রেখে ভদ্র-লোককে অন্যত্র নিয়ে যায়। ভদ্র মহিলা সমূহ বিপদের আশংকা বুঝতে পারলেন। হঠাৎ তিনি ঐ ঘরেই একটি দা দেখতে পান। সেটি দিয়ে পিছনের বাঁশের বাতা কেটে কোনক্রমে স্টেশনে এসে পেঁাছান। দুজন সাহেব শিকার ক'রে ফেরার পথে সেই সময় তারকেশ্বর স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্র মহিলা তাঁদের পায়ে ধ'রে তাঁদেরকে বাঁচাবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। সাহেব দু'জন তাঁর স্বামীকে অাশ্রয় উদ্ধার ক'রে আনেন। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশে বঙ্গদেশে সোরগোল পড়ে যায়। 'ব্রাহ্মণ-সভার' জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী নিজে তারকেশ্বরে যান এবং ঘটনাটি সত্য ব'লে জানতে পারেন। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ও সচ্চিদানন্দ স্বামী এই অন্যায় রুখতে এগিয়ে এলেন। দুই স্বামীজী 'ব্রাহ্মণ-সভাকে' এ কাজে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা এলেন না—এলেন না দুর্নীতি দূরীকরণে বিদেশী শাসকও। তাই ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সতীশ গিরিকে পদচ্যুত ক'রতে এগিয়ে এলেন। দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তিনি সেখানে সরেজমিনে তদন্ত ক'রে আসেন। এই উপলক্ষে ১৩৩১ সালে ১লা আষাঢ় কলকাতার মির্জাপুর পার্কে (বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় বাংলার যুবশক্তিকে সত্যাগ্রহের শামিল হ'তে দেশবন্ধু আহ্বান জানান। ইংরেজ রাজপুরুষরা এই আন্দোলনকে Colossal Hoax ব'লে আখ্যা দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চিত্তরঞ্জনেরই জয় হয়।

এই আন্দোলন সংগঠনে হাওড়ার অধিবাসীদের এক বিশেষ অবদান আছে—যেটা

অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। ঐ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য শালকিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও পৌর কমিশনার বনওয়ারীলাল রায়ের নেতৃত্বে এখানে একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বানন্দ স্বামী (এঁরা উভয়েই পশ্চিমা সাধু) বনওয়ারীলাল রায়ের ক্ষেত্র-মিত্র লেনস্থ বাড়িতে থেকে (আর্য সমাজের বিপরীত দিকে একতলা বাড়িটি) এই আন্দোলনকে সফল ক'রতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। শালকিয়া থেকে যেসব সত্যাগ্রহীরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ শম্ভুচরণ পাল (হাওড়া বার্তার সম্পাদক), সুধীর মজুমদার (বড়বাগান) এবং বাবুডাঙ্গার উপেন চৌধুরী।

হাওড়ার প্রান্ত সীমায় হুগলীর নতিবপুরে জন্মালেও বলাই চন্দ্র সিংহ হাওড়া শহরকে বেছে নেন দেশ সেবার কেন্দ্র হিসাবে। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে 'মহাবীর দল'-এর তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। বলাইবাবুর সঙ্গেই এই আন্দোলনে যোগ দেন মধ্য হাওড়ার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী রায় (অমরাগড়ী), নগেন ব্যানার্জী বালিচকের কার্তিক চন্দ্র পাত্র, বটকৃষ্ণ রায় ও কদমতলার অনাদি মুখার্জী। এঁরা সকলেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই সত্যাগ্রহে কর্মী সংগ্রহ করে ও নিজেরা গ্রেপ্তার বরণ করে মোহান্তের কামিনী-কাঞ্চনের মোহভঙ্গে সহায়তা করেছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে বালির অধিবাসীদের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ উল্লেখ করার মত। প্রথম শ্রেণীর নেতারা প্রথম দিকে গ্রেপ্তার বরণ করায় পরে সত্যাগ্রহী যোগানদান চিন্তার বিষয় হয়ে পরে। এ ব্যাপারে বালি কংগ্রেসের কর্মী মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভার পড়ল নিয়মিত সত্যাগ্রহী যোগান দেওয়া। এই প্রসঙ্গে 'অভিনন্দন—অঞ্জলি' স্মারকগ্রন্থে সুধাকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—'প্রতিদিন পাঁচজন করে সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে—এই ভাবে প্রায় পনের দিন মোহিতকুমার তাঁর সত্যাগ্রহী ছাত্রদের মোহান্তের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পাঠান। এবং প্রত্যেকেই হন ছমাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত।' দণ্ডিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কানাই পাঠক, তারাকুমার মুখার্জী, বনবিহারী ব্যানার্জী, ঘোষপাড়ার প্রবোধ ঘোষ প্রমুখ। পরে এরা সকলেই গ্রামের শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক উন্নতি বিধানে যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।[৪]

বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জন দাশের এই আন্দোলনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রতে হাওড়ার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বারবণিতারা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে তাঁরা অর্থ সংগ্রহে বার হ'তেন। সে গানের বাণী আজও মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের মুখে মুখে ধ্বনিত হ'তে শোনা যায়—

ভিক্ষা দাও গো   ভিক্ষা দাও গো
এসেছি ভিক্ষা করিয়া সার,

তারকেশ্বর ভেসেছে পাপেতে
করিছে সবাই হাহাকার।
সচ্চিদানন্দ বিশ্বানন্দ গুণাধার
রুধিলে দানে কারাবরণে
করিছে দেশের পাপ সংহার।

এই আন্দোলন চালানোর জন্য তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির খ্যাত-নাম্নী নেত্রী বীণা দাস পর্যন্ত শালিখায় সভা ক'রে এখানকার অধিবাসীদের অত্যাচার, অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শামিল হ'তে আবেদন জানিয়েছিলেন। অবশ্য সকলেরই জানা আছে শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনই জয়যুক্ত হয়েছিল। সতীশ গিরির বিরুদ্ধে যে মামলা হয় তাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। সতীশ গিরি মোকদ্দমায় জেতার জন্য নিজেকে তান্ত্রিক ব'লে দাবি করেছিলেন। কিন্তু হুগলীর জেলা-জজ মিঃ কে. সি. নাগ যে রায় দেন তাতে তিনি সেই দাবিকে অস্বীকার করেন। বিচারপতি শ্রীনাগ তাঁর রায়-দানে বলেন—**Their learned discourses on the Hindu Shastras established beyond doubt that the Dashnami Sannyasis are Vedic Sannyasis—and that the Mathadhari Sannyasis belonging to school of Shankaracharya are Vedic and not Tantric Sannyasis, that the Tarakeswar Math is governed by the Shankaracharya School of Thought, that the Mohaunt of the Tarakeswar Math...is a Mathadhari Dashnami Sannyasi.**[৫]
এই রায় থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দশনামী সাধুরা আসলে বৈদিক সন্ন্যাসী।

---

১. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।
২. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুধাকৃষ্ণ বাগচি।
৩. ঐ
৪. বালি সাধারণীসভা—শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ।
৫. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।

ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে হাওড়া জেলার কংগ্রেস কর্মীদের তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন হল। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই যেমন সংগঠন মজবুত হয় তেমনি মহৎ ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ সংগঠনে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। বলা বাহুল্য, হাওড়া জেলার কংগ্রেস কর্মী তথা জেলাবাসীর সঙ্গে দেশবন্ধুর সেই সম্পর্ক আরও অন্তরঙ্গতায় পর্যবসিত হল তদানীন্তন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

১৯২৪ সাল। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এই নির্বাচনে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সেই নির্বাচন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য দেশবন্ধুকে হাওড়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করতে হয়েছিল—করতে হয়েছিল অনেক নাম করা বাড়িতে ঘরোয়া বৈঠক। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটি ইতিমধ্যেই (১৯২১) গঠিত হয়েছে।[১] সেই কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মধ্য হাওড়ার নামী বাসিন্দা অমৃতলাল পাইন (ব্যবহারজীবী বরদাপ্রসন্ন পাইনের পিতা) এবং জেলা সম্পাদক ছিলেন রামকৃষ্ণপুরের প্রাচীন বাসিন্দা বীরেন বসু। শালকিয়া অঞ্চলের কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় ১৯২৬-২৭ সালে। এই কমিটির তালিকা পূর্ণাকারে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী ও 'হাওড়া বার্তা' সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পালের স্মৃতিচারণে জানা যায় যে শালকিয়া আঞ্চলিক কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ভাইস চেয়ারম্যান), সম্পাদক ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—শম্ভুচরণ পাল। উল্লেখে অত্যুক্তি হবে না যে ১৯২৪ সালের হাওড়া পৌর নির্বাচনে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস পৌর বোর্ড লাভ না করলেও তিনি জেলার কংগ্রেস কর্মীদের মনে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য নতুন জোয়ার বহাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথাপি এ কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না যে তৎকালীন হাওড়া কংগ্রেসের কর্তৃত্ব সমাজের কতিপয় বিত্তশালী শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড এওয়ার্ড অনুযায়ী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীজীর সঙ্গে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যেই 'স্বরাজ্যদল' নামে এক উপদল গড়ে উঠেছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বরাজ্য দল সিন্ধু ও বঙ্গদেশ ছাড়া তদানীন্তন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। হাওড়া জেলায় 'স্বরাজ্য দলে'র প্রভাবই সর্বাধিক ছিল। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন।[২] কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ১৯২৫ সালে আকস্মিক মৃত্যুতে আবার সবাই কংগ্রেসের মূলস্রোতে ফিরে আসেন।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ১৯২২ সালে প্রত্যাহৃত হওয়ায় সারা দেশের ন্যায় হাওড়া জেলায়ও কর্মীরা যেন ঝিমিয়ে পড়েন। কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অমৃতলাল পাইনের পুত্র বরদাপ্রসন্ন পাইন জেলা কংগ্রেসে সম্ভাবনাময় নতুন রক্ত সঞ্চালনের দিকে দৃষ্টি দিতে চাইলেন। এই সময়েই বিদেশ প্রত্যাগত বিশেষ কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক হরেন্দ্র নাথ ঘোষ দেশ মাতৃকার সেবায় ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। ফলে হরেন্দ্রনাথকেই জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক করা হলো ১৯২৬ সালে।

অসহযোগ আন্দোলনে হাওড়া জেলার গ্রামের মানুষও পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেন। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা' প্রবন্ধে দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী লিখছেন—১৯২১ খ্রীঃ ঝোড়হাটের পুলিন ব্যানার্জী সাঁকরাইল থানার মধ্যে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন করে জেলে যান। তিনি যেমন ঐ থানার মধ্যে প্রথম সত্যাগ্রহী, তেমন আলিপুর কোর্টের আইনজীবীদের মধ্যেও প্রথম সত্যাগ্রহী। শুধু তাই নয়—তিনি আরও লিখেছেন—হাওড়া জেলার প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী হলেন তাঁরই স্ত্রী করুণাময়ী দেবী।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে বালি গ্রামের যুবকেরা ঝাঁপিয়ে পড়লেও এর মূলে ছিলেন ঐ গ্রামেরই এক গঠনকর্মী—তাঁর নাম ছিল নলিন চন্দ্র মিশ্র। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় নলিন চন্দ্রের উদ্যোগে বালি গ্রামে এক বিরাট স্বদেশী সভা করা হয়েছিল। তাতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পাল ও হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ সর্বপ্রথম ঐ গ্রামে স্বদেশী বীজ বপন করেন।[৩] বালির যুবকদের নিয়ে নলিনবাবু স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সমাজসেবার কাজও সমান ভাবে চালিয়ে যেতেন। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে বালির যুব সমাজ তাঁর নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছাত্ররা দলে দলে আন্দোলনে যোগ দিল। চরকা ও তকলি কাটা চালু হল ঘরে ঘরে। সঙ্গে চলল মাদক দ্রব্য ও বিলাতী বস্ত্র বর্জনের আন্দোলন। রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকবৃন্দের নেতৃত্বে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গান্ধীজীর অসহযোগের বাণী পৌঁছে দেবার কাজ চলতে লাগলো। তারপর লবণ আইন ভঙ্গে গান্ধীজীর 'ডাণ্ডি অভিযান' শুরু হলে বালিতেও সেই আন্দোলনের ঢেউ লাগলো। তদানীন্তন ছাত্র নেতা রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আইনবিদ) নেতৃত্বে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন করল। গ্রেপ্তার হলেন রণজিৎ বাবু ও শতাধিক ছাত্ররা। মদের দোকানে পিকেটিং ও বিলেতী বস্ত্র বর্জনের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে নিগৃহীত ও দণ্ডিত হলেন বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক বন্দ্যোপাধ্যায়, বংশীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশির গাঙ্গুলী প্রমুখ। বালির

কংগ্রেস কর্মীরা কেবল বিদেশী দ্রব্য বর্জনের শ্লোগান দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। গান্ধীজী 'ডান্ডী অভিযানে' গ্রেপ্তার হলে জাতীয়নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠা করলেন 'Buy Swadeshi' লীগ। বালির কর্মীরা সেই আদর্শে এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন—'স্বদেশী জিনিষ কেনবার সমিতি।' যার সভাপতি ছিলেন পাঠকপাড়ার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্তুবাবু) এবং সম্পাদক ছিলেন মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৪]

এ ছাড়া ১৯২১ খ্রীঃ ২৪-শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতায় আসার দিন ছিল। সেদিন কলকাতার সঙ্গে হাওড়ায়ও হরতাল পালিত হয়। জনতার রোষ এত তুঙ্গে উঠেছিল যে সেদিন পুলিশকে গুলি চালাতেও হয়।

হরেন্দ্রনাথের নতুন নেতৃত্বে হাওড়া জেলা কংগ্রেস পেল নতুন শক্তি। কারণ বিলেতে থাকাকালীন হরেন্দ্রনাথ একাধারে যেমন ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সংস্পর্শে থেকে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন তেমনি কমিউনিষ্ট শ্রমিক নেতা রজনী পাম দত্তের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়েও পরামর্শ করতেন। ফলে তিনি কংগ্রেসের কাজকে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার জন্য কংগ্রেস নেতা বিপিন বসু, গুরুদাস দত্ত ও নন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে হাওড়ার গ্রামে প্রচার কার্যে ব্রতী হলেন। গ্রামের লোকের উৎসাহ যেন তাঁদেরকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করতে থাকে।

কংগ্রেসের পতাকাতলে যুবশক্তিকে সংগঠিত করে তোলার জন্য হরেন্দ্রনাথ তাঁর দাদা সুরেন্দ্রনাথ, কংগ্রেস নেতা অজিত মল্লিক, হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ধীরেন সেন, সন্তোষ ঘোষাল ও গৌরমোহন রায় প্রমুখের সহযোগিতায়, 'হাওড়া সেবা সংঘ' গড়ে তুললেন। উদ্দেশ্য, ব্যায়াম চর্চার মাধ্যমে যুবকদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করা। সামরিক কায়দায় বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার জন্য তিনি 'হাওড়া ভলান্টিয়ার্স' নামে একটি অসামরিক ব্যান্ড পার্টিও তৈরি করেছিলেন।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে হাওড়া জেলায় একই সঙ্গে বিপ্লবাত্মক ও অহিংসা আন্দোলন পাশাপাশি সমান তালে চলেছে।

১৯২৭ সালে সারা ভারতে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় তাতে হাওড়া জেলাও পেছিয়ে ছিল না। হরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পথে পথে 'কালো পতাকা' নিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা শোভাযাত্রা করেছিল। এর পরের ঘটনাটি আরও উল্লেখযোগ্য। ১৯২৮ সাল। কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে। সভাপতি (তখন অবশ্য বলা হত রাষ্ট্রপতি) হয়ে আসছেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস সভাপতিকে রাষ্ট্রীয় সভাপতির মর্যাদায় শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হবে পার্কসার্কাস ময়দানে। তারজন্য বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বাধিনায়ক হয়েছেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। হাওড়া জেলার

হাজার হাজার যুবক সেদিনের ঐ শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে এবং শৃঙ্খলাবোধের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ব্রিটিশ শাসকদের সম্ভ্রম কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। পরদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকের তদানীন্তন মুখপত্র The Statesman পত্রিকাও সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। সেদিনের এই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সাজাবার দায়িত্ব পেয়েছিলেন হাওড়া জেলার 'উনসানি গ্রামে'র কংগ্রেস কর্মী নারায়ণ দাস দে।[৫]
এই ১৯২৮ সালের ২৮শে মার্চ হাওড়ার বামুনগাছি রেলের ওয়ার্কশপে পুলিশের গুলি চালানায় তিনজন শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিরাট উত্তেজনা। তার জন্য রেল শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট অশান্তি ছড়িয়ে পড়লো অণ্ডাল, আসানসোল ও অন্যান্য বড় রেল স্টেশনে। বিভাগীয় তদন্তে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষই দোষী সাব্যস্ত হল।

১৯২৯ সালে লাহোর-কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। এই অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করল। দিকে দিকে নতুন করে আবার আন্দোলনের ঢেউ উঠলো। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হল ডাণ্ডি অভিযানের মাধ্যমে। সঙ্গে রইল বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও মদের দোকানের সামনে পিকেটিং। হাওড়া জেলার কংগ্রেস কর্মীরাও বসে রইলেন না।
হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার শিবগঞ্জে নদীর মোহনায় লবণ তৈরি করে ইংরেজের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কংগ্রেস কর্মীরা। হাওড়া শহর থেকে তিনটি দল তিনদিন ধরে যাত্রা করলো শিবগঞ্জ অভিমুখে। 'প্রথম দলটি ৪ঠা এপ্রিল পদব্রজে যাত্রা করল অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। এই দলে ছিলেন সাতাশ জন সত্যাগ্রহী। পরের দিন ৫ই এপ্রিল দ্বিতীয় দলটি পদব্রজে যাত্রা করল তদানীন্তন পৌর কমিশনার বিজয়কৃষ্ণ হাজরার নেতৃত্বে। এ দলে ছিলেন সাঁইত্রিশজন সত্যাগ্রহী। সর্বশেষ দলটি পদব্রজে যাত্রা করল কানাইলাল ঘোষের নায়কত্বে।[৬] এই অভিযাত্রীরা বিভিন্ন গ্রামের মধ্য দিয়ে যখনই অগ্রসর হতেন তখনই গ্রামবাসীরা এসে মালা, চন্দন ও শঙ্খধ্বনি করে তাঁদের যাত্রার সাফল্য কামনা করতেন। যতই অভিযাত্রীরা এগুতে থাকতেন ততই শোভাযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যেত। শিবগঞ্জ, নুণ্টিয়ার হাট, বাক্সীর হাট, শশাটি, কমলপুর, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানে শত শত সত্যাগ্রহী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। খুলনার বিশিষ্ট সত্যাগ্রহী ছিলেন উমাশংকর রায় ও দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।
শিবগঞ্জের নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে সত্যাগ্রহীরা নুন তৈরি শুরু করলে গ্রামের লোকের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। ঐ নুন আবার গ্রামবাসীর মধ্যে বিক্রী ক'রে গান্ধীজীর আইন অমান্যের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পুলিশ

অবশ্য নুন তৈরির কাজে বাধা দেয়নি। সত্যাগ্রহীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কিরকম সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় মুগ কল্যাণের 'পল্লীভারতী গ্রন্থাগারের' শতবর্ষ স্মরণিকা পাঠে। 'স্মরণিকাটি' লিখছে—'হাওড়ার জননেতা অধ্যাপক (শেষ জীবনে অধ্যক্ষ হন) বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যেসব সত্যাগ্রহী পদব্রজে শিবগঞ্জ গিয়েছিলেন লবণ সত্যাগ্রহ করতে, গ্রামবাসী তাঁদের সেদিন পল্লীভারতী ভবনে বিপুল সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে এক বিশাল জনসমাবেশ হয় ও স্থানীয় এলাকায় বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।[৭]

এরপর শুরু হল বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও মদের দোকানে পিকেটিং। কর্মীদের ট্রেনিং দেবার জন্য শহরে ও গ্রামে শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হল। বালি, বেলুড়, শালকিয়া, হাওড়া ময়দান হয়ে আমতলা প্রভৃতি স্থানে মদের দোকানে পিকেটিং শুরু হল। গ্রামে বাগনান, উলুবেড়িয়া, বাকসী, বাঙ্গালপুর, আমতা, মাজু, বড়গাছিয়া, ডোমজুড় প্রভৃতি স্থানে গাঁজা ও মদের দোকানে পিকেটিং চলতে থাকে।

১৯৩০ সালের ২৩শে এপ্রিল মঙ্গলবার হাওড়া হাটে বিদেশী বস্ত্র বিক্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ লাঠি চালিয়ে সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে দলের নায়ক অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে গেপ্তার করে এবং বাকিরা লাঠির আঘাতে আহত হন। এঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁরা খ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বা আছেন বিপিনবিহারী বসু, কার্তিক চন্দ্র দত্ত (চেয়ারম্যান), বৃন্দাবন বসু, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, শান্তি দাশগুপ্ত (অধ্যক্ষ) ও মনোমোহন রায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এর প্রতিবাদে হাওড়া পৌরসভার তদানীন্তন চেয়ারম্যান বরদা প্রসন্ন পাইন, কংগ্রেস নেতা প্রবোধচন্দ্র বসু ও ভোলানাথ রায়ের নেতৃত্বে হাওড়া কোর্ট ও জেল চত্বরে বড় প্রতিবাদ মিছিলও বার করা হয়।

এদিকে ১৯৩০ সালের মে মাসে গান্ধীজীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই সংবাদে সারা ভারতে হরতাল আহ্বান করা হয়। হাওড়া জেলা তাতে অংশ গ্রহণ করে তদানীন্তন মার্টিন রেল বন্ধ করে দেয় সত্যাগ্রহীরা। ফলে পুলিশের ব্যাপক সন্ধান ও ধরপাকড় শুরু হয়। ধরা পড়লেন স্বয়ং হরেন্দ্রনাথ ঘোষ। শাস্তি হল পনের মাসের জন্য কারাদণ্ড। পুলিশ বেলিলিয়াস পার্কের ট্রেনিং ক্যাম্পে হানা দিয়ে নেতা সুধাংশু চ্যাটার্জী সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। সাঁত্রাগাছি ও শংকর মঠের ক্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক মন্মথনাথ দাস সহ হরিপদ রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রফুল্ল চৌধুরী ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।[৮]

গ্রামাঞ্চলেও পিকেটিং সমান তালে চলতে থাকে। আমতায় মদের দোকানে পিকেটিং হয়। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন বুদ্ধদেব মুখাজী, সমর মুখাজী (প্রাক্তন সাংসদ), শংকর চ্যাটার্জী প্রমুখ। এই আন্দোলনে জয়পুরের মুরারী

মোহন, অনাথ কুমার মণ্ডল, সিয়াগোড়ীর কানাইলাল রায়, আমতার নবীন কুমার চক্রবর্তী ও সারদার শরৎ চন্দ্র ওঝা এবং খালনার ঋষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও যোগ দেন। উলুবেড়িয়ায় মদের দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হন স্থানীয় কোর্টের ব্যবহারজীবী সন্তোষ কুমার ঘোষাল, সুনীল ঘোষাল, সরোজ বসু, ভূপেন হাজরা ও অরবিন্দ গায়েন প্রমুখ সত্যাগ্রহীরা। এই অঞ্চলের আর এক উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন খ্যাতনামা জননেতা নানু ঘোষ। নানু বাবু একবার আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেলে ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার জন্য সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

বাইনানে পিকেটিং হয় বিভূতি ঘোষের নেতৃত্বে। এই বিভূতিবাবু পরিচালিত ক্যাম্পেই বাগনানের স্বেচ্ছাসেবকরা ট্রেনিং নিত। পরে তিনি কমিউনিস্ট দলে যোগ দেন। শ্যামপুরে পিকেটিং চলে মধু বেরার নেতৃত্বে। বাকসির হাটে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস নেতা বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। গড়ভবানীপুরের অর্ধেন্দুশেখর চৌধুরী (ইন্দ্র) ও কৃষক নেতা নিতাই মণ্ডল ও তারাপদ মজুমদার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কেবল পিকেটিং করেই হাওড়াবাসী আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি—অনেকে সরকারী স্বায়ত্তশাসনশীল সংস্থা থেকে পদত্যাগ করে ইংরেজ বিতাড়নে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমনকি অনেক গ্রামে 'নো ট্যাক্স' আন্দোলনেরও শামিল হয়েছিল—যেমন মাজু, শ্যামপুর প্রভৃতি অঞ্চল। পাঠকের কাছে আশ্চর্য লাগবে যে শহরে ও গ্রামে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে এতক্ষণ যাবৎ কোন মুসলমান নেতার নাম পাওয়া গেল না। বস্তুতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন সাধারণতঃ কংগ্রেসের আন্দোলনে তেমন আসতো না। কিন্তু জুজারসার এক সাধারণ দর্জি শেখ আব্দুল মুজিদ জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে এই আন্দোলনে যোগ দেন। দারিদ্র্য ও ধর্মের গোঁড়ামি তাঁকে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

গান্ধীজীর লবণ আইন সত্যাগ্রহের জোয়ারে সারা দেশই তখন উত্তাল। সেই ঢেউ সেদিন শালকিয়া এ. এস. স্কুলের ক্লাস ঘরেও এসে লেগেছিল। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নীলরতন বসু ক্লাসে তখন Ivanhoe পড়াচ্ছেন। হঠাৎ কয়েকটি ছেলে স্কুলে ঢুকে গা ঢাকা দিয়েছে। গোলাবাড়ীর বাঘা দারোগা বৃন্দাবন দত্তও স্কুলের ভেতর ঢুকে পড়েন। নীলরতনবাবুর পড়া থেমে গেছে। ছাত্ররা প্রমাদ গুণছে—এই বুঝি একটা অঘটন ঘটে! প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বৃন্দাবনবাবুকে বলেছিলেন —'বিদ্যালয় ছুটি হ'লে রাস্তা থেকে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবেন'। বৃন্দাবন-বাবুকে সেদিন কাউকে না ধ'রেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়েছিল। এই সুরেনবাবু সম্পর্কে প্রাচীনরা প্রশংসায় আজও পঞ্চমুখ। কিন্তু তিনি যে একজন সক্রিয় বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন তা অনেকেরই কাছে অবিদিত। শালকিয়া এ. এস. স্কুলের শতবার্ষিকী স্মরণীতে (১৯৫৫) সম্পাদক মশায়

পাদটীকায় লিখছেন—'স্বদেশী যুগে 'অনুশীলন দলে'র কার্যে তিনি (সুরেন্দ্রনাথ) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

১৯৩১ এবং ৩২ সালে বিলেতে রাউণ্ড টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় দেশে আবার আন্দোলন শুরু হ'ল। এবারও শালকিয়ার স্বদেশীকর্মীরা বসে রইলেন না। এবার আন্দোলনের পুরোভাগে রইলেন অনুকূলচন্দ্র শেঠ ও ইন্দুভূষণ মুখার্জী। সঙ্গে ছিলেন শংকরলাল মুখার্জী, নন্দলাল মোহন্ত, ব্রজলাল মোহন্ত, সুধীর মাইতি, পূর্ণচন্দ্র মিত্র ও হরিসাধন মুখার্জী প্রমুখ কর্মীরা। বামুনগাছি থেকে যোগ দিলেন সুধাংশু শেখর মুখার্জী, কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারী, কানাইলাল ঘোষ, সিন্ধুমণি কুমার, কালীকৃষ্ণ দাস, নিতাইচন্দ্র বেলেল, গোবিন্দলাল দেঁরেল, রামপদ বেরা, রামপদ ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ সত্যাগ্রহীরা। অনুকূলবাবু, ইন্দুবাবু ও শংকরবাবু পরবর্তী কালে হাওড়া পৌরসভার কমিশনারও হন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শালিখার ইতিহাস আরও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে মহিলা সত্যাগ্রহীদের অংশ গ্রহণে। বাঁধাঘাটে বিলেতী বস্ত্র বহ্ন্যুৎসব ক'রতে গিয়ে সুকুমারী দেবী (ইন্দুবাবুর বোন) ও কুমোদিনী দাসী (কালীকৃষ্ণবাবুর ঠাকুমা) পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীতা হ'য়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

অনুরূপভাবে হাওড়াতেও মহিলা সত্যাগ্রহী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। তাতে বিশেষ উল্লেখ্য মহিলা সত্যাগ্রহী ছিলেন শিবপুরের সুষমা মুখোপাধ্যায় ও সুরমা মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সুশীলকুমার মুখার্জীর ভগিনীদ্বয়। তাঁরা ১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। সুষমাদেবী তদানীন্তন কালে বীণা দাস, শান্তি দাস ও কল্যাণী দাসের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের সংগঠিত করেন। '১৯৩০ সালে দমদম বেঙ্গল ফ্লাইং (বে-সামরিক) ক্লাবের প্রথম মহিলা সভ্যা হিসেবে তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা বৈমানিক ছিলেন।[৯]' তিনি ১৯৮৪ সালে জানুয়ারী মাসে ৭৪ বছর বয়সে মারা যান। পুলিন ব্যানার্জীর সহধর্মিণী করুণাময়ী দেবীর কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি স্বামীর পাশে এসে আবার ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগ দেন।

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অবমাননাকর ব্যবহারের প্রতিবাদে জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমৃত্যু অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেন। অনশন চলাকালে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য তাঁকেও সাত দিনের জন্য জেলে থাকতে হয়। বহরমপুর জেল থেকে ষোলদিন অনশন করার পর হরেন্দ্রনাথকে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেখানেও চলে তাঁর অনশন। ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধী-আরউইন (বড়লাট) চুক্তি হয়। ফলে সত্যাগ্রহীদের অনেকেই মুক্তি পেতে থাকে—যার মধ্যে হরেন্দ্রনাথও ছিলেন। বহরমপুর জেলে ষোল দিন ও দমদম জেলে এক মাস মোট

ছেচল্লিশ দিন অনশনের পর মৃতপ্রায় অবস্থায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন। সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশী গুলিতে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন। তাঁদের মৃতদেহ হাওড়া টাউন হলে আনা হলে এক শোক সভায় শ্রদ্ধা জানান হয়।

১৯৩১-৩২ সালে বিলেতে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় গান্ধীজী আবার গ্রেপ্তার হলেন। প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে অনেকেই পরপর গ্রেপ্তার হলেন। সুতরাং এবার আন্দোলনকারীদের ধরে হিজলী জেলে পাঠানো হল। ১৯৩৩ সালে গান্ধীজীকে ইংরেজ সরকার মুক্তি দিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে গেল।

এর পরের ইতিহাস অনেকের জানা আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেলা কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। একটানা ১৯২৬-৩৫ সাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। এবার সভাপতি হলেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং জেলা সম্পাদক হলেন সুশীল মুখোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে হাওড়া জেলার ছাত্র আন্দোলনের গোড়ার ইতিহাসের কয়েকটি কথা বলে রাখি। কারণ ছাত্ররাই হচ্ছে যে কোন দেশের আন্দোলনের প্রাণবায়ু। হাওড়া জেলার ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনকেও সেই যুগে একইভাবে গতিশীল করে তুলেছিল। হাওড়া জেলা কংগ্রেস সে যুগেও দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। একটি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী-অপরটি ছিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের। ফলে এই জেলাতেও দুটি ছাত্র সংগঠন তৈরি হল। সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল Bengal Provincial Students Association সংক্ষেপে বলা হত B. P. S. A. অপরদিকে সেনগুপ্ত পন্থী সংগঠনটির নাম ছিল All Bengal Students Association সংক্ষেপে বলা হত A. B. S. A. সেনগুপ্ত পন্থী ছাত্রদলের তদানীন্তন ছাত্র নেতা ছিলেন কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে লোকসভার সদস্যও হয়েছিলেন)। কৃষ্ণকুমারের প্রচেষ্টায়ই ১৯২৯ সালে হাওড়া জেলায় প্রথম ছাত্র সম্মেলন হয়। রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী), মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (সকলেই বালির) এবং রামকৃষ্ণপুরের রবীন্দ্র লাল সিংহ (পরে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী হন) এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন।[১০] উদ্বোধন করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্বয়ং। অপর পক্ষে ১৯৩৮ সালে হাওড়া টাউন হলে শরৎ বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল বি. পি. এস. এ-র ছাত্র সম্মেলন। উদ্বোধন করেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। এই সম্মেলনে ছাত্র সংগঠনটির নতুন নামকরণ হল 'হাওড়া জেলা ছাত্র ফেডারেশন'। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন তদানীন্তন সুভাষ পন্থী কংগ্রেস নেতা সমর মুখার্জী (বর্তমান সি. পি. আই. এম. নেতা) এবং সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন মধ্য হাওড়ার বিনয় রায় (কাউন্সিলার)। ছাত্র আন্দোলনের দ্বারা এঁরাও মুক্তি আন্দোলনে

দেশমাতৃকার সেবা করেছেন। কৃষ্ণকুমারের প্রধান দুই সহযোগী ছিলেন সুজন সরকার ও সুহৃদ বিশ্বাস। পরে অবশ্য সকলেই সুভাষ পন্থী হন।[১১]

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর থেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মত-বিরোধ প্রকাশ্যে এল। যদিও নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র জয়ী হলেন পট্টভী সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে কিন্তু কার্যত সেটা ছিল মহাত্মাজীরই পরাজয়। এরপরই সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দল গঠনে হাওড়ার কংগ্রেস কর্মীদের অবদান ছিল সমধিক। এর অন্যতম কারণ ছিল হাওড়া কংগ্রেসের তদানীন্তন কর্ণধার ছিলেন হরেন্দ্র নাথ ঘোষ। তিনি ছিলেন সুভাষপন্থী। ফলে হরেন্দ্র নাথ স্বয়ং নিতাই মণ্ডল, নানু ঘোষ, তারাপদ মজুমদার, সুজন সরকার, সুহৃদ বিশ্বাস, ইন্দুভূষণ মুখার্জী প্রমুখ আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লক গড়ে তুললেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলে জাতীয় আন্দোলনে হাওড়ার অবদানের ইতিহাস ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে বলে মনে হয়। সেটি হচ্ছে কলকাতার ডালহৌসীর বুক থেকে 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' স্মৃতি স্তম্ভের অপসারণ। ১৯৪০ সালে এই আন্দোলনে তদানীন্তন জাতীয় নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রকে তেমন সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেননি। সেদিনের সংগ্রামে হাওড়ার শত শত যুবককে সমবেত করে হরেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করেন। গ্রেপ্তার হলেন হরেন্দ্রনাথও। অবশেষে সংগ্রামে জয়ী হলেন সুভাষচন্দ্র। তাই তিনি প্রায়ই বলতেন—'হাওড়া আমার দুর্গ।'

অপরদিকে বীরেন ব্যানার্জী, গণেশ মিত্র, বিভূতি মুখার্জী ও জীবন মাইতি, প্রমুখ ব্যক্তিগণ গান্ধীজীর মতবাদ ত্যাগ করে মার্কসীয় মতবাদে অনুপ্রাণিত হলেন বকসার ও দেওলী বন্দী শিবিরে। বীরেন ব্যানার্জী, অরুণ চ্যাটার্জী, কমল বড়াল ও নিরঞ্জন চ্যাটার্জী প্রভৃতির চেষ্টায় হাওড়ায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠল। প্রথম সম্পাদক হন বিভূতি মুখার্জী। তারপরই সম্পাদক হন সমর মুখার্জী (প্রাক্তন সাংসদ)।*

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—সম্পাদনা প্রফুল্ল পালগুপ্ত।
২. শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ১৯২৬—৩০ পর্যন্ত।
৩. ১৯৩০ সালে বালি সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক নলিন চন্দ্রের প্রথম স্মৃতি সভায় প্রচারিত জীবনী।
৪. বালি সাধারণী সভা—শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।
৫. স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের জেলা—দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী।
৬. বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ—অমিয় ঘোষ—সম্পাদনা—ডঃ শিশির কর।
৭. শতবর্ষ স্মরণিকা—পল্লীভারতী—যুগকল্যাণ।
৮. বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ—অমিয় ঘোষ—সম্পাদনা—ডঃ শিশির কর।
৯. দৈনিক বসুমতী ১৩ই জানুয়ারী—১৯৮৪।
১০. বালি সাধারণী সভা—শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।
১১. বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ—অমিয় ঘোষ—সম্পাদনা ডঃ শিশির কর।

* সমরবাবু একদা উলুবেড়িয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া পর্যন্ত জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।

কৃষক আন্দোলনে—হাওড়া

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি (তখনকার দিনে রাষ্ট্রপতি বলা হত) নির্বাচনে গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভী সীতারামিয়াকে পরাজিত করেন। ফলে গান্ধীজীর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় সুভাষচন্দ্রকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হয়। সুভাষচন্দ্র ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের জন্য 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীই তখন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দেন। এ ব্যাপারে হাওড়ার তদানীন্তন জননায়ক ও জেলা কংগ্রেস সভাপতি হরেন্দ্রনাথের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়। হরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই হাওড়ার গ্রামে গঞ্জে এমনকি উলুবেড়িয়া শিল্পাঞ্চলেও কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনে তাঁদের একাত্ম করার জন্য তিনি জোর সংগঠন করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এই কাজে যাঁরা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন নিতাই মণ্ডল, নানু ঘোষ, তারাপদ মজুমদার, সত্যচরণ দাস (মেদিনীপুরের), সুজন সরকার, ইন্দু চৌধুরী, মনোমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

হরেন্দ্রনাথ গ্রামের কৃষকদের নিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ভার দিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী ও গ্রামেরই ছেলে নিতাই মণ্ডলের উপর। ১৯৩৮ সাল থেকেই নিতাই মণ্ডলের নেতৃত্বে হাওড়ায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়।[১]

হাওড়া জেলার আমতা, শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপুর ও বাগনানের বিভিন্ন গ্রামে ঐ সময়ে 'কুৎ' প্রথা, 'বাবুদী' প্রথা নামে নানা কু-প্রথা চাষের ব্যাপারে চালু ছিল। 'কুৎ' প্রথা অনুযায়ী জমিদার ধান কাটা হলেই লোক পাঠিয়ে চাষীর কাছে অর্ধেক হিস্যা দাবি করতেন। চাষী দিতে না পারলে সুদ সহ ঐ বকেয়া ধানের মূল্য নির্ধারিত করে দেনা বলে সই করে দিতে বাধ্য করতেন। পড়ে সুবিধা মতো সময়ে আদালতে মামলা করে সুদে আসলে এক তরফা আদালত থেকে ডিগ্রী জারি করে চাষীর সম্পত্তি নিলাম করতেন। এহেন অত্যাচার থেকে চাষীকে বাঁচাবার জন্য নিতাই মণ্ডল ও তারাপদ মজুমদার আন্দোলন শুরু করেন। এক-দিকে পুলিশ ও অপরদিকে জমিদারের লাঠিয়ালের বিরুদ্ধে নামলেন তাঁরা। আমতা অঞ্চলে এই রকম সংঘবদ্ধ আন্দোলন করে তাঁরা চাষীদের ঘরে ফসল তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। একবার জমিদারের লাঠিয়ালরা কায়দায় পেয়ে নিতাই মণ্ডল ও তারাপদ মজুমদারকে মাটির মধ্যে গলা পর্যন্ত পুঁতে রেখেছিল। পরে অবশ্য চাষীরা এসে সংঘবদ্ধভাবে তাঁদেরকে বাঁচায়।[২] নিতাইবাবুর নামে গড়ভবানীপুরে 'নিতাই মণ্ডল সরণী' নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

এই সময় হাওড়ার গ্রামে কৃষক আন্দোলন নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা দেখা দিল। অনেক সময়ে তা সংঘর্ষেও পরিণত হয়।

হাওড়ায় কমিউনিস্ট প্রথায় কৃষক আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন মদন দাস। প্রথম জীবনে কংগ্রেস কর্মী হিসেবে ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন করে কলকাতার চেতলায় কারাবরণ করেন। কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে চাকুরী না নিয়ে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। হিজলী জেলে ছ'মাস থাকার পর মুক্তি লাভ করেন। জেলেতেই তিনি মার্কসবাদের শিক্ষা লাভ করে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। মেটিয়াবুরুজ থেকে গঙ্গার এপারে এসে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে আন্দোলন করতে শুরু করেন হাওড়া রাজগঞ্জের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে। তারপর তিনি হাওড়া গ্রামের জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে লাগলেন। ১৯৩৯ সালে হাওড়ার জুজারসাহে যে হাওড়া জেলা প্রথম কৃষক সম্মেলন হয়েছিল তার প্রথম সম্পাদকও ছিলেন মদনবাবু। গ্রামীণ জমিদারদের হাত থেকে কৃষক সমাজকে শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে সংঘবদ্ধ করার জন্য মদন দাস বেতাই-জয়ন্তী, বড় মহরা, কুরিট, বলরামপুর, চাকপোতা, কোটালপাড়া প্রভৃতি গ্রামে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হলে তার ঢেউ হাওড়া জেলাতেও আছড়ে পড়ে। মদন দাস ও শ্যামা প্রসন্ন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলনে হাঁটালে ও মাশিল্যায় (জগৎবল্লভপুর) পুলিশের গুলিতে কৃষক-রমণী সমেত মোট এগারজন মৃত্যু বরণ করে। এর মধ্যে হাঁটালে ছজনই কৃষক রমণী। আর মাশিল্যায় দুজন মহিলাসহ মোট পাঁচজন। পানপুর গ্রামেও দুজন কৃষক পুলিশের গুলিতে মারা যায়। এইভাবে আন্দোলন চলতে থাকে।

এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হয়। মদন দাস আত্মগোপন করে গ্রামে গ্রামে চাষীদের মধ্যে মিশে গিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫০ সালে সরকারের এক বিরাট পুলিশ বাহিনী দামোদর পার হয়ে মদন দাসের খোঁজে যায়। অপর পার থেকে মদন দাসের সশস্ত্র দল বোমা ও রাইফেলের আওয়াজ করে পুলিশ বাহিনীকে খড় বন থেকেই রুখে দিল।[৩] তেভাগা আন্দোলনের ফলে সরকার ভাগচাষী সালিশী বোর্ড গঠন করেন। কিন্তু আইনের সাহায্য দরিদ্র চাষীদের কে দেবে ? তারও ব্যবস্থায় মদন দাস এগিয়ে এলেন। মদন বাবু আইনের ছাত্র না হলেও কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে কৃষি আইনগুলি ভালভাবে পড়াশুনা করে তিনি নিজেই হাওড়া ও উলুবেড়িয়া কোর্টে চাষীদের মামলা কেস লড়তেন। প্রবীণ কৃষক নেতা আবদুল্লা রসুল মদন দাস সম্পর্কে বলেন—'কৃষক ও কৃষি সংক্রান্ত যত আইনের বই হত তা সবার আগে তিনি সংগ্রহ করতেন ও পড়তেন। আমাদের কোন কোন সময় কিছু জানতে হলে তাঁর কাছ হতে জানতাম এবং তিনি তা সহজে বলে দিতে পারতেন।'

হাওড়ার উত্তর ও মধ্যভাগে যেমন মদন দাসের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন চলছিল, তেমনি বাগনান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে কৃষকরা সংগঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট কৃষক নেতা জ্ঞানব্রত চক্রবর্তী ও তাঁর সুযোগ্য অনুজ সহকর্মী অমল গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে। ১৯৫১ বা ৫২ সাল হবে। হাওড়া জেলা কমিউনিস্ট পার্টি স্থির করে যে বাগনানে এক কৃষক সম্মেলন হবে। এই সম্মেলনের প্রধান নায়ক ছিলেন এই জ্ঞানবাবু ও অমল গাঙ্গুলী। বাগনানের এক মাঠে সম্মেলন হল। সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। সম্মেলনের দুদিন বা একদিন আগে সকাল বেলা এক চায়ের দোকানে প্রাতঃরাশ সারতে সারতে জ্ঞানবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। সারা বাগনানে শোকের ছায়া নেমে এল। সে সময় জ্ঞানবাবুদের আত্মগোপন করে কাজ করতে হত। তাই বেশির ভাগ সময় তাঁকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস করতে হত। যা হউক সম্মেলন হল—প্রকাশ্য সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি পাশ্ববর্তী জেলা থেকেও প্রচুর সংখ্যায় কৃষকরা এসে হাজির হল। নেতৃবৃন্দ আশাতীত রকমে সাড়া পাওয়ায় অত্যন্ত উৎফুল্ল। অমল গাঙ্গুলীর কথায়—'সেদিন একদিকে যেমন জ্ঞানদার মত ত্যাগী ও আদর্শবান নেতার বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত তেমনি তাঁরই চেষ্টায় অভাবনীয় জনসমাবেশে আমরা উজ্জীবিত হয়ে উঠি। আমাদের প্রত্যাশা ছিল হয়তো দশ থেকে পনেরো হাজার লোক হবে—কিন্তু দাঁড়ালো প্রায় ষাট থেকে সত্তর হাজার।' জ্ঞানবাবু সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে করতে অমলবাবুর চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। তাঁর মত শৃঙ্খলাবোধ, অনাড়ম্বর জীবন ও নিঃস্বার্থ নেতা আজ বড়ই দুর্লভ। তাঁরই সান্নিধ্যে এসে তিনি বেশি করে মার্কসীয় মতবাদে আসক্ত হয়ে পড়েন। দায়িত্বশীল কর্মী থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই অমলবাবু নেতৃপদে আসীন হন। অকৃতদার ও আদর্শবান নেতা হিসেবে ১৯৫৭ সালে বিধানসভার সদস্য হিসেবেও বাগনান কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। কিন্তু আদর্শের দ্বন্দ্বে তিনিও দোলায়িত হতে থাকেন। কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দলের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে একটি কঠিন ও ঘৃণ্য কাজের নায়ক হতে হয়েছিল। সেটি হচ্ছে তাঁরই বড়দাদা বিমলবাবুকে হত্যা করা। তিনি তখনকার দিনে বাগনানের একজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস নেতা ছিলেন। পেশায় ছিলেন হোমিও চিকিৎসক। অমল গাঙ্গুলী হত্যার দায়ে অন্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে সবাই মুক্তি পান। অমলবাবুর কথায় জানা যায় যে বিমলবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ বৌদিও বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেন যে তাঁর দেওর ঐ ঘৃণ্য কাজ করতে পারেন না। কিন্তু আজ অমলবাবু জীবন সায়াহ্নে এসে এমন ঘৃণ্য কাজে নায়ক হওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে বিবেকের দংশনে ভুগছেন। পরে অবশ্য তিনি আদর্শগত বিরোধেই দলত্যাগ করেন। এরপর তিনি গ্রামোন্নয়ন তথা গ্রাম্য সংস্কৃতি রক্ষার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অমর সৃষ্টি বাগনানের কাছে 'আনন্দ নিকেতন।' আনন্দ নিকেতনের বড় বৈশিষ্ট্য হল সেখানে একটি গ্রামীণ সংগ্রহশালা (যাদুঘর) করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার গ্রামেতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের

নমুনাসহ লোক-শিল্প ও সংস্কৃতির এমন সুন্দর রক্ষণশালা বিরল। এটি অমলবাবুকে হাওড়ার ইতিহাস রচনায় বাঁচিয়ে রাখবে। তবে তাঁর এই কাজে যিনি দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তিনি হচ্ছেন ইতিহাস গবেষক ও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক তারাপদ সাঁতরা।

আবার মদন দাস প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। মদনবাবুর সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের সহযোগী সমর মুখার্জী (প্রাক্তন সাংসদ), কার্তিক সেনাপতি, গুণধর মাঝি, আদিত্য মুখার্জী, জলধর হাজরা, শরৎ চন্দ্র ওঝা প্রমুখ ব্যক্তিরা আজও কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে মদনবাবুর স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কার্তিক সেনাপতিই ১৯৩৫ সালে নিজ গৃহ থেকে ২২ ভরি সোনার গহনা নিয়ে বিপ্লবীদলের তহবিলে জমা দেন।[৪] আজ হাওড়া আমতা রোডের নাম 'মদন দাস সরণীতে' পরিণত হয়েছে। 'মদনদা স্মরণে' স্বাধীনতা সংগ্রামী দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী লিখিত প্রবন্ধের শেষাংশ দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করা যাক। তিনি লিখছেন—'বিধানসভা নির্বাচনে জয়কেশদার (মুখার্জী) ফরম্ পূরণ করার প্রয়োজনে হাওড়ার ১১ নং ধর্মতলা লেনের জেলা পার্টি অফিসে গেছি। মদনদা শুনিয়ে দিচ্ছেন। তার আগে থেকেই হাই-প্রেসার প্রভৃতি রোগে তিনি ভুগছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছেন? সখেদে বললেন—আর ভাই, দেশটা সোভিয়েট হওয়া দেখে যেতে পারলাম না।'[৫] ১৯৭২ সালে তিনি মারা যান। সোভিয়েট তথা কমিউনিস্ট দুনিয়ার আজ যে কি হাল হয়েছে তা মদন দাস দেখতে পেলে হয়তো তাঁর দুঃখের আর সীমা থাকতো না।

---

১. বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ—অমিয় ঘোষ—সম্পাদনা ডঃ শিশির কর।
২. ঐ
৩. স্মারকগ্রন্থ—কমরেড মদন দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি।
৪. স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ—সম্পাদক প্রফুল্ল দাশগুপ্ত।
৫. স্মারক গ্রন্থ—কমরেড মদন দাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি।

হাওড়ায় ব্যায়ামচর্চা

আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বলা হয়েছে—শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। অর্থাৎ সুস্থ শরীর ছাড়া ধর্ম সাধন হয় না। স্বামী বিবেকানন্দও বলতেন—গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলাও ভাল। একথা বলারও একই উদ্দেশ্য—তা হচ্ছে এই যে অসুস্থ শরীরে সাধন-ভজন করা সম্ভব নয়। তাই চাই সুস্বাস্থ্য। হাওড়া জেলায় পুরানো দিনে অনেক নাম করা ব্যায়ামাগার তৈরি হয়েছিল। তবে সে সব ব্যায়ামাগারগুলির বেশির ভাগই তৈরি হয়েছিল বিপ্লবী কাজকর্মের আখড়া হিসেবে—না হয় জাতীয় আন্দোলনে যুবশক্তিকে দীক্ষিত করার কেন্দ্র হিসেবে। সে সব ব্যায়ামাগারের সব কটি আজ আর নেই। কিন্তু সেগুলোতে তৈরি ছেলেদের সেবায় দেশমাতা আজ শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারছেন। সেই গৌরবের ইতিহাসও স্মর্তব্য।

হাওড়া জেলার কুস্তিতে বেশ নাম ছিল। কুস্তিতে এই জেলার খ্যাতি এক সময়ে সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ব্যাপারে বালি গ্রামের খ্যাতির কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদও তদানীন্তন সংবাদপত্রে প্রকাশ হত। ১৮৩৬ খ্রীঃ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—"বালির জনৈক কুস্তিগীর মহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহাবল ও পরাক্রম বর্ণনা করে তাঁহাকে কুস্তি শিক্ষাদান কার্যে নিয়োগ করিবার অথবা যাঁহারা কুস্তিগীর দ্বারপাল নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদের পরীক্ষা লইতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক বালীর দক্ষিণ পল্লীস্থ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী অথবা শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট লিপি প্রেরণ করিলে ঐ কুস্তিগীর মহাবল পরাক্রমকে তৎক্ষণাৎ তন্মাশয়ের সমীপস্থ করিব।" উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনটি যে একজন বালির বিখ্যাত কুস্তিগীরের শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

অপর এক ভারত বিখ্যাত কুস্তিগীরের নাম হল ভবেন্দ্র মোহন সাহা। এই নামে তাঁকে খুব কম লোকই চেনে—তিনি ব্যায়ামের ইতিহাসে 'ভীম ভবানী' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিশোর বয়স থেকেই তিনি কুস্তি শিখতে আরম্ভ করেন।

কুস্তি শেখার জন্য পিতা উপেন্দ্র মোহন ছেলেকে গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতার দর্জিপাড়ায় নিয়ে এসে ক্ষেত্র গুহের আখড়ায় ভর্তি করিয়ে দেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে কুস্তিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে গুরু রামমূর্তির সঙ্গে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে কুস্তিতে নানা বীরত্বপূর্ণ খেলা দেখান।[১] তারপর তিনি প্রফেসার কে. বসাকের 'হিপোড্রাম সার্কাসে' যোগ দিয়ে জাপানে খেলা দেখাতে যান। 'ভীম ভবানী' তাঁর বুকের উপর চল্লিশ মণ পাথর চাপিয়ে তার ওপর ২৫ জন মানুষকে চাপিয়ে দিতেন। শক্তির এই অদ্ভুত খেলা দেখে জাপানের

সম্রাট মিকাডো 'ভীম ভবানী'কে স্বর্ণ পদক ও নগদ ৭৫০ টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।[২] এই বিরল সম্মান ভারতীয় হিসেবে ভীম ভবানী পেলেও বঙ্গবাসী বিশেষ করে হাওড়াবাসীর গর্ব সর্বাধিক—কারণ ভীমভবানী জন্মেছিলেন হাওড়া জেলার পাতিহাল গ্রামে। চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। আরও একটি আনন্দের খবর এই যে, ভবেন্দ্রবাবুকে 'ভীম ভবানী' উপাধিও দেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। এই রসরাজ অমৃতলাল বসুও শালকিয়ায় বিবাহ করে এখানে কয়েক বছর বসবাস করেছিলেন। তাঁর শ্বশুরালয় ছিল বর্তমান কামিনী স্কুল লেনে। পশ্চিমা লোকেরা ভীম ভবানীকে আবার 'ভীমমূর্তি' বলে ডাকতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে শালকিয়া অঞ্চলেও কুস্তির খুব প্রচলন ছিল। শালিখার ভারতাদিত্য ব্যায়ামাগারের উষাপতি ব্যানার্জী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শালকিয়া স্বাস্থ্য সমিতির গোষ্ঠবিহারী সাধুখাঁ ১৯৩৬ সালে শিমলা ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক অল বেঙ্গল রেসলিং কমপিটিসনে হেভী ওয়েট বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হন। ঐ বছরেই আট স্টোন গ্রুপে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হন একই ক্লাবের সদস্য অপূর্ব সরকার। এই অপূর্ববাবুই আবার ১৯৩৮ সালে বিহার অলিম্পিক কুস্তিতে বিজয়ী ঘোষিত হন। একই বছরে বেঙ্গল রেসলিং চ্যাম্পিয়ানশিপ কুস্তি প্রতিযোগিতায় ন'স্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হলেন শালকিয়া স্বাস্থ্য সমিতির শচীন গাঙ্গুলী। তিনি ঐ বছরই আবার বিহার অলিম্পিকে বিজয়ী হন। শালকিয়া হাউসের জমিদার বাড়ির ছেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কুস্তিতে সে সময়ে বেশ নাম করেছিলেন। শালকিয়া অঞ্চলে অনেক নামী নামী পালোয়ানও কুস্তি শেখাতে আসতেন। যেমন বিশিষ্ট কুস্তিগীর গোপীকৃষ্ণন, পিলখানার খেদান খাঁ ও পাঞ্জাবের বিল্লা পালোয়ান ও লালু সিং। পাঞ্জাবের এই লালু সিং-ই বিভূতিভূষণের আর্থিক সাহায্যে কুস্তি শেখাতেন। অজিত ব্যানার্জী (বীরেন ব্যানার্জীর ভাই), শান্তি ব্যানার্জী এই জেলার নাম করা পালোয়ান ছিলেন। বালির মারুতি সংঘের নাম করা কুস্তিগীর ছিলেন কালীকৃষ্ণ রায় ও রমজান আলি।

নৌকো বাইচ—হাওড়া জেলার মধ্যে নৌকো বাইচ প্রথম চালু হয় সম্ভবত বালি গ্রামে ১৮৮৯ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই গঙ্গাবক্ষে বাইচ প্রতিযোগিতা চালু হয়। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিত বাগবাজার, বরাহনগর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া ও বালি প্রভৃতি স্থানের দলগুলি। উত্তরপাড়া থেকে প্রথম এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বলা বাহুল্য, এই বাইচ খেলায় বালির কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বহুদিন বহাল ছিল। বালির সেরা নৌকোর হালি হিসেবে নৃসিংহ মুখার্জীর নাম উল্লেখ্য। প্রথম যুগে ফ্রেন্ডস রোয়িং ক্লাব গড়ে ওঠে—পরে অবশ্য এর নাম পাল্টে রাধানাথ (বাইচ) রোয়িং ক্লাব হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বাইচ বন্ধ হয়ে যায়। আবার চালু হয় ১৩৫৮ সালে।

কপাডি খেলা—কপাডি অলিম্পিক আইটেম হিসেবে সিওল অলিম্পিকে (১৯৮৮) সর্বপ্রথম তালিকাভুক্ত হয়। শুধু তাই নয়—এই বিশ্বব্যাপী কপাডি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষই প্রথম সোনা লাভ করে। এই কপাডি খেলা বালিতে ১৯১৪ সালে বীরেশ্বর ব্যানার্জী বালি যুবক সমিতির উদ্যোগে প্রথম কপাডি শুরু করেন। পরে বালি ও চন্দননগরের যৌথ প্রচেষ্টায় নিয়মাবলী তৈরি হলে ১৯১৭-১৮ সালে বালিতে 'চন্দ্রশেখর কপাডি শিল্ড' প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে কপাডি খেলা ভারতীয় অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভুক্ত হয়। সর্ব ভারতীয় কপাডি প্রতিযোগিতায় একাধিকবার বাংলা দলের দলপতি ছিলেন বালির বিখ্যাত কপাডি খেলোয়াড় প্রভাত কুমার ব্যানার্জী। ওয়েষ্ট বেঙ্গল কপাডি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন বালির প্রভাতবাবু (ব্যানার্জী) ও নিরঞ্জন মুখার্জী। আজ বিশ্ব অলিম্পিকে এই খেলাটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও তাতে প্রথম সোনা পাওয়া হাওড়াবাসীর আনন্দ ও স্বীকৃতি স্মরণ করার মত। এই খবরটি আমাকে দেন বালির নিশিকান্ত চ্যাটার্জী। ভারত বিখ্যাত সটপাট ছুড়িয়ে সুব্রতা দেবনাথ এই বালির মেয়ে। আন্তর্জাতিক মানের আর এক এ্যাথলেট ছিলেন অমিয় মুখার্জী। তিনি এশিয়ান গেমসেও স্বল্পদূরের দৌড়ে যোগ দিয়েছিলেন।

সাঁতার—এই প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার কীর্তি বাংলাদেশ তথা ভারতের সীমানা ছাড়িয়েও বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে জেলার বাসিন্দা ও বিশিষ্ট সাঁতারু শচীন নাগের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তিনি ১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে সাঁতারে প্রথম সোনা জেতেন। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে তিনি ১২ বার জাতীয় চ্যাম্পীয়ান আখ্যা লাভ করেন।[৩] ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে যথাক্রমে লণ্ডন অলিম্পিক ও হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে তিনি ভারতের হয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। সবচেয়ে আনন্দের ও গৌরবের বিষয় যে শচীনবাবু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। ভারত সরকার ১৯৮২ সালে নবম এশিয়ান গেমসে একটি ভিলেজের নাম শচীনবাবুর নামে চিহ্নিত করে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন।[৪] এই শচীনবাবু বেনারসে জন্মালেও কলকাতায় আসেন তিরিশের দশকে। শেষ জীবনে হাওড়ার শিবপুরে বসবাস করে ১৯শে আগষ্ট ১৯৮৭ সালে এখানেই মারা যান।

বালি সুইমিং ক্লাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি প্রচুর কৃতী সাঁতারু তৈরি করে হাওড়া জেলার সুনাম বৃদ্ধি করেছে। মস্কো অলিম্পিকে (১৯৮০) এই ক্লাব থেকেই অভিজিৎ ঘোষ ভারতের হয়ে সাঁতারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের মহিলা সাঁতারু ঊর্মিলা ক্ষেত্রী এই ক্লাবেরই সভ্যা।

ফুটবলের রেফারীর কাজেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে হাওড়ার ফুটবল প্রেমীরা পেছিয়ে নেই। ১৯৭৪ সালে ফুটবলের ফিফা ইন্টারন্যাশানাল ফুটবল রেফারী পদে স্বীকৃতি পান এল. এন. ঘোষ। এ ছাড়া কালী রায় ১৯৫২ এবং পঙ্কজ দাসের

১৯৭৩ সালে ইংল্যাণ্ডের রেফারী এসোসিয়েশনের সভ্যপদে স্বীকৃতি পাওয়াও হাওড়াবাসীর গর্বের ব্যাপার।

আমাদের দেশে ওয়েট লিফটিং বা ভারোত্তোলনের প্রচলন করে ইংরেজরা। তবে এ ব্যাপারেও হাওড়া জেলা বঙ্গদেশে নিজ স্থান করে নিতে কসুর করে নি। হাওড়া জেলায় ভারোত্তোলনের জন্মদাতা হিসেবে রামকৃষ্ণপুরের বিখ্যাত ভারোত্তোলক অমর নাথ দত্তের নাম করলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। এই দত্ত পরিবারের একটি নিজস্ব জিমনাসিয়াম ছিল—তার নাম 'দত্ত জিমনাসিয়াম'। প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ১৯০০ সাল। আজও সেই ব্যায়ামাগারটি ঐ নামেই চলছে। তবে সেটি আজ পুরোপুরি মহিলা ব্যায়ামবিদ বিশেষ করে মহিলা ভারোত্তোলনকারিণী-দের একমাত্র ট্রেনিং সেণ্টার। হাওড়াবাসী জেনে খুশী হবেন যে ভারোত্তোলনে বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারিণী ছায়া আদক ও সুমিতা লাহা এই জিমনাসিয়ামেই অনুশীলন করে থাকেন। অমর নাথ দত্ত নিজেও সে যুগে একজন বেঙ্গল চ্যাম্পীয়ান ভারোত্তোলক ছিলেন। নামকরা আরও দুজন বিখ্যাত জিমনাস্টিক শিক্ষকের নাম এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—তাঁরা হচ্ছেন সাঁত্রাগাছি দাসের ব্যায়ামগারের প্রতিষ্ঠাতা কালিপদ দাস ও শিবপুর ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা দাশরথি ঘোষ। কিন্তু বাঙ্গালীর হয়ে ভারোত্তোলনে বিশ্বের দরবারে হাওড়ার (রামকৃষ্ণপুর) বিশ্বকল্যাণ সংঘ যে ইতিহাস রচনা করেছে তা অভাবনীয়। এই ক্লাবেরই আজীবন সভ্য লক্ষ্মীকান্ত দাস ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারোত্তোলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিযোগী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অলিম্পিকে এই বিভাগে তিনিই প্রথম যোগদানকারী বাঙ্গালী। প্রতিযোগিতায় তিনি ফেদার ওয়েটে একাদশ স্থান লাভ করেন। পরের বারেও টোকিও অলিম্পিকে (১৯৬৪ সাল) যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে লণ্ডনের কিংসস্টোন শহরে কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায়ও তিনি প্রতিযোগী ছিলেন। ভারোত্তোলনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'এলিট ব্যাজ'-ও লক্ষ্মীকান্তবাবু একমাত্র ভারতীয় হিসেবে পান। পশ্চিমবাংলার মধ্যে লক্ষ্মীকান্তবাবুই প্রথম ব্যায়ামবীর যিনি ভারত সরকারের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ 'অর্জুন' পুরস্কার* (১৯৬৩ সাল) পান। লক্ষ্মীবাবুর ভারোত্তোলনের এই বিরাট খ্যাতির পেছনে যাঁদের দান স্মরণ করার মত তাঁরা হচ্ছেন বিশ্বকল্যাণ সংঘের অন্যতম প্রবীণ সদস্য গোবর্ধন দাস ও প্রেমচাঁদ মিত্র। লক্ষ্মীবাবু ভারতীয় ভারোত্তোলনে পরপর এগারবার জাতীয় চ্যাম্পীয়ান হয়ে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন তার পেছনে ছায়ার মত লেগে থেকে প্রয়োজনীয়

* ১৯৬২ সালে ভারোত্তোলনে 'অর্জুন' পুরস্কার পান অপর এক বাঙ্গালী ভারোত্তোলক অলোক নাথ ঘোষ। কিন্তু তিনি কোন ন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় না খেলে সার্ভিসেসের হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে একটি ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখান। ফলে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাই লক্ষ্মীবাবুকেই বাংলাদেশের প্রথম 'অর্জুন' প্রাপক বলে ধরা হয়।

প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ জুগিয়েছেন এই প্রেমচাঁদবাবু। তাই হয়তো তাঁকে লক্ষ্মীবাবুর 'গুরু' বলে আখ্যা দেওয়া হয়।[৫] এই ক্লাবেরই আর এক ভারোত্তোলনকারী আন্দুল নিবাসী কমলাকান্ত সাঁতরা ১৯৮২ সালে জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। এই বছরই দিল্লীতে নবম এশিয়াডে ভারতের হয়ে তিনি প্রতিযোগিতা করে হাওড়ার গৌরব ব্যায়ামের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এতদিন আমরা ভাবতাম যে ভারোত্তোলন বুঝি কেবল ছেলেদেরই খেলা। কিন্তু মহিলারাও যে সুযোগ পেলে বিশ্বে নামী হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ বিগত কয়েক বছরে এশিয়ান গেমস এমনকি বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায়ও দেখতে পাচ্ছি। সে রকমই একজন মহিলা ভারোত্তোলনকারিণী সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হল। তিনি হচ্ছেন হাওড়া আন্দুলের মাশিলা গ্রামের মেয়ে ছায়া আদক। শ্রীমতী আদক পূর্বে উল্লিখিত দত্ত জিমনাসিয়ামে নিয়মিত অনুশীলন করে আসছেন। এই ছায়া আদকই ১৯৯০ সালে বেজিং এশিয়াডে ১৫২ কেজি ভার তুলে ব্রোঞ্জ পদক গলায় পরেছিলেন। গ্রামের এক মুদি দোকানদারের কন্যা ছায়া আদক। তা সত্ত্বেও নিষ্ঠা, সংকল্প ও অধ্যবসায় থাকলে যে কি পর্যন্ত ওঠা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন শ্রীমতী আদক।

এই ছায়া আদক সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি দিল্লী থেকে (১৫ ই অক্টোবর ১৯৯০) লিখছেন—'হাওড়া বিশ্বকল্যাণ সঙ্ঘের জিমনাসিয়াম থেকে সেদিন ওঁরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন কি ওঁদের বারবেলগুলোতে হাত দিয়েছিলাম বলে প্রবীণ কর্তারা বলেছিলেন ওগুলো ধুতে হবে। মেয়েছেলের হাত লেগে অপবিত্র হয়ে গেছে। এখন ওঁরা অবশ্য দাবি করেছেন, আমি ওঁদেরই হাতে গড়া। এসব কথা শুনলে রাগও হয়, হাসিও পায়।' বিশ্বের কল্যাণ করা যে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য তাদেরই কর্মকর্তারা কেন নারী কল্যাণ ও প্রগতিতে এত অনাগ্রহী হলেন এটা জানার জন্য একদিন সময় করে ক্লাবে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু পরে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা সূত্রে জানলাম ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সাংবাদিক যে নিজেই একটু রং চড়িয়ে সংবাদটিকে রসালো করতে চেয়েছেন তা ছায়া আদকের প্রতিবাদ নোট থেকেই বোঝা গেল। যদিও ভারোত্তোলনের হাতে খড়ি হয়েছিল ছায়া আদকের মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়ামাগারে। আরও আনন্দের বিষয় লক্ষ্মীকান্ত দাসই হচ্ছেন ছায়া আদকেরও কোচ। আর দুই প্রবীণ ভারোত্তোলক হচ্ছেন হাওড়ার নারায়ণ চন্দ্র দে ও গোপাল গোবিন্দ খাঁড়া। বাজে শিবপুরের গোপালবাবু সারা ভারত ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সম্পাদক ও রাজ্য সমিতির সভাপতি। একাধিকবার তিনি অলিম্পিকে ভারতীয় টীমের ম্যানেজার হয়ে দল পরিচালনা করেছেন। বালির অনিল পাল ফেদার ওয়েটে লণ্ডনে কমনওয়েলথ গেমসে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বালি ফিজিক্যাল কালচারের অশোক সেনগুপ্তও ভারোত্তোলনে এন. আই. এস কোচ হয়ে ভারতীয় টীমের প্রতিনিধিত্ব করে জেলার সুনাম বাড়িয়েছেন। এঁরা সকলেই গর্বের বস্তু।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে কয়েকটি ব্যায়াম সমিতির নাম ও তার সংক্ষিপ্ত কৃতিত্ব আলোচনা না করলে ব্যায়াম চর্চার ক্ষেত্রে হাওড়ার অবদান অজানা থেকে যাবে। এই ব্যায়াম সমিতিগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে নিছক শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ এই আপ্ত বাক্য কেবল মনে রেখেই ব্যায়াম সমিতি ও ক্লাবগুলি সংগঠিত হয় নি। পরন্তু দেশমাতৃকাকে বিদেশী বন্ধনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যই ব্যায়াম সমিতিগুলি গড়ে উঠেছিল। তবে একজ শরীর চর্চার জন্যও যে দু চারটে ব্যায়াম সমিতি তৈরি হয়নি তাও নয় যেমন শালকিয়া অভয় ব্যায়াম সমিতি। ১৯২০ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ং অভয়পদ ব্যানার্জী। অসীম শক্তির অধিকারী ছিলেন অভয়বাবু। বুকের ওপর একটন পাথর চাপিয়ে তার ওপর আবার হাতুড়ী দিয়ে পাথর ভাঙ্গা ও চলন্ত মোটর গাড়ী হাত দিয়ে টেনে রাখা ছিল তাঁর সেরা খেলা। অভয়বাবুর কথা কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই ক্যাপ্টেন জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। সেই সুবাদে ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী শালকিয়ায় আসতেন। সে সময়ে একটা সাধারণের ধারণা ছিল যে নিষ্কর্মা লোকেরাই বুঝি ব্যায়ামচর্চা করে। বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করে জীতেন্দ্রনাথ শরীর চর্চার দিকে মন দেন। 'ভেতো বাঙ্গালী' এই অপবাদ ঘোচাবার জন্য জীতেনবাবু ব্যায়ামাগারের প্রসারে মনোনিবেশ করেন। ১৯১২ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন এদেশে আসেন তখন জীতেনবাবু সম্রাটের সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে 'দরবার মেডেল' পান। ১৯১৫ সালে তিনি 'ক্যাপ্টেন' আখ্যাও লাভ করেন। ১৯৩৪-৩৫ সাল। ভারত বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ গোবর বাবু, গামা পালোয়ান, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ মিলিত হয়েছেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)। অভয়বাবুও খেলা দেখালেন বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে হাম্বর দিয়ে তার ওপর পাথর ভাঙ্গার খেলাটি। পরের খেলাটি ছিল মোটা শেকল কাঁধে ঠেলে ছেঁড়ার খেলাটি। কিন্তু শেকলটি কিছুতেই ছিঁড়ছে না। অভয়বাবুর সমর্থকদের মুখ একেবারে চুণ। কি ব্যাপার, আজ কি অভয়বাবুর শরীরে শক্তি নেই! শেকলটি ছিঁড়ছে না কেন! হঠাৎ দেখা গেল যে, উদ্যোক্তারা একটি কাঠের বেঞ্চির সঙ্গে বেড় দিয়ে তলায় একটি কাঠের ডাসা না দিয়ে বাঁশের সঙ্গে শেকলটিকে বেঁধে দিয়েছেন। যখনই শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে বাঁশটিও অমনি বেঁকে বেড়ে যাচ্ছে। দু'বার চেষ্টা করেও যখন হল না তখনই ব্যাপারটা ধরা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি দোকান থেকে মোটা কাঠের তক্তা এনে শিকলটিকে জড়ানো হল। এবার শক্তি প্রয়োগ করতে সহজেই শেকলটি ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি উল্লাস! অভয়বাবুর শক্তিমত্তা দেখে উপস্থিত ব্যায়ামবিদগণ ধন্য ধন্য বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। এদিন যে ব্যক্তি সবচেয়ে গর্বিত হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন জীতেনবাবু। কারণ তাঁরই উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল তাঁর বন্ধু অভয়বাবুর অসাধারণ খেলাগুলি দেখাবার জন্য।

এই জীতেনবাবু ব্যায়ামের উন্নতিতে ১৯৪১ সালে ১৭ ই সেপ্টেম্বর তাঁর আমৃত্যু সঞ্চিত একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ও নগদ অর্থ দিয়ে গেছেন 'দি অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার এসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা গড়ে দিয়েছেন।

অভয়বাবুর মত একজন ব্যায়ামবিদ যে একজন ভাল ক্রিকেটার হতে পারেন তা হয়তো আমাদের সহসা বিশ্বাস হবে না। কিন্তু অভয়বাবু তৎকালে একজন ভাল ক্রিকেটারও ছিলেন। তিনি হাওড়া টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন হয়ে নিজ দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

এবার এমন কয়েকটি ক্লাবের নাম করা হবে যারা শরীরচর্চার জন্য ব্যায়াম সমিতি হিসেবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলত দেশের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করাই ছিল তাদের মূলমন্ত্র। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শালকিয়া ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন, হাওড়া সেবা সংঘ, হাওড়া সংঘ, অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি প্রভৃতি ক্লাব। শালকিয়া ফ্রেন্ডস আজ কলকাতার ময়দানে একটি প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ও ক্রিকেট ক্লাব বলে স্বীকৃত। এটি ১৯১৮ সালে তৈরি হয়েছিল নিছক ব্যায়াম চর্চার জন্য। কিন্তু ব্যায়ামচর্চার মাধ্যমে ছেলেদের বিপ্লবী কাজে ট্রেনিং দেওয়া হত। এই ব্যাপারে ক্লাবের প্রধান সংগঠক কিশোরী ঘোষাল (পানিদা) ও আব্দুল মোমিন অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন আহিরীটোলার ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই বসন্তবাবুর কথা আগেই বলা হয়েছে। আব্দুল মোমিন একজন বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রমিক আন্দোলন অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। এই পানিবাবু ই. বি. রেলওয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সামাদ, বাঘা সোম, মোনা দত্ত প্রমুখ খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সঙ্গে কলকাতার মাঠে খেলতেন। শালিখার আর এক খ্যাতনামা ফুটবলার বাদল গুপ্ত গোষ্ঠপালের সঙ্গে মোহনবাগানের হয়ে গোলকিপার খেলতেন। এরও আগে ১৯২০ সালে শালকিয়া এ্যাথলেটিক ক্লাব তৈরি হলে তাতে ধীরেন বসু মল্লিক (চরণদা), হাওড়া ইউনিয়নের শচীন দত্ত, সত্য হাজরা প্রমুখ বিশিষ্ট খেলোয়াড়রা যোগ দেন। সত্য হাজরা মোহনবাগানের ব্যাক হিসেবে খেলার জন্য অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর অকাল মৃত্যু তাতে বাদ সাধে। এই ক্লাবেরই সদস্য শালিখা-বাসী রাখাল মুখার্জী তদানীন্তনকালে বেঙ্গল সকার লীগের রেফারী হিসেবে খেলা পরিচালনা করতেন। কালে তিনি আই. এফ. এর জয়েন্ট সেক্রেটারীও হয়েছিলেন।

সে যুগে জেলার বিভিন্ন ক্লাবই অল্প বিস্তর স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতো। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সদস্যরা পুরোভাগে থেকে আন্দোলন করেছেন এমন ঘটনা খুবই কম। যদিও বা তা পাওয়া যায় তথাপি সেই অপরাধে ক্লাবকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছে এমনটি বোধ হয় নি। এ রকম একটি ক্লাব হচ্ছে 'হাওড়া সেবা সংঘ'। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সরকার সংঘকে বে-আইনি ঘোষণা করেন এবং ক্লাবের ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সব

খাতাপত্র বাজেয়াপ্ত করে। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অজিতনাথ মল্লিক, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ হাজরা প্রমুখ।[৭] ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এই ক্লাবটির অন্যতম কর্ণধার ও পরবর্তী কালে হাওড়া জেলার এক অবিসম্বাদী জাতীয় নেতা হরেন্দ্র নাথ ঘোষের লেখা থেকেই ক্লাবের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে। তিনি লিখছেন—'শুধু শক্তি চর্চার দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভব হইলেও মানসিক বিকাশ ও রাজনৈতিক চেতনার অভাবে তাহা জাতির মুক্তির কার্যে ব্যবহৃত নাও হইতে পারে।[৮] সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই দেশের মুক্তি সাধনে হরেনবাবুর প্রয়াসে ক্লাবটি জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘের অন্যান্য কাজের মধ্যে দুর্গোৎসব একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এই দুর্গোৎসবের প্রেরণা লাভ করেন হরেনবাবুর বড়দা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলকাতার 'সিমলা ব্যায়াম সমিতির' অন্যতম কর্ণধার ও যুগান্তর দলের নেতা অতীন্দ্র নাথ বসুর কাছ থেকে। তাঁরই চেষ্টায় ১৯২৭ সালে জয়দেব কুন্ডু লেনে প্রথম বছর মাত্র ১০০ টাকায় (একশ) দুর্গা পুজো হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রতিমা বাবদ ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ২৫ টাকা।[৯]

হাওড়া জেলার মধ্যে হাওড়া সেবা সংঘের ১৯২৭ সালের আয়োজিত পুজোকেই জেলার প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব বলে সমিতির হীরক জয়ন্তী বর্ষে ১৯৮৯ সালের স্মরণিকায় দাবি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়—এই বছরই একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেন হরেনবাবু। তার উদ্বোধন করলেন তদানীন্তন খ্যাতনাম্নী নেত্রী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। বলা বাহুল্য, এই প্রদর্শনীটি ছিল জাতীয় ভাবোদ্দীপক বিষয়কসহ কুটির শিল্প, সূচীশিল্প ও নানা প্রকারের হস্ত শিল্পের। 'এটি চলেও ছিল দীর্ঘ দুমাস ধরে।'[১০] এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলাদেশের কোথায়, কবে, কারা সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রথম চালু করেছিলেন তা নিয়ে নানান জনে নানান মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। তবে একথা ঠিক যে আজকে যে সব প্রাচীন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ফিরিস্তি দেখতে পাই আসলে কিন্তু সেগুলি এককালে কোন না কোন জমিদার বা ধনাঢ্য বাড়ির পুজো ছিল। পরে হয় বন্ধ হয়েছে নয় সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করেছে। সেই রকমই একটি বাড়ির পুজো সার্বজনীন রূপ নিল বঙ্গদেশে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। রানী রাসমণির মেয়ের শ্বশুর বাড়ি আটাপাড়া। সিঁথির (দমদম) মোড় থেকে দুই কিলোমিটার ভেতরে গ্রামটি। ঘটা করে আগে পুজো হত। কিন্তু মেয়ে কলকাতার জানবাজারে চলে এলে পুজো বন্ধ হয়ে যায়। পাড়ার লোকজন ঠিক করলেন মায়ের পুজো বন্ধ হবে না—চাঁদা তুলে পুজো করা হবে। শুরু হল সার্বজনীন পুজো। আজও তা হয়ে আসছে মহাসমারোহে। ১৯৯০ সালে তার শতবর্ষ পূরণ হয়েছে।[১১] এই সংবাদ হয়তো হাওড়াবাসীর কাছে তেমন উৎসাহের উদ্রেক ঘটাবে না। কিন্তু এর পরের ঘটনাটি জানলেই হাওড়াবাসীর গরবের সীমা থাকবে না। ঐ সার্বজনীন

পুজোতে পুরুত ও তন্ত্রধার এসেছিলেন এই হাওড়া জেলার আমতা থেকে। ঐ প্রবন্ধের লেখক মানস রায় আরও লিখছেন—সেই পুজো ঘরের বাইরে এল। হল সার্বজনীন।...পুরুত-ঠাকুর আনা হল হাওড়া আমতা থেকে। আশুতোষ ভট্টাচার্য। সঙ্গে এলেন অবিনাশ চক্রবর্তী আর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী''[১২]।

কিন্তু একটি ক্লাবের উদ্যোগে সার্বজনীন পুজোর আড়ালে দেশের মুক্তি সাধনে বিপ্লবীরা একত্র হয়ে এ পথ সম্ভবত প্রথম দেখালো বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব—যার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। তারপর কলকাতার 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি'র দুর্গোৎসবটির শুরু কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই। মৃন্ময় দুর্গামূর্তি'র মাধ্যমে চিন্ময় ভারত মাতার মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯২৬ সালের যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা অতীন্দ্রনাথ বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতির সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রবর্তন করেন যেখানে মহাষ্টমীর অন্নকূটের প্রসাদ সাধারণের পঙতিতে বসে খেতে আসতেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। যার ফলে ইংরেজ সরকার ১৯৩২, ৩৩, ও ৩৪ সালের পুজো বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছিলেন।[১৩] এর এক বছর পরেই হাওড়া সেবা সংঘের সার্বজনীন দুর্গাপুজোকে স্বাভাবিক কারণেই একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাবে তাতে সন্দেহ নেই—কারণ এই ক্লাবের কর্ণধার হরেন্দ্রনাথ ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের একজন দক্ষিণ হস্ত। এই ক্লাবই আবার হাওড়ায় প্রথম অসামরিক ব্যাণ্ডপার্টি বাদন দল ও R. W. A. C. এ্যাম্বুলেন্সের প্রথম শাখা জেলায় স্থাপন করে। ক্লাবেরই আর এক সংগঠক ছিলেন কার্তিক চন্দ্র দত্ত। যিনি স্বাধীনতার পরে হাওড়া মিউনিসিপ্যালটির নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রথম চেয়ারম্যান হন।

তৃতীয় ক্লাবটি হচ্ছে হাওড়া সংঘ। এই সংঘটিও দেশ প্রেমের তাগিদেই গড়ে উঠেছিল। 'প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক বেণী মাধব বড়ুয়া। অনাথ বন্ধু সমিতি, বয়েজ ট্রেনিং কটেজ, সানরাইজ ড্র্যামাটিক ক্লাব এবং সাধনা পাবলিক লাইব্রেরীকে মিলিত করেই এই নূতন নামে ক্লাবটি হয় ১৯২৫ সালে।[১৪] আজও এই ক্লাবটি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ, পাঠাগার পরিচালনা ও দুর্গোৎসব ইত্যাদি করে সমাজের সুখ-দুঃখের অঙ্গ হয়ে আছে। এদের পরিচালনায় একটি মাধ্যমিক স্কুলও পরিচালিত হওয়া খুবই গৌরবের। হাওড়া সেবা সংঘের মত এদের অসামরিক ব্যাণ্ড পার্টিও এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

শেষোক্ত ক্লাবটির নাম হচ্ছে 'হাওড়া ব্যায়াম সমিতি।' এই নামটি বললে আজকে হয়তো কোন ব্যায়ামাগার খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইতিহাস বলে হাওড়া তথা পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত ক্লাব অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতির আদি নাম ছিল তাই। এই ক্লাবটির আতুরঘর ছিল কালকুণ্ডু লেনে। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, জিমন্যাষ্টিক করাই ছিল তখন উদ্দেশ্য। কিন্তু সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত মনও চাই। তাই গঠিত হল 'ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী' নামে একটি পাঠাগার। সেই পাঠাগারে আসতে শুরু করলেন স্বদেশী বিপ্লবী নেতারা। পরিকল্পনা হ'ল দেশের দুর্গতি দূরে

করার জন্য দুর্গতিনাশিনীর পুজো করতে হবে। তাই ব্যায়াম সমিতির সম্পাদক ও প্রধান সংগঠক দানু বসু লক্ষ্মণ দাস লেনে ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে দুর্গাপুজো শুরু করলেন ১৯৩৩ সালে। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ শরৎচন্দ্র দত্ত, ললিত মোহন মণ্ডল, হেমচন্দ্র সিং ও দুর্লভ শী প্রমুখ। ঐ বছরই ক্লাবটি বর্তমান সমিতি ভবনে উঠে আসে। জন্মকাল থেকেই সমিতিতে চলতে থাকে সামরিক কুচকাওয়াজ, জনসেবা ও ইংরেজ বিরোধী সভা-সমিতি। এই ক্লাবেরও ব্যাণ্ডপার্টি তদানীন্তনকালে বহু বড় বড় জাতীয় নেতাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রশংসা পেয়েছে। ১৯৪২ সালটি এই ক্লাবের পক্ষে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন চলছে। সারা দেশ আন্দোলনে উত্তাল। দুপুরের রোদ থাকতে থাকতেই দুর্গা প্রতিমার ভাসান দিতে ইংরেজ জেলা শাসক আদেশ জারি করলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ক্লাবের প্রথানুযায়ী লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জনের দিন একসঙ্গে রাতে বিসর্জন দেবার কথা বললেন। ফলে সরকারী আদেশের প্রতিবাদে সে বছর দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জনই স্থগিত রইল। 'পরের বছর একসঙ্গে দুটি প্রতিমার নিরঞ্জনে অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য যে জন-সমাগম হয় তা অতুলনীয়।'[১৫] ১৯৪৬ সালে কলকাতায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' নাম করে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বিভৎসরূপ ধারণ করেছিল। তা থেকে সাধারণ নাগরিককে রক্ষা করার জন্য যে 'বিজলী ফৌজ' সমিতি গঠন করেছিল তা পশ্চিমবাংলায় এক নজির বিহীন দৃষ্টান্ত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই হল যেন এই ক্লাবের মূল কথা।

এছাড়া আরও কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত ক্লাব যারা আজও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে দেশ ও দশের হিতে কাজ করে যাচ্ছে—তাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করেই এই অধ্যায়টি শেষ করা হবে।

রামকৃষ্ণপুর সংসদ—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নিজের পরিবারের শ'দুয়েকের মত বই দিয়ে একটি পাঠাগার তৈরি করলেন নৃসিংহ বসু। পরে এই অঞ্চলের আরও দুটি ক্লাব যেমন ফ্রেণ্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাব এবং ঐক্য সমাজ এরাও এসে এই সংস্থার সঙ্গে একীভূত হয়। ১৯২০ সালে এরা রামকৃষ্ণপুর বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল পরিচালনা শুরু করে। ১৯৩০ সালে এটি রামকৃষ্ণপুর সংসদ নামে নামাঙ্কিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ করে সমাজের উপকার সাধন করে চলেছেন।

শালকিয়া তরুণ দল—কতিপয় তরুণের উৎসাহে ১৯৩৬ সালে একটি ফুটবল ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে নিজেদের সাংগঠনিক যোগ্যতায় ও সেবা-মূলক কাজের মাধ্যমে সমাজের আস্থালাভ করে। পাঠাগার, বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত করে জেলার একটি প্রথম শ্রেণীর ক্লাবে পরিণত হয়েছে। একটি প্রাথমিক স্কুলও এরা পরিচালনা করে। সমিতির পরিচালিত সার্বজনীন দুর্গোৎসব জেলার সেরা পুজোগুলির অন্যতম।

রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি—১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শরীর চর্চার কেন্দ্র হিসেবে।

পরে এটি আরও পল্লবিত হয় নানা শাখা খুলে যেমন স্কাউট গ্রুপ, ব্রতচারী, পাঠাগার, ফুটবল ও বাস্কেটবল ইত্যাদি। এদেরও দুর্গোৎসব একটি বড় পুজো।

বিশ্বকল্যাণ সংঘ (রামকৃষ্ণপুর)—হাওড়া জেলার এই ব্যায়ামাগারটি যথার্থ অর্থেই একটি সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা। ১৯৪৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজস্ব বাড়ি, নিজস্ব ব্যায়ামাগার, পাঠাগার অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল চালু এমনকি একটি এ্যালোপ্যাথিক ডিসপেনসারীও এরা চালান।

হাওড়া শহরে ব্যায়ামবিদ আয়রনম্যান নীরদ সরকারের নাম সর্বজনবিদিত। জন্মস্থান ও যৌবনের অর্ধেক ঢাকায় কাটান। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে শালিখায় এসে বাসা বাঁধেন। সেদিন থেকে শালিখার যুবশক্তির মধ্যে দেশপ্রেম ও শরীর গঠনের ব্রত নিয়ে কাজ করে গেছেন। তাঁর ব্যায়ামের গুরু ছিলেন রাজেন গুহঠাকুরতা। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নীরদবাবু 'আয়রনম্যান' উপাধি লাভ করেন। তিনি শুধু ব্যায়ামবিদই ছিলেন না—স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীর তাম্রপত্র ও পেনসন লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিম বাংলার নবরূপকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য নীরদবাবুকে অগ্রণী হতে বলেন। ডাঃ রায়ের পরামর্শে ও অর্থানুকুল্যে নীরদবাবু ছাত্রদের উপযোগী করে 'স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ব্যায়ামের প্রসঙ্গে তিনি এক ডজন বাংলায় বই লিখে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাবলু ব্যায়াম সমিতিতে অনেক কিশোর ও যুবক আজও ব্যায়াম করে চলেছে। নীরদবাবুর চমকপ্রদ খেলার মধ্যে ছিল চোখ দিয়ে লোহার শিক বাঁকানো, সুচালো বর্শা গলায় দিয়ে লোহার রড বাঁকানো, ধারালো খাঁড়ার উপর পেট দিয়ে ঝোলা, মাথা দিয়ে ডাব ফাটানো ইত্যাদি' ১৩৯১-এর ৪ঠা বৈশাখ তাঁর মৃত্যু হয়।

এতক্ষণ শহরের ব্যায়াম সমিতিগুলির কথাই বলা হল। এবার গ্রামের একটি বিখ্যাত ব্যায়াম সমিতির কথা বলা যাক। এই সমিতিটির নাম মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়াম সমিতি। আন্দুল-মৌড়ী গ্রামে এই ব্যায়াম সমিতিটি গড়ে উঠে ১৯২৮ সালে। উদ্দেশ্য গ্রামের ছেলেদের স্বাস্থ্যচর্চার মধ্য দিয়ে সুস্থ নাগরিক করে তোলা। ১৯৮১ সালে ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবও পালিত হয়েছে। ক্লাবটি গ্রামাঞ্চলে হলেও যে তা খুবই সুসংগঠিত ও প্রাণবন্ত তা বোঝা যায় ক্লাবের ১৯৮৫ সালের প্রতিবেদন থেকে। অর্গানাইজিং কমিটির কার্যকরী সভাপতি জয়কৃষ্ণ মুখার্জী লিখছেন—গত বারের মত এবারও পশ্চিমবঙ্গ ভারোত্তোলন সমিতি মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়াম সমিতিকে ৪৩-তম সিনিয়ার, ২৮-তম জুনিয়ার ও ১-ম সাব জুনিয়ার রাজ্য ভারোত্তোলন চ্যাম্পীয়নশিপ অনুষ্ঠান প্রযোজনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে পশ্চিমবঙ্গের যোগ্যতম সংস্থার সম্মানে ভূষিত করেছেন। আজ পর্যন্ত কোন সংস্থা পরপর দু বছর রাজ্য ভারোত্তোলন চ্যাম্পীয়ানশিপ প্রযোজনার দায়িত্ব পেয়েছে কিনা জানি না।[১৬] এই মন্তব্যে যে ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধির শুভ ইঙ্গিত

রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। প্রতিবেদক অন্যত্র আরও লিখেছেন—'শরীর চর্চা যথা—ভারোত্তোলন, দেহ সৌষ্ঠব, যোগব্যায়াম, জিমন্যাস্টিক, সাঁতার, ক্যারাটে ইত্যাদি সমিতি নানা বিভাগে নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ প্রায় চার শত। সকাল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত নানা দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করে।'[১৭]

---

১. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।

২. ঐ

৩. আনন্দবাজার পত্রিকা ২০. ৮. ১৯৮৩।

৪. দৈনিক বসুমতী ২০. ৮. ১৯৮৭।

৫. Sports Week March 16. 1969.

৬. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৭. হীরক জয়ন্তী উৎসব ১৯৮৪—হাওড়া সেবা সংঘ।

৮. হীরক জয়ন্তী বর্ষ—সার্বজনীন দুর্গোৎসব ১৩৯৬—হাওড়া সেবা সংঘ।

৯. ঐ

১০. ঐ

১১. আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ই অক্টোবর ১৯৮৯—কলকাতার প্রাচীন সার্বজনীন পুজো কোটিকে গুটি ক—মানস রায়।

১২. ঐ

১৩. ঐ

১৪. W. B. District Gazetteers, Howrah—Amiya K. Banerjee.

১৫. Golden Jubilee 1983 Howrah Annapurna Bayam Samity.

১৬. মহিয়াড়ী মহাকালী ব্যায়াম সমিতি ১৯৮৫—রাজ্যভারোত্তোলন চ্যাম্পীয়ানশিপ।

১৭. ঐ

বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে এদেশে এলেও রাজদণ্ড ধারণ করতে বেশি দেরী করতে হয়নি ইংরেজকে। এদেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, বিশ্বাসহীনতা ও অনৈক্য ছিল তার প্রধান কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তিনটি প্রেসিডেন্সীতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে এদেশীয় যুব শক্তিকে উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিল ইংরেজ শাসক। যার ফলশ্রুতি হিসেবে তৈরি হল কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাভাবিক কারণেই কলেজীয় শিক্ষা চালু হল। ইংরেজ মানসিকতা তৈরির উদ্দেশ্যে ইংরেজ প্রবর্তিত নানা প্রকারের খেলাধুলাও এদেশে প্রবর্তিত হল। তার মধ্যে দুটি খেলা ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করল। একটি ক্রিকেট অপরটি ফুটবল। ব্যয়বহুল ক্রিকেট খেলা যেমন সঙ্গতিসম্পন্ন গুজরাতি অধ্যুষিত বোম্বাই রাজ্যে একদা আস্তানা গড়েছিল তেমনি স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন ও উত্তেজনা প্রবণ ফুটবল খেলা শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের কাছে অপেক্ষাকৃতভাবে আবৃত হয়েছিল।

উনিশ শতকের আশির দশকে বিভিন্ন কলেজে যথা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশপস কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফুটবল খেলার জন্য নিজস্ব টিমও গড়ে উঠেছিল। তাঁরাই আবার বাইরে এসে ফুটবল টিম গঠন করতে উৎসাহী হন। এই উৎসাহের ফলশ্রুতি হিসেবেই জন্ম নিল মোহনবাগান ক্লাব ১৮৮৯ সালে। যদিও ট্রেডস্ কাপে মোহনবাগান কয়েকবার চ্যাম্পীয়ান হয়েছে—কিন্তু আই. এফ. এ. শীল্ডে প্রথম প্রতিযোগিতা করে ১৯০৯ সালে। এরও আগে শোভাবাজার, টাউন ক্লাব, হেয়ার স্পোর্টিং, আর চুঁচুড়া স্পোর্টিং শীল্ডে যোগদান করে। কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পরেনি। মোহনবাগান দুবছর শীল্ডে যথারীতি পরাজয় বরণ করলেও ১৯১১ সালে গোরা সৈন্যদের হারিয়ে প্রথম ভারতীয় টিম হিসেবে এক ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করল। প্রতিদ্বন্দ্বী গোরা টিমের নাম ছিল ইষ্ট ইয়র্ক-শায়ার রেজিমেণ্ট। এই খেলায় মোহনবাগান ৩—১ গোলে জিতে গোরা টিমের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হীনমণ্যতার মানসিকতা কাটাতে সক্ষম হল। শুধু তাই নয়, এই সালেই ইংরেজ রাজশক্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হল যে লর্ড কার্জনের বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব (১৯০৫) তাঁরা তুলে নিলেন। একদিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বঙ্গ ভঙ্গ রদ আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য অপরদিকে রাজশক্তির টিমের শীল্ডের প্রথম পরাজয় যেন গোদের উপর বিষফোঁড়ার সামিল হল ইংরেজ শক্তির কাছে। এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হল এইজন্য, এই শীল্ড খেলায় যে এগারজন ভারতীয় খেলোয়াড় ছিলেন তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন বালি উত্তরপাড়ার বর্দ্ধিষ্ণু মুখার্জী পরিবারের ছেলে মনোমোহন মুখার্জী। এই উত্তরপাড়া কালের গতিতে হাওড়া

জেলা থেকে আজ আলাদা হয়ে গেলেও ইতিহাসের পুরানো নজিরে দেখতে পাওয়া যায় যে উহা এককালে হাওড়া জেলারই উত্তরাংশ ছিল। তার জন্যই উহার নাম হয় উত্তরপাড়া অর্থাৎ বালির উত্তর দিকের অংশ। ঐতিহাসিকগণ বলেন 'বালি' একটি পুরাতন গ্রাম। বর্তমান উত্তরপাড়ার সীমানায় খালের বাঁ-ধারে ইট খোলা অঞ্চল চকবালী নামে আজও অভিহিত। পশ্চিম বাংলার প্রবীণদের মধ্যেও এখনও 'বালি-উত্তরপাড়া' ডাক অতি পরিচিত।[১]

সুতরাং মোহনবাগানের সেদিনের শীল্ড জয়ের গৌরব জাতীয় গৌরব হলেও হাওড়া জেলার গর্ব এই যে সেই জয়ের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন মনোমোহন মুখার্জী নামে জনৈক হাওড়ার খেলোয়াড়। সেই অর্থে মোহনবাগান হাওড়ার ক্লাব না হলেও মনোমোহনের জন্য হাওড়াবাসী বিশেষভাবে গর্বানুভব করতে পারে। তৎ-কালে এই জয় কেবল ফুটবলের জয় বলে চিহ্নিত হত না—এই জয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপসারণের বিরুদ্ধেই প্রতীকী জয়। শোনা যায়, জনৈক বৃদ্ধ ভদ্র-লোক মোহনবাগানের ডিফেন্ডার রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জীকে সেদিন বুকে জড়িয়ে ধরে ফোর্ট উলিয়ামের 'ইউনিয়ন জ্যাকের' দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন—'বলো, বলো. কবে তোমরা ওটাকে টেনে নামাবে ?''

এখানেই উত্তরপাড়া মুখার্জী পরিবারের ফুটবলের ইতিহাসের ইতি হয়নি। দীর্ঘ আটাশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে আবার এই মোহনবাগানই প্রথম আই. এফ. এফের লীগ চ্যাম্পীয়ন হল। 'যদিও ভারতীয় দল হিসেবে লীগ বিজয়ের প্রথম গৌরব লাভ করেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ সালে।' '৩৪—৩৮' পর্যন্ত পাঁচ বছর লীগ চ্যাম্পীয়ান ছিল এই মহমেডান স্পোর্টিং।'[২] মোহনবাগানের এবারের প্রথম লীগ বিজয়ের তিলকের ফোঁটা পড়েছিল আবার উত্তরপাড়ার মুখার্জী বংশেরই এক অধস্তন পুরুষের কপালে। তিনি ছিলেন মনোমোহনেরই সুযোগ্য পুত্র বিমল মুখার্জী। তবে এবার বিমলবাবু আর পিতার ন্যায় একজন খেলোয়াড়ই ছিলেন না তিনি ছিলেন স্বয়ং দলের অধিনায়ক। পিতা-পুত্রের এই যৌথ সাফল্যের ইতিহাস হাওড়াবাসীর স্মৃতির ইতিহাসে যাতে ম্লান হয়ে না যায় তাই এই আলো-চনার প্রাসঙ্গিকতা।

এবার হাওড়া জেলার ফুটবল ইতিহাসের কথায় আবার আসা যাক। হাওড়া জেলায় ঠিক কবে থেকে ফুটবল খেলার প্রচলন হল তা সঠিক দিনক্ষণ নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে হাওড়ার বিশিষ্ট ফুটবল রেফারী কালী রায় তাঁর 'হাওড়া জেলার ফুটবল খেলার ইতিহাস' বইতে লিখছেন—'১৮৭৭ খ্রীঃ থেকে হাওড়ায় ফুটবল খেলা চালু হয়। তবে তৎকালে ঐ ফুটবল রেলকর্মী, মিলিটারী, পুলিশ ও শিবপুর বি. ই. কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৮৯ খ্রীঃ প্রথম প্রতিযোগিতামূলক খেলা 'ট্রেডস কাপ' প্রবর্তনের মধ্য দিয়া আমাদের দেশে ফুট-বলের ইতিহাস সূত্রপাত হয়। আর আই. এফ. এ.-র জন্ম হয় ১৮৯৩ সালে।'

আই. এফ. এ. ফুটবল প্রতিযোগিতার আগে 'ট্রেডস কাপের' ফুটবল প্রতিযোগিতা

বঙ্গদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল। আই. এফ. এ-র সাহেবরা 'গ্লেডস কাপের' সাহেবদের সম্মানের চোখে দেখতেন না—কারণ ওঁরা ছিলেন ব্যবসাদার—বিশেষ করে আবার জুটমিলের মালিক বা ম্যানেজার বলে। তাই হয়তো ঐ কাপের অনুরূপ নামও হয়েছিল। হাওড়া শহরে আই. এফ. এ. পরিচালিত প্রথম 'হাওড়া লীগ ফুটবল' চালু হয় ১৯১৮ সালে। এই লীগে হাওড়া থেকে প্রথম যে পাঁচটি ক্লাব যোগ দিয়েছিল সেগুলি হচ্ছে হাওড়া ইউনিয়ন, হাওড়া টাউন ক্লাব, হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিবপুর ইনস্টিটিউট ও শিবপুর ইউনিয়ন ক্লাব।[৩] পরে অবশ্য শালকিয়া ফ্রেন্ডস, আন্দুল স্পোর্টিং ক্লাব, মাকড়দহ স্পোর্টিং ক্লাব প্রভৃতিও যোগদান করেছিল। হাওড়া লীগ যাঁরা চালাতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যবহারজীবী সুব্রত ব্যানার্জীর পিতা), প্রতাপ মুখার্জী, এম. দত্ত, ডাঃ রমেন মিত্র এবং ডাঃ রহমান।[৪]

হাওড়ার শহর ও গ্রামে ফুটবল খেলার প্রসার ও প্রতিযোগিতা যাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তারজন্য ১৯৩৮ সালে মাকড়দহে 'হাওড়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা তৈরি করা হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভূধর ব্যানার্জী (পূর্বাহ্নপাড়া), ডাঃ রমেন মিত্র (মধ্য হাওড়া), বুকাঙ্গদ রায় (রাউতাড়া), শিবপ্রসাদ ব্যানার্জী (দঃ ঝাপড়দহ), ফণিভূষণ দত্ত (দঃ হাওড়া), প্রবোধ কুমার ব্যানার্জী (মাকড়দহ) এবং মহম্মদ আবদুল মল্লিক (হাওড়া)। এঁদের মধ্যে ভূধর ব্যানার্জী ছিলেন প্রধান সংগঠক।[৫] বালি গ্রামেরও ফুটবলের ঐতিহ্য আছে। এই গ্রামে ফুটবলের প্রবর্তক ছিলেন কান্তি গোস্বামী, রাজেন সেট ও শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দক্ষিণ বালিতে ছিলেন প্রবোধ ভট্টাচার্যসহ সুনীতি গোস্বামী ও ব্রজগোপাল রায়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, আই. এফ. এ. শীল্ড ও লীগের খেলা যেমন কলকাতায় ভারতের সেরা ফুটবল টিমগুলিকে আকর্ষণ করে তেমনি বোম্বাইতে রোভার্স কাপও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৯ সাল। রোভার্স কাপ খেলার জন্য বোম্বাই থেকে আমন্ত্রণ আসে বাংলার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল টিমগুলির কাছে। কিন্তু সে বছর বাংলা থেকে কেউ গেল না। হাওড়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনই সে বছর সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম রোভার্স কাপে যোগদান করে বাংলার মুখ রেখেছিল। যদিও বাংলা ফাইনাল খেলায় ১-২ গোলে পরাজয় বরণ করে। তাতে খেলেছিলেন জীবনকৃষ্ণ ব্যানার্জী (অধিনায়ক), বিভূতিভূষণ সরকার, প্রফুল্ল মিত্র, রহমন, কেন্ট ব্যানার্জী, শচীন্দ্রনাথ মিত্র (ল্যাংচা), নরসীমা, কৃষ্ণরাও, মোহন টাট, পশুপতি ব্যানার্জী (লেড়ো), জামান, ওসমান, জোন্স, রঙ্গনাথম এবং কিংকর চ্যাটার্জী।[৬]

হাওড়ার ফুটবলাররা কেবল হাওড়ার টিমগুলির হয়েই প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ম্যাচ কলকাতায় খেলেননি, কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ক্লাবেও খেলে নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শরৎ চৌধুরী, দেবী

ঘোষ, অভয়পদ রায়, রতন দত্ত, দাশু মিত্র, পি. বর্মন, বাঘা কুন্ডু, রতন সেন, কার্তিক চ্যাটার্জী, ল্যাংচা মিত্র, পদ্ম ব্যানার্জী, আদিত্য রায়, শৈলেন মান্না, নীলেশ সরকার, সমর (বদ্রু) ব্যানার্জী প্রমুখ।

শরৎ চৌধুরী শিবপুর বিশপস্ কলেজের ছাত্র ছিলেন। হাওড়া ইউনাইটেড ক্লাবে ব্যাকে খেলতেন। এই ক্লাবটি হাওড়াতে ইংরেজরাই স্থাপন করেন ১৮৮০—১৮৯০ সালের কোন এক সময়ে।[৭] ক্লাবের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই ছিল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় সাহেব। তাঁদের মধ্যে শরৎবাবু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় বলে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি সিনিয়ার ডিভিশনে বৃটিশ মিলিটারী টিম রয়েল আইরিশ রাইফেলের বিরুদ্ধে অতুলনীয় খেলা খেলেছিলেন। তদানীন্তন 'দি ইংলিশ ম্যান' (বর্তমান স্টেটসম্যান) পত্রিকা লিখছে—'শরৎ চৌধুরী এই খেলায় একটিও বল একবারের জন্য বিপথে চালিত করেননি।'

আন্দুলের অভয়পদ রায় ছিলেন শোভাবাজার ক্লাবের অধিনায়ক। ১৯০৫ সালে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী ডালহৌসী এ. সি. এবং ১৯০৬ সালে আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচে দেশীয় টীমের অধিনায়কও ছিলেন তিনি। এই শোভাবাজার ক্লাব কলকাতার আদি ফুটবল ক্লাবগুলির মধ্যে অন্যতম।

রতন দত্ত ১৯২১ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবে খেলা শুরু করেন। প্রথম জীবনে ব্যাকে খেলা শুরু করলেও শেষে গোলরক্ষক হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন।

দেবী ঘোষ—হাওড়া ইউনিয়নে ব্যাক হিসেবে ফুটবল খেলা শুরু করেন। কলকাতার মাঠেও একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় ছিলেন। শুধু দেশেই নয়—১৯৩৩ সালে কলম্বো, '৩৪ সালে ভারতের আই. এফ. এ-র বাছাই দলের হয়ে খেলেছিলেন। ১৯৩৬ সালে মোহনবাগানের হয়ে ডুরান্ড খেলেছিলেন। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে গোষ্ঠ পালের পর এত বড় ব্যাক আর দেখা যায় নি।

দাশু মিত্র—হাওড়া ইউনিয়নের সম্পাদক ও রাইট হাফ হিসেবে ময়দানে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪০-এ তিনি এরিয়ানের হয়ে মোহনবাগানকে শীল্ড খেলায় ৪—১ গোলে পরাজিত করতে সহায়তা করেন। তিনি একজন প্রশিক্ষকও ছিলেন। এই ক্লাবেরই আর এক বিশিষ্ট ফুটবলার ছিলেন পরেশ চক্রবর্তী।

কার্তিক চ্যাটার্জী—বালির ছেলে—হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে কলকাতার মাঠে খেলে গেছেন রাইট আউটে। কোনদিন দলত্যাগ করেন নি। ১৯৫৪ সালে খেলা থেকে অবসর নেন। কার্তিকবাবুর বংশ তিন পুরুষের ফুটবলার। কার্তিকবাবু, তাঁর পুত্র কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী জর্জটেলিগ্রাফে খেলতেন। কমলবাবুর ছেলে মোহন-বাগানের সত্যজিৎ চ্যাটার্জী। সত্যজিৎবাবুর মিডিও হিসেবে ভারতবিখ্যাত নাম আছে। তিন পুরুষের শ্রেণীর ফুটবল খেলার বংশ বিরল। এনা মিত্র ও কে. দত্তও ঐ একই ক্লাবে খেলতেন।

রাধানাথ (রাজা) ব্যানার্জী—বালির ছেলে। হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে ১৯২৯ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে তলপেটে আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হলো। কিন্তু বাঁচানো গেল না। তাঁর নামেই আই. এফ. এ 'রাজা শীল্ড' প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত ফুটবলার বদ্রু ব্যানার্জীর তিনি দাদা ছিলেন।

শচীন মিত্র (ল্যাংচা)—জন্ম বর্ধমানে। কিশোর বয়স থেকে বালিতে লেখাপড়া শেখেন। সেই থেকে আজও বালির বাসিন্দা। খেলা শুরু বালি ওয়েলিংটন ক্লাবে। কলকাতার প্রথম শ্রেণীর বেশ কয়েকটি ক্লাবেই খেলেন। মোহনবাগানে খেলে তিনি ভারত বিখ্যাত হন। ল্যাংচাবাবুরও বংশ তিন পুরুষের প্রথম শ্রেণী ফুটবলার। তবে সেটা কার্তিকবাবুর মত ছেলের বংশের নয়—মেয়ের বংশের। বিখ্যাত নীলেশ সরকার ল্যাংচাবাবুর জামাতা। নীলেশবাবুর ছেলে সন্দীপ সরকারও প্রথম ডিভিসনে শালকিয়া ফ্রেণ্ডসের হয়ে খেলেন। খেলোয়াড় হিসাবে যেমন তিনি খ্যাত ছিলেন কোচ হিসেবেও ততোধিক খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁরই কাছে ফুটবলের ট্রেনিং পেয়েছিলেন বদ্রু ব্যানার্জী, নীলেশ সরকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, পি. দে. (জংলা) ও স্বপন সেনগুপ্ত। কোচ হিসেবে ল্যাংচাবাবু ভারত বিখ্যাত।

রতন সেন—বাগনানবাসী রতনবাবু প্রথম জীবনে শালকিয়া ফ্রেন্ডসের রাইট আউট হিসেবে ফুটবল জীবন শুরু করেন। পরে কলকাতার ভবানীপুর ও মোহনবাগানে যোগ দেন। শুধু ভারতের প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ম্যাচেই তিনি অংশ নেন নি—১৯৫১ সালে পাকিস্তান, ১৯৫৫ সালে সোভিয়েট রাশিয়া, ১৯৫৬-তে দূরপ্রাচ্যে মোহনবাগানের হয়ে খেলতে যান। আন্তর্জাতিক ম্যাচেও তিনি জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া ও চীনের বিরুদ্ধেও আই. এফ. এ. একাদশের হয়ে খেলে ফুটবলে হাওড়াবাসীর সুনাম বাড়িয়েছেন।

শৈলেন মান্না—পৈতৃক বাস হুগলীর রমানাথপুর গ্রামে হলেও মাতুলালয় হাওড়ার ব্যাটরাতেই তাঁর জন্ম। মামাদের তত্ত্বাবধানেই তাঁর ফুটবল জীনব গড়ে ওঠে। 'আমার ছেলেবেলা' প্রবন্ধে শৈলেন মান্না নিজেই লিখছেন—"আমাদের নিজেদের ক্লাব বলতে ছিল ব্যাঁটরা ডিসিপ্লিন ফুটবল ক্লাব (বি. ডি. এফ. সি.)। কানাই, অবনী, অমর পালচৌধুরী এবং চায়না পালকেও মনে পড়ে। এরাও আমাদের সঙ্গে ছিল। চায়না পরে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিল। জেলার খেলাতে বিস্তর খেলেছি। এই ভাবেই আমি তৈরি হচ্ছিলাম নিজেরই অজান্তে।"[৮] তারপর ১৯৪২ সাল থেকেই মোহনবাগানের যে জার্সি পড়লেন তা জীবনে কখনও ছাড়েননি। মোহনবাগানের যাঁরা 'ঘরের ছেলে' বলে পরিচিত তাঁদের মধ্যে হাওড়ার শৈলেন মান্না অন্যতম শ্রেষ্ঠ। জীবনে বহু বিজয়ের শাক্ষী তিনি নিজেই। একদিন কলকাতার ফুটবলে গোষ্ঠ পাল ও উমাপতি কুমার যেমন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন তেমনি মোহনবাগানে 'ঘরের ছেলে' শৈলেন মান্নাও নিজেকে সেই স্তরে

উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে ভারত ফুটবলে সর্বপ্রথম অলিম্পিকে যোগ দেয়। সেবারের অলিম্পিক হয়েছিল লণ্ডন শহরে। শৈলেন মান্না ভারতীয় ফুটবল টিমের অধিনায়ক ছিলেন। আর অধিনায়ক ছিলেন টি-আও। শৈলেন মান্না খালি পায়ে খেলে যে নৈপুণ্য সেদিন দেখিয়েছিলেন তাতে ইংলণ্ডের রাজা··· ও রানী তাঁকে বাকিংহাম প্রাসাদে একান্তে এক চা-চক্রে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই সম্মান কজন পান।

এই প্রসঙ্গে আর এক হাওড়াবাসীর কথা একটু বলে রাখার মত। সেবারের অলিম্পিকে ভারতের বক্সিং টিমের সহঃ ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন শালকিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ক্রীড়ামোদী মণিলাল আটা। মোহনবাগানের একদা জায়েণ্ট কিলার ফুটবলার বলাই চ্যাটার্জীই সেবারে অলিম্পিক টিমের বক্সিং-এর ম্যানেজার ছিলেন। তিনি শালকিয়া ফ্রেণ্ডসে গল্প করেছিলেন যে বিমান থেকে যখন বক্সিং টিম লণ্ডনে নামে তখন মণিলাল আটাকে দেখিয়ে ওদেশের বক্সিং-এর জনৈক কর্মকর্তা তাঁকে (বি. ডি. চ্যাটার্জীকে) জিজ্ঞেস করেছিলেন—'ইনিই কি তোমাদের হেভী ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ান ? উল্লেখ্য মণি আটার চেহারা প্রকৃত পক্ষেই দেখার মত ছিল। যদিও তিনি কোনদিন বক্সিং লড়েননি। এর পেছনে যাঁর হাত ছিল তিনি হচ্ছেন শালকিয়া ফ্রেণ্ডস এসোসিয়েশনের সম্পাদক নরনারায়ণ চ্যাটার্জী (ঝণ্টুদা)। অলিম্পিক যাওয়ার আগের দিন মণিবাবু ঝণ্টুদার কাছে ভারতীয় দলের হয়ে লণ্ডনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঝণ্টুদা কালবিলম্ব না করে মণিবাবুকে নিয়ে সন্ধ্যে বেলায় আই. এফ. এর প্রবাদ পুরুষ পংকজ কুমার গুপ্তের কাছে গিয়ে হাজির। চব্বিশ ঘণ্টা আগে এই রকম একটি আবদার রক্ষা করা কার পক্ষে সম্ভব ! কিন্তু ঝণ্টুবাবুর পরিচিতির সুবাদেই সেই অসম্ভব আবদার রক্ষা করেন পংকজবাবু। যদিও নিজ খরচেই তাঁকে যেতে হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে শ্রীলংকায় শ্রীমান্না ভারতীয় দলের অধিনায়ক হলেন। '৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমসের ভারতীয় অধিনায়ক হয়ে ইরাককে ১—০ গোলে হারিয়ে সোনা জেতেন। কোয়েড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ভারতের তিনবার অধিনায়ক হন তিনি। তিন বারই ভারত চ্যাম্পীয়ান হয়। ১৯৫২ সালে সুইডেনের রাজধানী হেলসিংকি অলিম্পিকে আবার ভারতের অধিনায়ক।

১৯৫৯ সালে খেলতে খেলতে ইংলণ্ডে যান কোচেস ট্রেনিং নিতে। এখানে মনে রাখা যেতে পারে যে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ ফুটবলের জীবন শৈলেন মান্নার হয়েছে মোহনবাগানের সাহচর্য ও নিজ গুণপণা গুণে। কিন্তু এত কিছু করার পরও শৈলেন মান্না কোনদিন অর্থের বিনিময়ে ক্লাবের হয়ে খেলেননি. যেমন খেলেননি গোষ্ঠ পাল, উমাপতি কুমার, করুণা ভট্টাচার্য ও চুনী গোস্বামীর মত 'ঘরের ছেলে' কৃতী খেলোয়াড়রা।[৯] এহেন কৃতী বঙ্গ সন্তানকে ভারত সরকার ১৯৭১ সালে 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত করে যোগ্য কাজই করেছেন।

সমর ব্যানার্জী (বদ্রু) বালি গ্রামের এক খেলোয়াড়। ফুটবলের হাতেখড়ি বালি

প্রতিভা ক্লাবে। তারপরই মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান। মোহনবাগানের ফুটবল অধিনায়ক হয়ে ভারতব্যাপী খ্যাতি লাভ। ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবলের অধিনায়ক হয়ে ভারতকে আন্তর্জাতিক মানে চতুর্থ স্থানে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত ঐটিই অলিম্পিক ফুটবলে ভারতের সর্বোচ্চ স্থান হয়ে আছে।

বালির আর এক ফুটবলার ছিলেন কমল সামন্ত। শৈলেন মান্নার স্থানে মোহনবাগানের ব্যাকে কয়েক বছর খেলে সম্মান পেয়েছিলেন। The Staltesman লিখলে—Good substitute for S. Manna.

বালির ফুটবলের কথা আলোচনা করতে গেলেই ওয়েলিংটন ক্লাবের নাম প্রথমেই করতে হয়। শতবর্ষ অতিক্রম করে আজও বালি এ্যাথলেটিক ক্লাব নামে সে ক্লাবটি বঙ্গ ক্রীড়াঙ্গনে ইতিহাস হয়ে আছে। এই ক্লাবটিই ১৮৮৮ সালে ওয়েলিংটন ক্লাব নামে স্থাপিত হয়। পরে দেশ স্বাধীন হলে ১৯৫৪ সালে ক্লাবের নাম ওয়েলিংটন পরিবর্তন করে বালি এ্যাথলেটিক ক্লাব নামে উহা নামাঙ্কিত হল। ঐ ক্লাবের প্রধান স্থাপয়িতা ছিলেন মনমোহন গোস্বামী। মোহনবাগান ক্লাব সর্বপ্রথম শীল্ড জয় করে ফুটবলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের হীনমণ্যতা কাটাতে সাহায্য করেছিল এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি বালির ওয়েলিংটন ক্লাবও তদানীন্তন কলকাতার বিখ্যাত ফুটবল টিম রয়েল আর্টিলারী গ্যারিসন নামে একটি মিলিটারী দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে ফুটবলে জেলার যুবকদের মনে এক নতুন আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে জেলার মধ্যে এই ক্লাবটির ঐতিহ্য স্মরণ করার মত। তবে এক্ষেত্রে বালি প্রতিভা ক্লাবের কথাও মনে রাখতে হয়। কারণ বালির নামী কিছু ফুটবলার এই ক্লাবের মাধ্যমেই কলকাতার মাঠে আত্ম প্রকাশ করেন—তাঁদের মধ্যে বদ্রু ব্যানার্জী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজকের বিখ্যাত ফুটবলার সত্যজিৎ চ্যাটার্জী বালি এ্যাথলেটিক ক্লাবেরই সক্রিয় সদস্য।

হাওড়া জেলার আরও কয়েকজন কৃতী ফুটবলারের নাম উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। আমতা তাজপুরের আদিত্য রায় আউটে হাওড়া স্পোর্টিং-এর হয়ে খেলে ইংরেজ আমলে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। শালকিয়ার পশুপতি ব্যানার্জী (লেড়োদা), সীতাংশু কুণ্ডু (বাঘা কুণ্ডু) ও পি. বর্মন. হাওড়ার সমর দত্ত (কেষ্ট দত্ত), বালির নীলেশ সরকার প্রমুখ ছিলেন নামী ফুটবল খেলোয়াড়। এই নীলেশবাবুই কলকাতার মাঠে 'হ্যাট্রিক সরকার' নামে একদা খ্যাত ছিলেন। একবার কোন ম্যাচে একটি গোল করতে পারলে তিনটি গোল তিনি করতেনই। তাই তাঁকে এই নামে মাঠে ডাকা হত। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের হয়েই তিনি কয়েকবার দল বদল করেন। হাওড়ার অপর চার খ্যাতনামা খেলোয়ারদের মধ্যে আছেন অশোক চ্যাটার্জী, অমিয় ব্যানার্জী, অরুণ ঘোষ ও সুদীপ চ্যাটার্জী। অশোক চ্যাটার্জীর বড় কৃতিত্ব হচ্ছে ১৯৬৫ সালে 'কুয়ালালামপুরে মারডেকা ফুটবল ম্যাচে' মোহন-

বাগানের হয়ে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে হ্যাট্রিক করেছিলেন।[১০] এই মারডেকা ম্যাচে বালির ল্যাংচা মিত্র ছিলেন ভারতের ফুটবল কোচ। ১৯৬০ সালে অরুণ ঘোষ রোম অলিম্পিকে ভারতের হয়ে খেলেন। শিবপুরের সুদীপ চ্যাটার্জী কলকাতার মাঠে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৯৮২ সালে। সে বছর কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে 'নেহরু আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপের' প্রথম প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সুদীপবাবু তাতে প্রথম ভারতের অধিনায়ক হন। আশির দশকের আর এক কৃতী খেলোয়াড় হলেন বিকাশ পাঁজি। হাওড়ার জগদীশপুরে বলুহাটি গ্রামের ছেলে। তিনি ক্যালকাটা জিমখানা ও শালকিয়া ফ্রেণ্ডসে ফুটবল জীবন শুরু করেন। ১৯৮১ সালে ত্রিচুরে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলে কৃতিত্ব দেখান। পরে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলেও দল বদল করেন। ১৯৯১ সালে ত্রিবান্দমে নেহরু গোল্ড কাপে জাম্বিয়ার বিরুদ্ধে ভারত ১—০ গোলে জয়ী হয়। গোলটি অধিনায়ক বিকাশই করেন।[১১] এই বিকাশ পাঁজিকে কলকাতা তথা ভারতের ফুটবলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বের মূলে ছিলেন শালকিয়া ফ্রেণ্ডসের কর্ণধার নরনারায়ণ চ্যাটার্জী (ঝণ্টুদা)—এ সত্য বিকাশ বাবুও স্বীকার করেন।

হাওড়া জেলা থেকে আই, এফের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন কোনার অধিবাসী হেমন্ত কুমার দে। অপর পক্ষে ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সি. এ. বি) হাওড়া জেলা থেকে প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন শালকিয়া ফ্রেণ্ডসের সম্পাদক নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (ঝণ্টুদা) (১৯৭৫ সাল)। আই. এফ-এর কার্যকরী সমিতির প্রথম জেলার নির্বাচিত সদস্য হন ১৯৩৮ সালে হাওড়ার ডাঃ রমেন মিত্র। কলকাতা রেফারী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি হাওড়া ইউনিয়নের সম্পাদকও ছিলেন।[১২]
কলকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলায় রেফারী করার যোগ্যতা অর্জন করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন হাওড়া-শালিখার মানিকলাল বসু ও সন্তোষকুমার সেন। এঁরা দুজনেই তিরিশের দশকে আই. এফ. এ. পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ম্যাচ পরিচালনা করতেন। মানিকবাবু কলকাতার লোক হলেও দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে শালকিয়ায় থেকেই মৃত্যু বরণ করেন।
হাওড়া জেলা রেফারী এসোসিয়েশন প্রথম গঠিত হয় ১৯৪৪ সালে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন তুষ্টু ঘোষ। কলকাতার মত হাওড়া জেলায়ও প্রবীণ খেলোয়াড়দের নিয়ে ১৯৬৬ সালে 'হাওড়া জেলা ভেটারেন্স স্পোর্টস এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন কালী রায়, পশুপতি ব্যানার্জী ও রবীন্দ্রনাথ হাজরা। ফুটবলে ১৯৬৫ সালে অরুণ ঘোষ 'অর্জুন পুরস্কার' পেয়ে হাওড়াবাসীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। আধুনিক ফুটবলের একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ হচ্ছে 'স্পোর্টস মেডিসিন'। ১৯৭০ সালে হাওড়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ দীনবন্ধু ব্যানার্জীর উদ্যোগে ও ডাঃ এম. এস.

ঘোষের (বিখ্যাত অস্থিচিকিৎসক) সভাপতিত্বে 'হাওড়া জেলা স্পোর্টস মেডিসিন' তৈরি হলে খেলোয়াড়দের অশেষ উপকার সাধিত হয়। শুধু হাওড়ায় নয়—পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে যাঁরা স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে প্রথম চিন্তা ভাবনা করেন ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ডাঃ ব্যানার্জীকে ভারত সরকার তার সমাজ সেবার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯১ সালে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেন। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা এন. আই. এস ফুটবল কোচ হিসেবে জেলার অগ্রদূত বলা যায় যথাক্রমে ল্যাংচা মিত্র ও অশোক নাগকে। রামকৃষ্ণপুরের অশোক নাগ সম্বন্ধে নরনারায়ণ চ্যাটার্জী লিখছেন—It is Asoke Nag a quality Football Coach, who with his sincere efforts caused the football team of the Salkia Friend's promotion to First Division League of Calcutta and also created its stability to remain in First Division.[১৩] আর ল্যাংচা মিত্র তিনি নিজেই একটি ইতিহাস।

এতক্ষণ ফুটবলে হাওড়া জেলার খেলোয়াড়দের কৃতিত্বপূর্ণ গৌরবের কথা আলোচনা করা হল। কিন্তু এই ফুটবলকেই কেন্দ্র করে একদা হাওড়া জেলায় একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। সেই ইতিহাসের একটু আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। ফুটবল খেলা যে হাওড়ার গ্রামেতেও কত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে ঝিকিরা (আমতা) ওয়েষ্টার্ণ ফুটবল ক্লাব। গ্রামের মধ্যে এটি সম্ভবত প্রাচীনতম ক্লাব। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮২ সালে। এই ক্লাব তার শতবর্ষ উদযাপন ক'রে পশ্চিম বাংলায় তার গৌরবের কথা ঘোষণা করায় হাওড়াবাসী মাত্রই গর্বিত। এই ক্লাবের উদ্যোগে 'ভাগ্যধর শীল্ড' নামে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার নামী-নামী ক্লাবরাও এতে অংশ গ্রহণ করতো। ১৯৭৯ সালে ঝিকিরা ওয়েষ্টার্ণ ক্লাবের মাঠে মহিলা ফুটবলের এক প্রতিযোগিতা হয়। হাওড়া পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ও তাজপুরের সুসন্তান মহেন্দ্রলালের স্মৃতিতে 'মহেন্দ্রলাল মেমোরিয়াল কাপ' খেলা হচ্ছে। মহিলাদের এই প্রতিযোগিতার সংগঠক হিসেবে নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত খেলোয়াড় ও কোচ পি. কে. ব্যানার্জীর স্ত্রী প্রতিমা ব্যানার্জী। যে কোন কারণেই হউক দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা টিমের মধ্যে কলকাতার একটি দল সেদিন অনুপস্থিত ছিল। ফলে একই দলের মহিলা ফুটবলারদের ভাগাভাগি করে খেলান হয়। গ্রামে মহিলা ফুটবল খেলা—তার ওপর আবার কলকাতার দল। স্বভাবতই মাঠে সেদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। কর্মকর্তাদের কিছু ত্রুটির জন্য গ্রামবাসীরা নৈরাশ্য ও ক্ষোভবশতঃ খেলোয়াড়দের ওপর মারমুখী হয়ে ওঠে। এর ফলে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। তাতে একজন পুলিশ ও একজন গ্রামবাসী মারা যায়। মহিলা খেলোয়াড়রা জীবনে বাঁচলেও অনেকেই আশঙ্কাজনক ভাবে আহত হয়েছিলেন। হাওড়ার ফুটবল ইতিহাসে এটি একটি কালিমালিপ্ত অধ্যায়।

এবার ক্রিকেটের কথায় আসা যাক। একথা ঠিক যে বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত ক্রিকেট এত জনপ্রিয় হয়নি। আজকের মত টেস্ট ম্যাচ, রণজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি, ইরানী ট্রফি ইত্যাদির প্রবর্তনও তখন হয়নি। কিন্তু এসব না থাকলেও হাওড়া থেকে বেশ নাম করা ক্রিকেটার কলকাতার ইডেন গার্ডেনে খেলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমনকি বেঙ্গল টিমে স্থান পেয়ে হাওড়ার মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। সে সময়ও বড় বড় ক্রিকেট ম্যাচ খেলার রেওয়াজ ছিল—যেমন গভরনার্স একাদশ, ভাইসরয়স-একাদশ বনাম বেঙ্গল রেস্ট ইত্যাদির মধ্যে। সেই খেলা দেখতে ইডেনে সাহেবসুবো থেকে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের বেশ ভীড়ও হত। হাওড়ার ক্রিকেট ইতিহাসে হাওড়া স্পোর্টিং-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই ক্লাবেরই বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান বামাচরণ কুণ্ডুর নাম সবার আগে উল্লেখ করতে হয়। তিনি তিরিশের দশকে বেঙ্গল টিমে খেলে নিজ কৃতিত্বের নজির রেখে গেছেন। আর একজন নামী ব্যাটস্‌ম্যান ছিলেন হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী বরদাপ্রসন্ন পাইন। আইনের ক্ষেত্রে যেমন তিনি হাওড়া কোর্টে এক নম্বর ছিলেন ক্রিকেটে ব্যাটিং-এর ক্ষেত্রেও হাওড়া স্পোর্টিং-এর তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। হাওড়া ইউনিয়নের দাশু মিত্র ফুটবলের মত ক্রিকেটেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বরদাবাবুর ছেলে ব্যবহারজীবী সুশীল পাইনের নামও ক্রিকেট খেলোয়াড়দের স্মরণে রাখার মত। শালিখার কিশোরীমোহন ঘোষাল (পানিদা) ও বিশ্বনাথ বসাক প্রভৃতি সে যুগের ক্রিকেটে উল্লেখযোগ্য নাম।

হাওড়া স্পোর্টিং-এর আর এক চৌখস ব্যাটস্‌ম্যান ছিলেন যাঁর নাম কলকাতার ক্রিকেট ও ফুটবল মাঠে সদাই উচ্চারিত হত। তিনি হচ্ছেন মণি দাস—ক্রীড়া জগতে এম. দাস বলেই পরিচিত। মোহনবাগানে মণিবাবু ফুটবলে নাম করলেও ক্রিকেটের তাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক। কলকাতার ইডেন উদ্যানে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। ম্যাচটি ছিল বাঙ্গালা গভরনার একাদশ বনাম কুচবিহার মহারাজ একাদশের মধ্যে। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে অনুরূপ একটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলা হল। 'এই ক্রিকেট ম্যাচে' কুচবিহার মহারাজার একাদশ গভরনার একাদশকে এক ইনিংস ও সতের রানে পরাজিত করে।[১৪] স্মরণ করা যেতে পারে যে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের স্মৃতি রক্ষার্থেই কুচবিহার ট্রফি খেলা হয়। এই টিমে সেদিন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদেশী ও এদেশীয় খেলোয়াড়রাও ছিলেন। অপরপক্ষে গভরনর দলের সব খেলোয়াড়ই ছিলেন বিদেশী। মহারাজার টিমে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কুচবিহারের যুবরাজ ভিক্টর, হ্যারিলি, ফ্র্যাঙ্ক টারেন্ট, উইকেট কিপার ছিলেন এইচ. এম. হ্যানি। আর ভারতীয়দের মধ্যে যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন 'মণি দাস'।

স্টেটম্যান পত্রিকায় যে ছবিটি ছাপা হয়েছিল তাতে লেখা হয়েছে—**On his (H. M. Hanny) left is another local batsman, Mohan Bagan's Moni das,**[১৫]

এই মণিবাবু ১৯১৭ সালের ইডেনের প্রথম খেলাতেও কুচবিহার মহারাজের হয়ে খেলেছিলেন। এতক্ষণে হয়তো পাঠক বুঝতে পারছেন যে মণিবাবু কি স্তরের একজন ব্যাটসম্যান ছিলেন—যার ফলে কুচবিহার মহারাজার একাদশে সেরা বিদেশী ক্রিকেটারদের মধ্যেও তিনি নিজ আসন করে নিতে পেরেছিলেন। এই মণি দাস মধ্য হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। আধুনিক চারু শিল্পী রবীন মণ্ডল হচ্ছেন তাঁরই ভাগ্নে। ভবিষ্যৎ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে হাওড়ার ক্রিকেটের প্রাচীন ঐতিহ্য তুলে ধরার পক্ষে এই নজিরগুলি খুবই মূল্যবান।

সব শেষে সত্তরের দশকের শেষার্ধে ও আশির দশকে হাওড়া-শালিখার ক্রিকেটার অলোক ভট্টাচার্য ও সুব্রত পোড়েল রণজি ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলে জেলার সুনাম রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে টেবিল টেনিসেরও একজন নামী কোচের নাম উল্লেখ না করে থাকা যাবে না। তিনি হচ্ছেন রামকৃষ্ণপুর বিশ্বকল্যাণ সংঘের প্রাক্তন সদস্য নিমাই নিয়োগী। তিনি অনেকদিন হল লন্ডনে টেবিল টেনিসের কোচ হিসেবে নিযুক্ত আছেন। কলকাতায় কয়েক বছর আগে যে ইডেনে বিশ্ব টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট হয়ে গেল তারও তিনি অন্যতম আম্পায়ার ছিলেন।

আকাশে বিমান চালনা যেমন একটি পেশা তেমনি কারো কারো কাছে এটি আবার নেশাও হয়ে ওঠে। এ রকমই নেশা হিসেবে বিমান চালাতেন হাওড়া-বাঁটরার বিনয়কুমার দাস। পনের বছর বয়সে জাপানের অ্যাপকার অ্যান্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ হিসেবে সে দেশে যান। এ ছাড়া ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য অল্প বয়সেই ঘুরে আসেন। পরে নিজ চেষ্টায় যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কোম্পানী তৈরি করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। বিমান চালনা ছিল তাঁর পরম সখ। তাই তিনি একটি বিমানও ক্রয় করেন। 'তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ১৯৩০ সালে ভারতের আকাশে বিমান উড়িয়েছিলেন।'[১৬] আরও আনন্দের কথা তাঁরই অনুসন্ধানের ফলে ভারতের নতুন নতুন স্থানে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।'[১৭] এই দুঃসাহসী যুবক বিনয় দাস মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে (১৯৩৫) এক বিমান চালনা কৌশল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে অপর প্রতিযোগী ডি. কে. রায়ের বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষে অকালে প্রাণ হারান।[১৮] হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁরই মর্মর আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত আছে। ঠিক এমনি আর এক যুবক সুচিত্র বসু (প্রাক্তন বিধায়ক সুপ্রিয় বসুর মেজদা) মাত্র ৩৮ বছর বয়সে হরিয়ানার শানিপথে বিমান চালাতে গিয়ে ১৯শে মে ১৯৭৮ সালে এক দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারায়। বিমান চালনায় এঁরা যুবশক্তির কাছে প্রেরণা দাতা হয়ে থাকবেন।

---

১. বালি সাধারণী সভা—শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ।

২. প্রথমবারের লীগ জেতা—দরবারী দত্ত—আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪শে নভেম্বর ১৯৯০ সাল।

৩. হাওড়া জেলার ফুটবল খেলার ইতিহাস—কালী রায়।
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. ইংরেজ বণিকদের সঙ্গেই ফুটবল কলকাতায়—রূপক সাহা আনন্দবাজার পত্রিকা ৩. ৮. ৯১ সাল
৮. আমার ছেলেবেলা—আনন্দ বাজার পত্রিকা ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯২ সাল।
৯. মোহন বাগানের প্রথম একশ বছর—মানস চক্রবর্তী আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮. ১১. ৯০।
১০. হাওড়া জেলা ফুটবল খেলার ইতিহাস—কালী রায়।
১১. আনন্দবাজার পত্রিকা খেলার খবর ২১. ১. ৯১
১২. হাওড়া জেলার ফুটবলের ইতিহাস—কালী রায়।
১৩. Dossier on Howrah—Howrah Chamber of Commerce and Industry—1991.
১৪. The first Big Match at Eden—Subrata Sarkar The Statesman, 24 th Feb. 1991.
১৫. ঐ
১৬. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।
১৭. সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান—সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু।
১৮. ঐ

সাহিত্যের অধ্যায়টি আলোচনার আগে সাহিত্যের আড্ডা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন সাহিত্যের আড্ডা যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে কিভাবে রসদ যোগায় সে সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের বহু আলোচনা পাঠকদের হয়তো অজানা নেই। হাওড়া শহরেও এ রকম কয়েকটি উঁচুদরের সাহিত্যের আড্ডা ছিল যেখানে বঙ্গদেশের তদানীন্তন নামীদামী লেখকদের উপস্থিতিতে জমে উঠতো। তারই কিছু রূপরেখা এখানে দেওয়া হল।

আড্ডাও যে সাহিত্য সৃষ্টিতে কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা কথাশিল্পী শরৎ-চন্দ্রের উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ ক'রলে পাঠক তার উপকারিতা উপলব্ধি করতে পারবেন। 'রবিবাসরের' নাম আমাদের হয়তো সবারই জানা আছে। বঙ্গ সাহিত্যে শরৎচন্দ্র থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এর সঙ্গে আমৃত্যু অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার প্রস্তাব করেন যে, 'রবিবাসরে' মহিলা সদস্যা নেওয়া হোক। এখানে উল্লেখ্য, তখন নিয়ম ছিল কোন মহিলাকে রবিবাসরে সদস্যপদ দেওয়া যাবে না। কবি জলধর সেন একবার প্রস্তাব করলেন যে, রবিবাসর যখন সাহিত্যিকদের আসর তখন রাধারানীকে (কবি নরেন্দ্র দেবের স্ত্রী) বাসরের সদস্যারূপে নেওয়া হোক। উত্তরে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যটি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেছিলেন—তাতে মুস্কিল হ'বে এই যে, 'রবিবাসরে' এসে সাহিত্যিকরা আর প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে পারবেন না। মেয়েরা উপস্থিত থাকলে হয়তো লঘু হাস্য পরিহাস প্রকাশে বাধা বোধ হবে অনেকের।[১] ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'ল না। রাধারানী দেবীর অনুরোধে এ সম্বন্ধে গুরুদেবের মতামত চেয়ে পাঠানো হ'ল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে এনিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথাও বলেন। গুরুদেবের এক প্রশ্নের জবাবে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন —'রবিবাসর' ঠিক 'সাহিত্য সভা' নয়। কাব্য ও সাহিত্যের আলোচনা অবশ্য প্রতি বাসরেই হয়—কিন্তু 'আড্ডাই' প্রধান। মেয়েরা থাকলে আমাদের পক্ষে একটু সতর্ক ও আড়ষ্ট হ'য়ে আলাপ আলোচনা ক'রতে হবে। আড্ডার অবাধ স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব হবে।

গুরুদেবের রায়টিও এখানে উল্লেখ করার মত। তিনি বলেন—তোমাদের এ আড্ডায় মহিলাদের না থাকাই ভালো। কারণ তাঁরাও তোমাদের মজলিশে উপস্থিত থাকতে অসুবিধা বোধ করতে পারেন।[২]

শরৎচন্দ্রের কথায় ঐ রকমই দুটি 'আড্ডা' ছিল শালকেতে—যথা পূর্ণিমা মিলনী ও গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ। পূর্ণিমা মিলনী সে যুগে সাহিত্যিকদের একটি প্রিয় সাহিত্য সভা ছিল। প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্যিকরা মিলিত হ'তেন এই

আসরে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দুঃখের বিষয় কবির দেহান্তে ঐ সভাটি লুপ্ত হ'তে বসে। তাই বাংলা দেশের সাহিত্য জগতের সার্বজনীন 'দাদা' সু-সাহিত্যিক জলধর সেনের প্রচেষ্টায় আবার 'পূর্ণিমা মিলনীর' নিয়মিত অধিবেশন বসলো। তবে সেটা কলকাতায় নয়—গঙ্গার অপর পার শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে। জলধর সেন ছিলেন তার সভাপতি এবং প্রধান কর্মী-হিসেবে ছিলেন কবি ব্রজমোহন দাস। এই সভার প্রথম কয়েকটি অধিবেশন 'শালকে হাউসে' বসলেও পরে 'ঢ্যাং বাড়িতে'ই ঐ সমিতি দীর্ঘদিন ছিল। জলধর সেনের নামে ও কবি ব্রজমোহন দাসের সংগঠনে তদানীন্তন শালিখায় বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের নিয়মিত আসা যাওয়া ছিল। পূর্ণিমা মিলনগুলিতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির আবৃত্তি, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নলিনীকান্ত সরকার ও অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কৌতুকাভিনয়ের সুখ-স্মৃতি আজও প্রবীণদের মধ্যে সুখালাপের বস্তু-স্বরূপ। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অনন্য কণ্ঠস্বর আজও প্রাচীনদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে যেন মধুবৎ ঝঙ্কৃত হচ্ছে। বাংলা ১৩২৭ সালে (ইং ১৯২১ সালে) নতুন ক'রে শালকিয়ায় 'পূর্ণিমা মিলনী'র পঞ্চাশৎ উৎসব জলধর সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বহু নামকরা সাহিত্যিকরা 'পূর্ণিমা মিলনীর' পুনরুদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'য়ে শালিখার সাহিত্যবাসরের ক্ষেত্রে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

অপর সাহিত্য আড্ডাটি ছিল গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ। প্রথমে এই সমিতিটির নাম ছিল 'শালিখা সঙ্গীত সমাজ'। সঙ্গীত শিক্ষাই ছিল তখন সভ্যদের মূল লক্ষ্য। ক্লাবের সদস্য গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর বি. ই. কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বন্ধুরা তাঁরই নামে ১৯১২ সালে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন বাবুডাঙ্গার হারানচন্দ্র মুখাজীর বাড়িতে। সেই থেকে এই ক্লাবটি মূলতঃ সমাজসেবার উদ্দেশ্যেই কাজ ক'রতে থাকে। সমাজ সেবার ফাঁকে ফাঁকে সৌখিন নাট্যানুষ্ঠানও ক'রতে থাকে। সে যুগে সমাজের 'পাণ্ডব গৌরব' গীতিনাট্যটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনীত হত। কলকাতার কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে এই 'পাণ্ডব গৌরব' পালাটি অভিনয়ের সময় প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ি ছিলেন দর্শকদের মধ্যে একজন। অভিনয়ান্তে তিনি নাট্যব্যবস্থাপক হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বন্ধুপ্রেমে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজের নামের সঙ্গে সাহিত্য কথাটি যুক্ত হল। অবশ্য কোন্ সালে এই সংযোজন ঘটেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ক্লাবের সাহিত্য প্রেমিক মুষ্টিমেয় সদস্যের বিশেষ করে ব্রজমোহন দাস, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের (মণি) ঐকান্তিক আগ্রহে সাহিত্যবাসরের বৈঠক বসতে শুরু করে। পরে কবি ব্রজমোহন দাসের প্রচেষ্টায় সাহিত্য জগতের সার্বজনীন 'দাদা' জলধর সেনের সভাপতিত্বে ও 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্যে সমাজের সাহিত্যবাসরগুলি বেশ জমে উঠতে লাগল। জলধর সেনের আগমনে

সমাজের খ্যাতি বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে।
সমাজের বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে বাংলাদেশের সমসাময়িক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই সম্মেলনের শোভাবর্ধন করতেন। ১৯২১ সালের সমাজের বার্ষিক সম্মেলন বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন এক বিদুষী মহিলা। এই নিয়ে বেশ সোরগোল পড়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী সেদিনের সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তখনকার দিনে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি প্রকাশ্য একটি সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তদানীন্তন The Englishman পত্রিকার মন্তব্যটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পত্রিকাটি লিখছে—This is the first occasion on which a distinguished lady literateur has been elected as President of a public literary gathering (dated 30. 3. 1921). এই বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনটি হয়েছিল বাবুডাঙ্গার হাজরা বাড়ির মাঠেতে (বর্তমান শ্রীরাম ঢ্যাং রোড)।
গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ কর্তৃক আয়োজিত পূর্ণিমা মিলন ও সাহিত্য সভাগুলিতে তদানীন্তন কলকাতার একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া সব নাম করা সাহিত্যিকই যোগ দিয়েছিলেন। এই সাহিত্য বাসরগুলিতে আজকের মত শ্রোতারও অভাব হত না। তার প্রমাণ হিসেবে The Statesman কাগজের একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য তুলে ধরা হল। গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা লিখছে—One is somewhat startled to find Sir Debaprosad Sarbadhikary presiding over what a correspondent describes as a 'monstrous' meeting in Salkia last week. One's feeling of alarm, however, speedily disappears when one reads and discovers that the proceedings were entirely harmonious and unexceptionable. The occasion was the seventh anniversary of the Literary Association of the Salkia Gobardhan Sangit Samaj (dated 14. 3. 1919).

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাওড়ায় খুব কমই এসেছিলেন। বিশেষ করে কোন জনসভায় তাঁর বক্তৃতা করার সংবাদ তেমন জানা যায় না। জলধর সেনের চেষ্টায় গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে তাঁকে একবার আনবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কবির বার্ধক্যের কথা চিন্তা করে উদ্যোক্তারা সেই ইচ্ছা পূরণ করতে (১৯৩৯-৪০) অসমর্থ হন। তবে যতদূর জানা যায় কবি একবারই প্রকাশ্য জনসমাজে হাওড়ায় একটি সভায় যোগদান করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভাটি ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিপান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হাওড়াবাসীর বিশেষ করে শিবপুরের বাড়িতে যে তাঁর জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে তা অনেকেরই জানা আছে। রাজনৈতিক জীবনে তিনি একদা হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদে পর্যন্ত আসীন হ'য়ে কাজ

ক'রে গেছেন। শরৎচন্দ্রের অনুরাগীরা তাঁর তিপান্ন বছর পূর্তি উৎসব যেমন কলকাতায় করেছিলেন তেমনি হাওড়া শহরের একটি পাঠাগারও কিছুদিন পরেই অনুরূপ একটি জন্মজয়ন্তী সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই সভাটি হয়েছিল বর্তমান হাওড়া 'টাউন হলে'।

শরৎ সম্বর্ধনায় উক্ত সভাটিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁর 'শরৎচন্দ্রের টুকরা কথা' পুস্তকে লিখেছেন—

"আমাদের জয়ন্তীর কয়েকদিন পরেই বোধ হয় হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার কোন এক লাইব্রেরীর* পক্ষ থেকে আপনার সাহিত্য সম্পর্কে এক আলোচনা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাকে কর্তৃপক্ষরা নিমন্ত্রণ করেন। আমি যাই।...সভা হচ্ছে—বিজয়চন্দ্র মজুমদার মশাই প্রায় আধ ঘণ্টা আপনার সাহিত্যের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।...... তারপর রবীন্দ্রনাথও প্রায় মিনিট পনেরো বললেন।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সেদিনের সেই আলোচনার বিষয়বস্তু কোন সংবাদপত্রে তো স্থান পায়ই নি এমনকি সভার বিবরণীও কেউ লিখে রাখেনি। অবিনাশবাবু তাই আক্ষেপ করে লিখেছেন—"এমনি দুঃখের কথা সেদিনের এই দুটি ভাষণই কেউ লিখে রাখেন নি। পরে আমি অনেক খোঁজ করেছি। শুনলাম লেখা হয়নি।"

এই সভার এক বছর আগে অর্থাৎ ১৩৩৪ সালে ৩১ শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের বাহান্নতম জন্মজয়ন্তীও পালিত হয় হাওড়ায়। উদ্যোক্তা ছিলেন শিবপুর সাহিত্য সংসদ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন—সুবোধ রায় (সম্পাদক), কবি জগদ্বন্ধু মিত্র, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ, অরূপ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হল বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী, শরৎ জন্মশতবার্ষিকীতে সম্পাদক অশোক কুণ্ডু তাই লিখছেন—'এই উপলক্ষে 'উপহার' নামক একটি বত্রিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা শরৎচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হয়। এই পুস্তিকায় শরৎ প্রশস্তি করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।......শিবপুর সাহিত্য সংসদ প্রবর্তিত প্রথম শরৎ জন্মজয়ন্তী পালনকে কেন্দ্র করে আজও বাঙালী শরৎ জন্মজয়ন্তী পালন করে আসছে।'

গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সভাপতি হিসেবে ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন মশায়। তিনি এই পদে দীর্ঘদিন ছিলেন—১৩২৩—১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। জলধরবাবু শালকের লোক না হয়েও কি করে এখানে এসে এতদিন সভাপতি থেকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আত্মবৎ মনে করতেন তা সত্যি ভাববার কথা। শুধু জলধরবাবুই নয়—কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'চৈতন্য লাইব্রেরী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুপণ্ডিত ও শালিখাবাসী ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রতিষ্ঠানটি-কে সুসংগঠিত করার কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন এবং এর সম্পাদকও

* পাঠাগারটির নাম ছিল— শিবপুর ইনস্টিটিউশন।

হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক জলধরবাবুর নাম তখন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে। তাঁরই নামে বহু সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিয়মিত পদধূলি পড়তো এই শালকেতে। সমাজের বিশিষ্ট সদস্য কবি ব্রজমোহন দাসের সঙ্গে জলধর সেন এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। শালিখাবাসীও জলধরবাবুকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে ভোলেনি। জলধরবাবুর পঁচাত্তর বছর পূর্তি উৎসবে এক বিরাট সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। এই সম্বর্ধনার পূর্ণ দায়িত্ব পড়েছিল সমাজের সদস্য কবি ব্রজমোহন দাসের ওপর। এই সম্বর্ধনা চলেছিল তিন দিন ধরে। প্রথম দিনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালের ১৯শে আগষ্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পরের দিন ২০শে আগষ্ট দ্বিতীয় দিনের সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শালিখার 'নাট্যপাঠে' (বর্তমান পিকাডিলি সিনেমায়)। সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল ২১শে আগষ্টে কলকাতার এলবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউস)। সভাপতি ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই নিখিল বঙ্গ জলধর সম্বর্ধনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শালকের ব্রজমোহন দাস।[৩] এই সম্বর্ধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখা ও সম্বর্ধনা পত্রগুলি সমন্বিত করে কবিতা ও প্রবন্ধ দিয়ে 'জলধর কথা' নামে ব্রজমোহন দাস একটি অমূল্য সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন। ব্রজমোহনবাবুর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে বিয়ের কনে, বেইমান, আহরিকা ও মাধুকরী ইত্যাদি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্রজমোহন দাসের সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কবি ব্রজমোহনের প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে কবি শান্তিনিকেতনে আশ্রমের শিশুদের শিক্ষাদানের কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। উত্তরে ব্রজমোহন কবিকে লিখেছিলেন—সাহিত্যকে পেশা করতে চাইনা। গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ ছাড়াও ব্রজমোহন দাসের ত্রিপুরা রায় লেনস্থ বাড়িতে সাহিত্যের মজলিস বসতো। সঙ্গে চলতো দাবা, তাস এবং পাশা খেলাও। এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিবপুরের বাড়ি থেকে প্রায়ই আসতেন। এই ব্রজমোহন দাসই শালকের সে যুগের একমাত্র 'রবিবাসরের' সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে কবিগুরু 'রবিবাসরের' সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলে ১৩৪০ সালের ২৫শে আশ্বিন শরৎচন্দ্রের ষষ্টিতম সাম্বৎসরিক জন্মদিনে সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে কলকাতায় এসে তিনি শরৎচন্দ্রকে আন্তরিকভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। কবির অনুরোধেই এটি করা হয়েছিল। সেই বছরই ৩০শে ফাল্গুন (১৩৪০) শান্তিনিকেতনে তিনি রবিবাসরের অধিবেশন আহ্বান করেন। উত্তরায়ণ ভবনে সকাল আটটায় অধিবেশন বসে। আগের দিন কলকাতা থেকে ৩৮ জনের একটি দল সংরক্ষিত রেলের কামরায় শান্তিনিকেতনে

পৌঁছায়। পাঠক জেনে পুলকিত হবেন যে ঐ দলের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন ছিলেন হাওড়ার বাসিন্দা কবি ব্রজমোহন দাস।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে জেলায় সাহিত্য সভার প্রচলন করেছিলেন সাঁত্রাগাছির অঞ্চলের বিদগ্ধ মুষ্টিমেয় অধিবাসী। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আগষ্ট ১৮৫২ সালে।[৪] আর তাঁর সম্পাদক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও বিত্তশালী পুরুষ কেদারনাথ ভট্টাচার্য।[৫] তাঁরই স্মৃতিতে 'কেদারনাথ ইনষ্টিটিউশন'। এই সব সাহিত্য সভার কিছু কিছু সংবাদ তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট সংবাদপত্র ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সম্ভবত এই সাহিত্য সভাটি জেলার আদি সাহিত্য সভা। পৃথিবীর ইতিহাস রচয়িতা দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক পরিচালিত সাহিত্য সভাও সে যুগে খ্যাতিলাভ করেছিল। কদমতলার পারিজাত সমিতি, শিবপুর সাহিত্য সংসদ প্রভৃতিরও বিশেষ নাম ছিল। পুরাতন প্রসঙ্গ-এর লেখক বিপিন গুপ্তের রামকৃষ্ণপুরের বাড়িতেও এরকম সাহিত্য সভা বসতো। তাতে স্বয়ং শরৎচন্দ্রও প্রায়ই যোগ দিতেন। তাই শরৎচন্দ্র তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঢাকাতে চিঠি লিখছেন—ভাই চারু,..... পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারি না। তবে এ-ও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশি দিন বাকি নেই। পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন।...এই মাত্র এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্তর শ্রাদ্ধ সভায় যাবার আমন্ত্রণ পত্র। শিবপুরের কত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি।[৬] শিবপুরে 'হাওড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ' নামে একটি নামী সাহিত্য সভা ছিল। এই সভায় নিয়মিত আসতেন সাহিত্যিক স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'নিরক্ষর' প্রসিদ্ধ লেখক চরণদাস ঘোষ ও, শিশুসাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। স্মরণ করা যেতে পারে যে বিভূতি বাবু কয়েক বছর তাঁর মাতুলালয়ে (শিবপুর) এসে বাস করেছিলেন। ডঃ নিমাই সাধন বসু (প্রাঃ উপাচার্য, বিশ্বভারতী) ও হরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিলেন এই সভার মূল সংগঠক। সাঁত্রাগাছিতে বারীন মৈত্রের পরিচালনায় 'হাওড়া সাংস্কৃতিকী' নামেও একটি সাহিত্য সভা বেশ কয়েক বছর চলেছিল।

শিবপুরে 'সাহিত্য সংসদ' নামে একটি বিখ্যাত সাহিত্য সভা ছিল। এই প্রাচীন সাহিত্য সভাটির উল্লেখ কদাচিৎ শুনতে বা লেখাতে দেখতে পাওয়া যায়। এই সাহিত্য সংসদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং 'শিবপুর কাহিনী'র লেখক অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'স্মৃতির অর্ঘ্য' গ্রন্থে বসন্তকুমার পাল লিখছেন—শিবপুরে সাহিত্য আলোচনার এই প্রতিষ্ঠানটি (সাহিত্য সংসদ) বাঙ্গলা ১৩২১ সালে ১৭-ই ফাল্গুন দোলপূর্ণিমার দিন স্থাপিত হয়। অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রাণ। এর প্রতিষ্ঠাকল্পে কতিপয় সাহিত্যসেবী ছিলেন—অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার, যুগলকিশোর মজুমদার, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার ও কবি গিরিজাভূষণ

বসু। প্রথম অধিবেশন হয় বাজে শিবপুর নিবাসী অনাথনাথ চৌধুরীর বাড়িতে। অন্নদাবাবু ও যুগলকিশোর মজুমদার বরাবর এর সম্পাদক ছিলেন। দু-এক মাস অন্তর সভা হত। প্রবন্ধ, কবিতা ও সঙ্গীত হত। সভায় আসতেন জলধর সেন, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৩২৪ সালে ১২-ই অগ্রহায়ণ তারিখের অধিবেশনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যে দুর্নীতি' নামীয় প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানেও হাওড়া পিছপাও ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বাদশ অধিবেশন হয় হাওড়াতে। তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সালটি ছিল ১৩২৬, বৈশাখ মাস।

এরই প্রায় এক দশক পর অর্থাৎ ১৩৩৫ সালে (ইংরেজী ১৯২৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সমস্ত ভার নিয়েছিলেন হাওড়ার মাজু গ্রামের কতিপয় বিদগ্ধ ও বিত্তশালী মানুষ। হাওড়া জেলার অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রাম থাকা সত্ত্বেও মাজুতেই একমাত্র বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। এতেই মাজু গ্রামের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক চেতনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিও হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ মাজু গ্রামেরই সুসন্তান ডঃ সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বহু ভাষাবিদ এই সুবোধবাবু ছিলেন ভাষাবিদ্ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়েরই সহপাঠী। তিনি কালে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও হয়েছিলেন।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশন নানা দিক থেকেই খুব উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন। সাহিত্য শাখার সভাপতি পদে এসেছিলেন ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ইতিহাস শাখার সভাপতির পদে আসীন ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। দর্শন শাখার সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. ডি. এম. এস. সি. এফ. জেড. এস.। আর এই সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন—মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য।*

মাজুর এই সাহিত্য সভা আরও গুরুত্বলাভ করেছিল স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে ১৯২৯ সালে ইষ্টারের ছুটিতে রংপুরে (অধুনা বাংলাদেশ) বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীতে শরৎচন্দ্র সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন এবং ব্যঙ্গোক্তি করে ভাষণ দিয়েছিলেন যুবকদের সামনে। উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক কাজের উন্মাদনা জাগানো। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে

---

* এই সমস্ত নথীপত্র মাজু পাঠাগারের পুরানো ফাইল দেখতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক জহরলাল বেরা।

তিনি সেদিন যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'সত্য মনে করে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি। পুরস্কার তার তোলা রইল। এই কংগ্রেস মণ্ডপেই দু'দিন পরে তিরস্কারের বান ডেকে যাবে। কিন্তু আমি তখন হাওড়ার নিভৃত-পল্লী মাজুতে ইত্যাদি।' বলাবাহুল্য, শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি সেবারের মাজুতে বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনে যেন চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল। সম্মেলন স্থান ছিল—মাজু আর. এন. বসু স্কুল মাঠ।

হাওড়ার সাহিত্য প্রয়াসী ও হাওড়া বার্তা অফিসেও প্রায় তিরিশ বছর ধরে এখনও সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

এইভাবেই হাওড়ায় সাহিত্যের আড্ডায় স্থানীয় রূপকল্প থেকে বৃহত্তর সাহিত্য জগৎ গড়ে তুলতে সহায়তা করে যাচ্ছে। ফলে অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার হাওড়ার মাটিতে জন্মলাভ করে বঙ্গ সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেছেন বা করছেন।

---

১. রবিবাসর—সম্পাদনা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. ঐ
৩. জলধর সেনের আত্মজীবনী—লিপিকার নরেন্দ্রনাথ বসু।
৪. হাওড়া শহর কত পুরাতন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫. ঐ
৬. শরৎ স্মৃতি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী কার্তিক—১৩৪৫।

যাঁরা পুরনো সিনেট হল দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে উঁচু দেওয়ালের বিরাট বিরাট সোনার ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন নামী লোকেদের তৈল চিত্রগুলির কথা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ও কলকাতা টাউন হলের দেওয়ালেও ঐ রকম নামী ও দামী ব্যক্তিদের ছবি ঝুলতে দেখা যাবে। দূরে থেকে এক একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয় ছবিগুলির জীবন্তরূপ দেখে। মনে মনে শিল্পীদের কাজকে তারিফ করে হাসি খুশি মনে হল থেকে বেরিয়ে আসা হয়। কজনই বা আমরা ছবির তলায় যে আবছা নামটি আলো-ছায়াতে লুকিয়ে আছে তা পড়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। যদি চেষ্টা করতাম তবে দেখতে পেতাম—ইংরেজিতে লেখা আছে **Bamapada Banerjee** নামে একটি নাম।

এবার যাওয়া যাক খোদ লণ্ডন শহরে। লণ্ডনের বহুবিধ দর্শনীয় জিনিষের মতই একজন ভারতীয়ের পক্ষে 'ইণ্ডিয়া হাউস' অবশ্যই দ্রষ্টব্য স্থান। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বহুস্মৃতি বিজরিত এই ইণ্ডিয়া হাউসের কথা আমরা ভুলতে পারব না। সেখানেও যদি ঘুরে দেখেন তাতেও দেখতে পাওয়া যাবে দেওয়ালে দেওয়ালে ভারতীয় চিত্রকরদের ওরিয়েণ্টাল আর্টের অপরূপ চিত্রসমূহ যেমন—সুধাংশু চৌধুরীর অংকিত আনারকলি, বনদেবী, চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর নারী প্রহরিণী-বৃন্দা ছাড়াও পুরু ও আলেকজাণ্ডার, মহারাজ অশোকের কন্যা বোধিদ্রুম নিয়ে সিংহলে যাচ্ছেন, সম্রাট আকবর ফতেপুর শিকরীর নকসা দেখছেন প্রভৃতি চিত্রসমূহ।

এবারে আসা যাক ভারতীয় যাদুঘরে। সেখানেও দেখতে পাওয়া যাবে নামী ও দামী ব্যক্তিদের বড় বড় প্রমাণ মাপের তৈল চিত্র। ছবিগুলির তলায় কষ্ট করে তাকালে দেখা যাবে কোন কোন ছবিতে লেখা আছে বিষ্ণুপদ রায় চৌধুরী। এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাওড়ার শিল্পীদের বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু এঁদের পরিচয় তেমন বিশেষভাবে আমরা তলিয়ে দেখি না বা দেখার চেষ্টাও করি না। অথচ এঁদের অতীত কাজের সাফল্যের জন্য উত্তরাধি-কারী হিসেবে আমাদের গর্বের শেষ নেই। তাঁদের পরিচয় একে একে দেওয়া যাক।

সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের সন্তান বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম হুগলী জেলার শিমলাগড় গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই আঁকার খুব ঝোঁক ছিল। তাই অংকের খাতায় অংক কষার বদলে ব্যঙ্গ ছবিই আঁকতেন। একবার গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শনে তৎকালীন বিশিষ্ট ইংরেজি লেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ গ্রামে যান। তাঁর

চেহারাটি বিরাট ভুঁড়ি সর্বস্ব ছিল। ছাত্র বামাপদ তাঁকে দেখে স্কুলে বসেই একটি ব্যঙ্গ চিত্র এঁকে অনেকের ভয় মিশ্রিত প্রশংসা লাভে সক্ষম হয়েছিল। পরে গ্রাম্য স্কুল ছেড়ে কলকাতার বৌবাজারের সরকারী আর্ট স্কুলে (বসুমতী পত্রিকার ঠিক পাশের বাড়িতে) এসে ভর্তি হন। তখন থেকে তিনি শালিখা বাবুডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। প্রতিকৃতি অঙ্কনে বামাপদবাবুর এক সহজাত ব্যুৎপত্তি ছিল। তাই তিনি প্রখ্যাত জার্মান চিত্রশিল্পী ডাবলু. সি. বেকারের কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে নাম লেখান। অবশ্য এ ব্যাপারে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ লক সাহেবের সাহায্যের কথাও স্বীকার করতে হয়। পাশ্চাত্ত্য শিল্পীর কাছে শিক্ষা-লাভ করলেও বামাপদ কিন্তু ভারতীয় শিল্পরীতি ত্যাগ করেননি।

প্রতিকৃতি অঙ্কনে ছবিকে এমনই মাধুর্যপূর্ণ ক'রে তুলতেন যা বামাপদকে ক'রে তুলছিল এক অতুলনীয় পোর্ট্রেট শিল্পী। ১৮৭৯ সালের জুন মাস। বামাপদের জীবনে খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত। তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের সভাপতিত্বে ও ছোট লাট স্যার এ্যাসলি ইডেনের সহঃ সভাপতিত্বে বৌবাজারের সরকারী আর্ট স্কুলে এক চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান বসুমতী বিল্ডিং-এ সেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই প্রদর্শনীতে সমকালীন ভারতের বহু বিদেশী ও দেশী চিত্রকরগণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আনন্দের ও গৌরবের কথা যে, জীবনে প্রথম প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে বামাপদের **Jugglar and Monkey** তৈলচিত্রটি লর্ড লিটন ও স্যার এ্যাসলি ইডেনের বিচারে প্রথম স্থান লাভ ক'রে স্বর্ণপদক পেল। চিত্র অঙ্কনে বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজ রাজপুরুষের হাত থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হলেন। এর পরই বামাপদকে জীবন ধারণের জন্য শিল্পকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। অর্থোপার্জনের আশায় বামাপদকে ঘুরে বেড়াতে হয় বাংলার বাইরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায়। বহু রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তৈল চিত্র অঙ্কন ক'রে শিল্পী বামাপদ অর্থ ও যশ দুইই লাভ করলেন। কিন্তু পিতৃবিয়োগের সংবাদ তাঁকে আবার বঙ্গদেশে ফিরিয়ে আনল। বাংলার বহু মনীষীর যথা ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার আশুতোষ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের জীবন্ত তৈলচিত্র অঙ্কনে বঙ্গদেশে বামাপদের শিল্পী পরিচিতি জনে জনে কীর্তিত হ'তে থাকে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের শতবর্ষ ১৯৯১ সালে পালিত হয়ে গেল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে অনেক সময়োপযোগী প্রবন্ধ ও রচনাদিও প্রকাশ করে দেশবাসী বিদ্যাসাগর, করুণাসাগর ও দয়ার সাগরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি আঁকার ব্যাপারে দেশ পত্রিকায় (২৭ জুলাই, ১৯৯১ সাল) একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে বঙ্গবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হয়ে আছেন। এই পত্রিকায় যে কটি প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল তার মধ্যে বিদ্যা-সাগরের ছবি আমরা যা বিভিন্ন বইতে ও স্থানে দেখতে পাই সে সম্বন্ধে লেখক

কমল সরকার এক অনবদ্য ইতিহাসনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন ছবি দিয়ে। বলা বাহুল, বিদ্যাসাগরের প্রথম তৈল চিত্র যিনি আঁকেন তিনি কোন দেশী শিল্পী নন। তিনি ছিলেন একজন বিদেশী। তাঁর পুরো নাম বি. হাডসন। তিনি কলকাতায় পাইকপাড়া রাজ বাড়ির একজন বেতনভুক চিত্রকর ছিলেন। 'বিদ্যাসাগর' জীবনী-কার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বদাই সেখানে (রাজবাড়িতে) গতিবিধি ছিল।[১] এই হাডসন সাহেবের উৎসাহেই বিদ্যাসাগর ছবি আঁকার জন্য অত ব্যস্ততার মধ্যেও সিটিং-এর সময় দিতেন। সেই ছবিটিতে সময়কাল না থাকলেও কমল সরকার লিখছেন—বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, হাডসন ছবিটি এঁকেছিলেন ১৮৫১ সালের শেষ দিকে কিংবা ১৮৫২ সালের গোড়ায়। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং তাঁর বয়স একত্রিশ অথবা বত্রিশ বছর। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন তিনি।[২] উল্লেখ্য, হাডসন সাহেব বিদ্যাসাগরের এই ছবির জন্য কোন পরিশ্রমিক নেননি শত অনুরোধ সত্ত্বেও। এর পরও কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের তৈলচিত্র অঙ্কন করেছেন যাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফণী সেন। তাঁর আঁকা চিত্রটি সংস্কৃত কলেজে উন্মোচন করেন ছোটলাট স্যারজন উডবার্ন (২৮ মার্চ ১৮৯৯)।[৩]

Calcutta, 29 July 1890.

Baboo Haraprasada Banerjee has painted a portrait of me which is well executed. My friends who have seen it consider it a very good piece of work and I am also very well satisfied with it.

Iswarchandra Sharma

কিন্তু হাডসনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সিটিং দিয়ে তাঁর তৈলচিত্র একমাত্র যে দেশীয় শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন হাওড়া শালিখার অধিবাসী

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বামাপদ অংকিত নিজ তৈলচিত্রটি দেখে স্বয়ং বিদ্যাসাগর অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণা দিতে গেলে শিল্পী বিনয়ের সঙ্গে তা নিতে অস্বীকার করেন। এই ছবিটি যে ১৮৯০ সালে আঁকা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ ঐ বছরই তিনি বামাপদকে একটি প্রশংসা সূচক পরিচয় পত্র দিয়ে জোড়াসাঁকোর জমিদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে পাঠান। উদ্দেশ্য, তাঁরা যাতে শিল্পীকে দিয়ে তাঁদের তৈলচিত্র আঁকান। বিদ্যাসাগরের নিজের হাতের লেখা চিঠিটির হুবহু নকল ছেপে দেওয়া হল।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বামাপদকে ডেকে তাঁর কাশ্মীরী-জোড়া শাল, (তখনকার দিনে জোড়া শাল ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল) 'বর্ণপরিচয় লেখার নিজের দোয়াত ও তাঁর ব্যবহারের পাকানো কাঠের ছড়িখানি উপহার দেন।



আজও উত্তরপাড়ায় বামাপদপুত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উহা সযত্নে রক্ষিত আছে। যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে সেই সব জিনিষের ছবি তুলে আনি। বামাপদ-র দুই কন্যা বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও লতিকা চটোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় (৫।৭।১৯৫২) একই কথা লিখেছেন—'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। বামাপদবাবু প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন। তাঁহার ও তদীয় জননীর যে তৈলচিত্র তিনি করিয়াছিলেন তাহার জন্য কোনও পারিশ্রমিক তিনি গ্রহণ করেন নাই।' শিল্পীর জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্য যা অর্থের অংকে বিচার করা যাবে না।

বামাপদ অংকিত বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাগড়ী মাথায় প্রতিকৃতিটি নিয়েও কাঁঠালপাড়ায় এক মজার ঘটনা ঘটে। একদিন বংকিমচন্দ্রের বেয়াই তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বাড়িতে ঢুকেই তিনি দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে নীচে পাশের ঘরে বংকিমের পাগড়ী মাথায় আমাদের চির পরিচিত তৈল চিত্রটি দেখে

বলেন—'এত বেলায় সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছেন, বেয়াই মশায়?' পরক্ষণেই আসল বেয়াইকে সামনে দেখে তাঁর ভুল ভাঙে। এই বিখ্যাত ছবিটি যেদিন বাড়ির দেওয়ালে ট্যাঙানো হয় সেদিনও আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির পোষা কুকুরটি ছবিটির দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে দেওয়ালে উঠবার চেষ্টা করে। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলেছিলেন—'আসল মনিব ছেড়ে ছবির মনিবের প্রেমে পড়েছে কুকুরটি।'[৩] বঙ্কিমচন্দ্র নিজের পাগড়ীটি উপহারস্বরূপ বামাপদকে দান করেছিলেন। বামাপদপুত্র যোগেশবাবু আমাকে বলেন যে অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি পাগড়ীটিকে রক্ষা করতে পারেননি যেমন পেরেছেন বিদ্যাসাগরের স্মৃতিগুলি রাখতে।

শিল্পী বামাপদ কেবলমাত্র প্রতিকৃতি অঙ্কনেই নিজেকে সীমিত রাখলেন না। প্রাচীন ভারতের রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকে তাঁর চিত্রে জীবন্ত রূপ দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। বহুবর্ণ চিত্রিত এই ছবিগুলি জার্মানী থেকে ছাপিয়ে এনে এদেশে তিনি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কারবার করার কাজে উদ্যোগী হন। একমাত্র বোম্বাইয়ের রাজা রবি বর্মা ছাড়া একাজ তখনকার দিনে আর কেউ করতে সাহসী হননি। অবশ্য বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একাজে উদ্যোগী হবার প্রধান উৎসস্বরূপ ছিলেন।

১৮৯০ সালে জার্মানী থেকে ছেপে আনবার জন্য অর্জুন ও উর্বশী এবং 'উত্তরার নিকট অভিমন্যুর বিদায়' এই দুটি ছবি প্রথম পাঠান হয়। পরে আরও বিখ্যাত ছবি যেমন শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসা, শান্তনু ও গঙ্গা, কৈকেয়ী ও মন্থরা, নল-দময়ন্তী প্রভৃতি ছবি জার্মানী থেকে ছেপে আসে। আজও পুরানো আমলের বাড়িতে এই ছবিগুলি জীর্ণ অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলতে দেখা যাবে। কিন্তু শিল্পীর ব্যবসাভাগ্য একান্তই মন্দ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা তখন বেজে উঠেছে। শিল্পীর অর্ডার দেওয়া ছাপানো কুড়ি হাজার টাকার বেশি ছবি জার্মানী থেকে জাহাজে আসছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ Torpedo জাহাজটি শত্রুপক্ষের গোলাতে সমুদ্রে ডুবে যায়। এই সংবাদে শিল্পী ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েন। এরপরে শিল্পী তাঁর নিজের একটি চিত্র প্রদর্শনী করেন কলকাতা ভবানীপুরের পোড়াবাজার অঞ্চলে (বর্তমান আসলী সোনা চাঁদীর দোকান)। সেখানেও এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাঁর ভীষণ ক্ষতি হয়। বিধাতা বুঝি তাঁকে কেবল সম্মান লাভের জন্যই জগতে পাঠিয়েছিলেন—অর্থলাভ ক'রে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করা তাঁর আর জীবনে সইল না। বামাপদবাবুর ঐসব পৌরাণিক চিত্রগুলি শুধু ভারতেই নয় বিদেশীদের কাছেও সমাদৃত হ'ত। তখনকার দিনে সুইডেন থেকে দেয়াশলাই এদেশে বিক্রী হত। ঐ বিদেশী কোম্পানী দেয়াশেলাইয়ের ওপর বামাপদ বাবুর আঁকা ছবি দিয়ে তার শোভাবর্ধন করতো। দুর্বাসা ও শকুন্তলা ছবিটির একটি ইতিহাস আছে। শিল্পী বামাপদ নিজেই দুর্বাশার সাজে সজ্জিত হ'য়ে তার একটি ফটো তোলেন। পরে তিনি সেটিকে হুবহু আঁকেন। আর

নিজ-স্ত্রীকে তিনি সামনে বসিয়ে শকুন্তলার ছবিটি এঁকেছিলেন। শিল্পীর বস্তু-নিষ্ঠার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেবল চিত্র শিল্পী হিসেবেই নয়—বামাপদবাবু ছিলেন একুনে সাহিত্য-রসিক ও হাস্যরসিক বৈঠকী লোক। শালকিয়ার 'নাট্যপীঠে' তাঁর যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সভাপতির ভাষণে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় রায় জলধর সেন বাহাদুর বলেছিলেন—"বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে বাঙ্গালার সেকেলের মজলিশী লোকের অভাব হইল। প্রকৃতই বামাপদবাবুর শিল্প কীর্তি ধরে রাখবার জন্যই একটি সুযোগ্য স্থান কলকাতায় হওয়া উচিত।"[৪] সে প্রস্তাব আজও অপূর্ণই রয়ে গেছে।

অপর শিল্পীর নাম সুধাংশু শেখর চৌধুরী। প্রথম জীবনে শালকিয়ার বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিশে তুলির বদলে পিস্তল ধরেছিলেন। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য অনেকের মত যুবক সুধাংশুও নিজেকে সেই খাতে বহাতে চেয়েছিল। সুধাংশুবাবুর জীবনে আর্টশিক্ষার প্রথম গুরু ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে ক্ষিতীন্দ্রনাথের সুপারিশেই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র নাথের কাছে আর্টের শিক্ষা গ্রহণ করেন। সুধাংশুবাবুর বন্ধু বিশিষ্ট শিল্পী ও বিপ্লবীযুগের অন্যতম সৈনিক উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৮০ সালে জুলাই মাস নাগাদ যখন সাক্ষাৎ করি তখন জানতে পারি তিনিও শালকেতে নিয়মিত আসতেন। তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, সুধাংশু শেখর ও তিনি দু'জনেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বন্ধু সুধাংশুর সান্নিধ্যই তাঁকে বিপ্লবীকর্মে যুক্ত হ'তে উৎসাহ দিয়েছিল। সেই থেকে তিনিও শালকের বিপ্লবীদলের নেতা বিজনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে জড়িত হ'য়ে পড়েন। সুধাংশুই তাঁকে এই কাজে টেনে আনেন। দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় (১৯২৫) যুবক সুধাংশুও জড়িত ছিল। বিপ্লবাত্মক কাজে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য সুধাংশুকে পাঠান হ'ল ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন শহরে। পরিকল্পনা ছিল বিপ্লবী গুরু রাসবিহারী বসুর সহায়তায় অস্ত্র সংগ্রহে সুবিধা হবে ব'লে। কিন্তু ইংরেজ গোয়েন্দার নজর এড়াতে পারা গেল না। সেখানেই গ্রেপ্তার হ'ল সুধাংশু। বিচারে ১৮ মাসের জেল হ'ল। এর পরই সুধাংশুর জীবনের মোড় ঘোরে। তিনি বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংস্পর্শ চিরতরে ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার দু'তিন বছরের মধ্যেই একটি সুযোগও তাঁর কাছে আসে। ১৯২৮ সাল। ভারত সরকার লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সাজাবার জন্য ভারতীয় শিল্পীদের এক প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল ছিলেন তখন ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। তাঁরই আমন্ত্রণে ১৯২৯ সালে রণদা উকিল, সুধাংশুশেখর চৌধুরী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বর্মন ও ললিতমোহন সেন প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ ইংলণ্ডে যান। বলা হয়, সেখানে গিয়ে Royal College of Art-এর অধ্যক্ষ W. Rothenstien-এর অধ্যাপনায় ভিত্তি

চিত্র (Mural Decoration) শিক্ষা করবে। এ ধরনের শিক্ষানবিশের ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পীদের যোগ্যতার প্রতি একটু কটাক্ষ করার ভাবই ফুটে উঠছে সন্দেহ নেই।

বিলেতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা Times লিখছে—Four Indian Artists (Messrs L. M. Sen, D. K. Deb Barm, Sudhanshu Chowdhury and Ranada Ukil) have arrived in London for training to take part in the decoration of the New India House. Before taking up the work they will undergo a year's training at the Royal College of Art, South Kensington, under Prof. W. Rothenstien and spend six months in further study in Italy (25th Sept 1929)[৫]

কিন্তু আসল ব্যাপারটি মোটেই তা নয়। সুধাংশু চৌধুরী শিল্পী অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা পড়লেই Times এর মন্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হ'বে।

চিঠিতে লিখছেন ঃ

21, Cromwell Rd, London
5. 10. 29.

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং,

আমাদের কলেজ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর খুলছে। Rothenstien প্রথম দিন আমাদের সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিচয় করে দিয়ে বলেছেন—এই চারজন ভারতের শিল্পী আমাদের কলেজে এসেছেন এবং এঁরা মাত্র এক বছর এখানে থাকবেন ' তারপর India House এ কাজ করবেন। আশা করি তোমরা এঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করবে এবং তোমাদের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে Eastern এবং Western Arts সম্পর্কের আরও গাঢ় হবে। হয়তো ভবিষ্যতে একটা নূতন School of Decoration গড়ে উঠতে পারে এই থেকে। তারপর আমাদের চারজনকে বললেন যে, তোমরা এখানে Artist হিসেবে এসেছো, Student হিসেবে নয়। তোমাদের কোন রকম ভয় নাই National Tradition নষ্ট হবার। তোমরা এসেছো Technique আয়ত্ত করতে Drawing শিখতে নয়। কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মত তোমাদের কোন নিয়মকানুন মানতে হবে না।[৬]

সুধাংশু চৌধুরী ইণ্ডিয়া হাউসের Exhibition Room এ দু'খানি ছবি আঁকেন একটি আনারকলি অপরটি বনদেবী। ইণ্ডিয়া হাউসের গম্বুজে আঁকেন চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর নারী প্রহরিণীবৃন্দা…। সুধাংশুবাবুর চিত্রগুলি ইংরেজদের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রশংসিত হয়। India House থেকে Secretary for the High Commissioner যে চিঠি দেন তা তদানীন্তন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত প্রসিদ্ধ 'বিচিত্রা' পত্রিকা ১৩৩৮ সনে ছাপা হয়েছিল। চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

Dear Mr. Chowdhury,

You will be interested to know that His Majesty the King Emperor and Her Majesty the Queen Empress honoured India House on the 12th March with an informal visit and personally inspected your work and that of your colleagues.

এ ছাড়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতেও সুধাংশুবাবুর ছবির প্রদর্শনী সে দেশীয়দের কাছে প্রশংসিত হয়।

এই দুই শিল্পীর নাম হাওড়ার প্রবীণরা অনেকে জানেন। তাঁদের কীর্তির কথা অনেকেরই স্মৃতিতে আবছা হ'য়ে গেছে। এই দুই শিল্পীই শালকের অধিবাসী ছিলেন। বামাপদবাবু তো এই শালকিয়াতেই দেহ রেখে গেছেন। তিনি থাকতেন বর্তমান ঘোষাল বাগানে। আর সুধাংশুবাবু শালিখা ত্যাগ ক'রে বেহালায় মৃত্যু বরণ করেন ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে। এঁরা দু'জনেই শিল্পীজগতে হাওড়ায় স্থান প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। তাঁদের প্রশস্তি কীর্তনে আমরা ধন্য।

পরবর্তী সময়ে আর এক নামী পোট্রেট শিল্পী হচ্ছেন কিশোরী রায়। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের ওয়েষ্টার্ণ পেণ্টিং-এর অধ্যাপক ছিলেন। শিল্পী হবার ব্যাপারে কিশোরীবাবুর স্কুল জীবনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখ্য। শালিখা স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে—১৯২৮ সাল। সভাপতির আসনে আছেন ডঃ ডবলু. সি. আর্কট (Dr. W. C. Urquhart) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার। বালক কিশোরী ঐ সময়ের মধ্যেই আর্কট সাহেবের একটি প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেছে। আর্কট সাহেবকে দেখাতেই তিনি ভীষণ খুশি—ঘোষণা করলেন এক বিশেষ পুরস্কার। শুধু তাই নয়—তাঁরই চেষ্টায় বালক কিশোরী ভর্তি হ'ল গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে। পরবর্তী জীবনে কিশোরী রায় প্রখ্যাত চিত্রকর জে. পি. গাঙ্গুলীর (J. P. Gangoly) সঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন। রক্সি, চিত্রা সিনেমা ও রায়গড় রাজপ্রাসাদের মুরাল পেণ্টিং তাঁরই হাতে আঁকা।[৭] তাঁর বিখ্যাত ছবি হচ্ছে—A peep into gloomy future অর্থাৎ অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি। আমৃত্যু তিনি শালিখার উত্তম ঘোষ লেনের অধিবাসী ছিলেন।

অপর আর এক শিল্পীর নামও উল্লেখ করার মত। তিনি হচ্ছেন হাওড়ার সুরেন্দ্রনাথ দাস। আদি নিবাস হাওড়া জেলার মাজু নামক গ্রামে। ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী স্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অঙ্কন বিদ্যা শিখতে গেলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯০৩ সালে আর্ট স্কুল থেকে পাশ করেন। তারপরই ষ্টুডিও খুলে রোজগারের কাজে নামেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ছবি প্রশংসা পেতে লাগল।

বিদেশেও যাতে তাঁর ছবি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে তার কাজেও তিনি চেষ্টিত হন। সুযোগও তিনি হাত ছাড়া করেন নি। ১৯২৪ সাল। লণ্ডন শহরে 'বিশ্ব

চিত্র শিল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও বড় বড় নামী শিল্পীরা তাতে যোগ দিচ্ছেন। সুরেন্দ্রনাথও সেই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য তৈরি হলেন। পাঠালেন 'শকুন্তলা' নামে একটি বড় ছবি। ভারত সরকার প্রেরিত শিল্পীর ঐ ছবিটি বিদেশী বিচারকদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিল। আরও আনন্দের কথা ১৯৫৪ সালে ভারতে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দুই রাষ্ট্রনায়ক বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ সাহেব। ঐ দুই নেতা কলকাতা ও হাওড়া শহরও ঘুরতে এসেছিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথের আঁকা ক্রুশ্চেভের ও বুলগানিনের দু'খানি প্রতিমূর্তির তৈলচিত্র তাঁদেরকে উপহার দেওয়া হয়।[৮]

আর এক বর্ষীয়ান চিত্রশিল্পী এখনও নিজের তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন সৃষ্টির আনন্দে। প্রচার বিমুখ এই অশীতিপর শিল্পী হচ্ছেন শিবপুরের বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের বংশধর বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী। জন্ম ১৯০৯ সাল। জল রং ও তেলের রংএর ছবি ও পোট্রেট শিল্পে সমান সিদ্ধহস্ত। ছেলেবেলায় দাদামশাই বিখ্যাত শিল্পী ও সি. গাঙ্গুলীই ছিলেন তাঁর ছবি আঁকার প্রধান উৎসাহদাতা। পরে শিল্পগুরু অবনীন্দ্র ও নন্দলাল বসুর শিল্প রীতিতে ছবি আঁকতে থাকেন। বিষ্ণুবাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি স্কুলের প্রথম যুগের ছাত্রদের অন্যতম। বিষ্ণুবাবুর আঁকা ছবি প্রথম থেকেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়।

১৯১৯ সালে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে বিষ্ণুবাবুর দশ বছর বয়সে আঁকা, 'হরপার্বতী' নামে একটি ছবি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে তখনকার দিনে সোসাইটি প্রদত্ত পাঁচশ টাকার নগদ পুরস্কার লাভ করে। আর স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর কাজের মুগ্ধ হয়ে 'ঝর্ণা' ছবির জন্য ব্যক্তিগত একশ টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার দেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২০ সালে শিল্পীর 'ধ্রুব' নামক একটি ছবির জন্য প্রশংসা করে অভিনন্দন জানান। এ ছাড়া শিল্পী তাঁর বার বছর বয়সে (১৯২১ সালে) বিদেশী শাসক প্রতিভূ লর্ড রেনাল্ডের হাত থেকে ঐ ছবির জন্য নগদ পুরস্কারও পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১৯২৮—৩০ মধ্যে শিল্পীর অনবদ্য চিত্র কালী ও দুর্গা মূর্তির ছবির এলবাম ছাপানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিল্পীকে গোল্ড সেন্টার্ড মেডেল দিয়ে পুরস্কৃতও করেন। এরপর বহুকাল শিল্পী কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না করেই একান্তে ঘরে বসে শিল্প সাধনা করে যাচ্ছেন—নেহাত সৃষ্টির নিছক আনন্দেই দেরীতে হলেও হাওড়াবাসী জেনে খুশি হবেন যে বিষ্ণুবাবু জীবন সায়াহ্নে এসে আবার পুরস্কৃত হলেন। তবে সেটা কোন ব্যক্তি বিশেষের পুরস্কার নয়—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহিত্য নাটক ও শিল্প একাডেমির পুরস্কার। বর্তমান বছরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে বিষ্ণুবাবুকে তাঁর শিল্প সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৯—৯০ সালের একাডেমি এওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয়। নগদ পনেরো

হাজার টাকা ও একটি মানপত্র শিল্পীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কলকাতা আর্ট কলেজের একদা অধ্যাপক ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়। এই ভূনাথবাবু ছিলেন আন্দুলের অধিবাসী।

এবার কয়েকজন আধুনিক চারুশিল্পীদের সম্বন্ধেও কিছু আলোকপাত করা যাক। এ সব শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রকাশ কর্মকার (বালি), বিজন চৌধুরী (বালি), গোপাল সান্যাল (বেলুড়), রবীন মণ্ডল (মধ্য-হাওড়া), শিক্ষিকা অনীতা রায়চৌধুরী (শিবপুর), মহিম (রুদ্র) রুদ্র (মধ্য-হাওড়া), দেবব্রত চক্রবর্তী (বালি), নিখিলেশ দাস (মধ্য-হাওড়া)। বিজনবাবু ও দেবব্রতবাবু ওপার বাংলায় জন্মালেও বালিতেই বাসিন্দা হয়ে আছেন। এই সমস্ত শিল্পীরা স্বাধীনোত্তর ভারতে তাঁদের শিল্পী কর্মে শিল্প জগতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে আসন করে নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ, তথা ভারতে এঁরা 'ক্যালকাটা পেইণ্টার্স' নামেই সমধিক পরিচিত। এঁদের মধ্যে নিখিল বিশ্বাস ছাড়া সকলেই নিজ নিজ শিল্প কাজে নতুন সৃষ্টি চালিয়ে উত্তরোত্তর জেলার সুনাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে আবার মহিম রুদ্র শিল্পচর্চার জন্য সুদূর সুইডেনেই নিজ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন তাঁর বিদেশী স্ত্রী শিল্পী গানব্রিট রুদ্রের সঙ্গে। প্রকাশবাবু, রবীনবাবু, নিখিলেশবাবু, গোপালবাবু, অনীতা দেবী এঁরা সকলেই সারা ভারতেই আজ চিত্রজগতে অতি পরিচিত নাম। বিজনবাবু আবার ১৯৮২ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনেও যোগ দিয়ে জেলার সুনাম বাড়িয়েছেন। দেবব্রত চক্রবর্তী আবার পেন্টিং ও ভাস্কর্যে সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৪৬ সালে হাওড়া ময়দানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সেনা নায়কদের এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন বিশিষ্ট জননেতা শিবনাথ ব্যানার্জী। সেই সভায় বিশেষ বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। সেদিনের মঞ্চসজ্জার কাজ করেছিলেন আইজাক বেলিলিয়াস স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র রবীন। সেই চিত্রগুলি দেখে পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত শিল্পীকে দেখতে চান। কিন্তু বালক রবীনকে দেখে শ্রীনেহরু বিস্মিত হয়ে যান। সেদিনের বালক রবীনের মধ্যে যে হাওড়ার উদীয়মান শিল্পীর বীজ উপ্ত হয়েছিল—আজ তিনি ভারতের চিত্রকরদের কাছে রবীন মণ্ডল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ভারত সরকারের ললিত কলা একাডেমির জেনারেল কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যও ছিলেন। আর এক নামী আধুনিক চিত্রশিল্পী হচ্ছেন ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত (মধ্য হাওড়া)। রবীন্দ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র কলা বিভাগে নিজ দক্ষতায় অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ললিত কলা এ্যাকাডেমীর সদস্য। অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের শিষ্য দক্ষিণ মাজুর অধিবাসী কালীপদ ঘোষালও চিত্র জগতের নামী শিল্পী হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলেন।

হাওড়ার আর এক চিত্রকর ও লেখক ছিলেন হাওড়ার ভাণ্ডারগাছা গ্রামের প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা সুরূপা (ইন্দিরা) দেবীর উৎসাহে শান্তিনিকেতনে

ভাষা ও চিত্রকলা শিখতে যান। আচার্য নন্দলাল বসুর নামী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত 'কারু সংঘের' তিনি ছিলেন অন্যতম হোতা। পরে তিনি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে অদূরে সুরুল গ্রামে চিত্রকলা অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অঙ্কিত 'প্রাচীন ভারত' বিষয়ক চব্বিশখানা ঐতিহাসিক ছবি এক চমৎকার শিল্পকর্মের নিদর্শন।

এবারে হাওড়ার কয়েকজন কমার্শিয়াল আর্টিষ্টের কথাও উল্লেখ করা যাক। প্রথমে মনে পড়ে বিখ্যাত পূর্ণেন্দু পত্রী ও প্রবীণ শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর কথা। পূর্ণেন্দুবাবুর আদি বাস ছিল বাগনানের (নাউল) গ্রামে। তিনি কেবল পুস্তকের প্রচ্ছদপট ও অলংকরণেই বঙ্গদেশে খ্যাতি লাভ করেন নি—একই হাতে সাহিত্য চর্চায়ও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। কি করে কলকাতা হল তাঁর এক উল্লেখযোগ্য বই। প্রবীণ শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর নামের সঙ্গে চিত্র প্রেমিক ও পুস্তক প্রেমিক পাঠক মাত্রই পরিচিত আছেন। তিনি স্কুল জীবন থেকেই চিত্র চর্চা শুরু করেন। তবে তিনি কোন আর্ট স্কুলে পড়ে চিত্রাংকন শেখেননি। তিনি নিজ চেষ্টায় চিত্র কলায় স্বশিক্ষিত হয়ে উঠেন। শৈলবাবুর শিল্প কলা কেবল ভারতীয়দেরই রসাস্বাদনে তৃপ্ত করেনি সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার রাও-ডি জেনরোতে (১৯৭৬) এবং ১৯৮৫-তে নিউজার্সিতে তাঁর একক প্রদর্শনীতে সে দেশগুলিতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। শৈলবাবু কেবল চিত্রশিল্পীই নন—তিনি লেখকও বটে। শিশু ও কিশোরদের জন্য তিনি খান পঁচিশ বই লিখেছেন—তাঁর মধ্যে তিনটি বই-ই ভারত সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত। এই শৈলবাবুর জন্মস্থান হচ্ছে আন্দুলের উত্তর তেঁড়িগ্রাম। শুধু তাই নয় আন্দুল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকেই তিনি স্কুলের শিক্ষা শেষ করেন এছাড়া আর আধুনিক কমার্শিয়াল শিল্পীদের মধ্যে সুনাম অর্জন করেছেন বিমল দাস, নারায়ণ দেবনাথ, এইচ পাল, বিশ্বরঞ্জন দে প্রমুখ। বিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রকার রেবতী ভূষণ ঘোষের (বালি) ছড়া সহকারে কার্টুন কোন্ বঙ্গবাসীরই না মনে রেখাপাত করে! যুগান্তর পত্রিকায় এক আমলে তাঁর ব্যঙ্গ চিত্রগুলি পাঠক চিত্তে রসের সৃষ্টি করত। আর এক কার্টুনিষ্ট হচ্ছেন হাওড়ার নরেন রায়—সুফি নামে পরিচিত।

চিত্রকর কিশোরীবাবুর ছোট ভাই নীলমণি রায়ও একজন উঁচুদরের স্টীল ফটোগ্রাফার—যাঁর ফটো আন্তর্জাতিক ফটো প্রদর্শনীতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছে একাধিকবার। ১৯৫৩ সালে হাঙ্গেরীর বুখারেষ্ট শহরে যে আন্তর্জাতিক ফটো প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাতে নীলুবাবুর যুবক বয়সের তোলা একটি ফটো প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা ডি লরিয়েট (Diploma De Laureat) সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র পায়। ফটোটি ছিল বীরভূমের গ্রামে কর্মরত একটি চাষীর ফটো—Pride of Harvest. ১৯৫৪ সালে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে আর একটি আন্তর্জাতিক ফটো প্রদর্শনী হয়েছিল—

বিষয়বস্তু ছিল **Exhibition on Village Life.** এতেও নীলুবাবুর **Thrashing** অর্থাৎ ধানঝাড়া নামে ফটোটি প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এরপরই নিমন্ত্রণ আসতে থাকে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নীলুবাবুই এখনও পর্যন্ত এই সম্মানের অধিকারী হ'য়ে আছেন। প্রৌঢ় নীলুবাবু আজও প্রাচীন ভারতের মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের ফটো তুলে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন শালিখার বাড়িতে থেকেই।

আর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফার হচ্ছেন বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত। কলকাতার ফরিয়াপুকুরে আদি নিবাসী হলেও তিন পুরুষ ধরে হাওড়া শালিখায় বাস করছেন। স্কুল জীবন থেকেই ফটো তোলার ভীষণ ঝোঁক। কলেজ ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ইউনিভার্শাল আর্ট গ্যালারির ডার্করুমে কাজ শিখে সংবাদপত্রের ফটো তুলতে থাকেন। দিল্লীতে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ফটোগ্রাফার হিসেবে জীবন শুরু করেন। তারপর কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিয়ে চীফ ফটোগ্রাফার পদে উন্নীত হন। প্রেস ফটোগ্রাফার এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি পদেও আসীন হন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফটো প্রতিযোগিতায় শ্রীরক্ষিত বহুবার সম্মানিত হয়েছেন। চলচ্চিত্রে যেমন 'অস্কার' পুরস্কারটি বিশ্বের সেরা সম্মান তেমনি ফটোগ্রাফীতেও হল্যাণ্ডের ওয়র্লিড প্রেস ফটো কম্পিটিশনে বিজয়ীর ও সেই সম্মান। এই দুর্লভ সম্মানও বিশ্বরঞ্জনবাবু একাধিকবার লাভ করেন। প্রথমবার তিনি এই সম্মান লাভ করেন ১৯৭৪ সালে। প্রেস ফটোগ্রাফার এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া (পি. পি. এ. আই.) কর্তৃক একাধিকবার ভারতের সেরা ফটোগ্রাফারের সম্মানে ভূষিত হন। বিশ্বরঞ্জন বাবু কয়েকবারই জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন সেরা ছবি তোলার জন্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দালাই লামা যখন তিব্বত থেকে পালিয়ে হাটা পথে ভারতে ঢোকেন সে মুহূর্তে বিশ্বরঞ্জনবাবু পর্বত সংকুল দুর্গম পথে গিয়ে তাঁর পলায়নরত অবস্থায় প্রথমে ছবি তোলেন। আনন্দের কথা 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' সেই ছবি প্রকাশিত হওয়ায় ফটোগ্রাফার বিশ্বরঞ্জনবাবুর সাহস ও ফটোর তারিফ হয় গুণীজনদের মধ্যে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লেখারও বেশ ঝোঁক ছিল। ১৯৮০-র ২৩শে জুলাই শালকিয়ার বাড়িতে হঠাৎ মারা যান।

আর্টিষ্টদের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে শালিখার এক বিস্মৃত প্রায় আর্টিজেনের কথা। তিনি হচ্ছেন প্রিয়নাথ অধিকারী (বলাই অধিকারীর ঠাকুরদা)। হুগলী জেলার এক গ্রামের দরিদ্র সন্তান প্রিয়নাথ। রোজগারের আশায় মাত্র বার বছর বয়সে এসে শালিকায় বাসা বাঁধেন। কলকাতার মিণ্টে (পোস্তার কাছে) একজন ডাইস খোদাই কর্মী হিসেবে যোগ দেন। নিজগুণে পরে তিনি ঐ সংস্থার প্রধান ডাইসম্যান পদে উন্নীত হন। তদানীন্তনকালে শুধু ভারতবর্ষেই নয় সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাইসম্যান হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন আরোহন উৎসব উপলক্ষ্যে 'করোনেসন মেডেল' তৈরি করার

জন্য ব্রিটিশ সরকার সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে কয়েকজন বিশিষ্ট ডাইস খোদাই শিল্পীকে ভার দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, কলকাতার মিণ্টের ডাইসম্যান প্রিয়নাথ বাবুর নক্সাটিই সেরা ব'লে বিবেচিত হয়ে 'করোনেসন মেডেল' রূপে মুদ্রিত হ'ল। ইংরেজ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হলেন প্রিয়নাথবাবু। এই প্রিয়নাথবাবুর প্রপৌত্ররাও ঐ ডাইস তৈরির ব্যবসায়ে সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখে চলেছেন। ইংরেজ মহাকবি সেক্সপিয়ারের চতুর্থশতবার্ষিকী (১৯৬৪ সালে) উৎসবকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য ব্রিটিশ সরকার সেরা শিল্পীদের নক্সা আহ্বান করেছিলেন। এবারও প্রিয়নাথবাবুর পুত্র-প্রপৌত্ররা যে নক্সাটি ক'রে দিয়েছিলেন সেটিই ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেন এটা একটা ইতিহাসে উল্লেখ করার মত জিনিষ বইকি !



১৯০১ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকে প্রিয়নাথ অধিকারীর অঙ্কিত রাজারানীর নক্সা

আর দুই তরুণ সম্ভাবনাময় শিল্পীর কথা ব'লে এই অধ্যায়ের ছেদ টানা হবে। শিল্পী বয়সে তরুণ হ'লেও শিল্পকার্যে নিজ গুণপনা দেখিয়ে জন মানসে স্থান করে নিয়েছে। তার নাম অমল কারক। বিভিন্ন আঙ্গিকে ও বিভিন্ন অপ্রচলিত জিনিষ দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে অমলের কৃতিত্ব বাংলার কারুশিল্পে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। অপর এক ভাস্কর হচ্ছেন রঘুনাথ সিংহ। এঁরা সকলেই জেলার পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ধরে রাখার কাজে চেষ্টিত আছেন।

---

১. বিদ্যাসাগর সন্ধিৎসা—কমল সরকার—দেশ ২৭ জুলাই ১৯৯১
২. ঐ
৩. ঐ
৪. শালিখার ইতিবৃত্ত—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫. বিচিত্রা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩৮ সন।
৬. ঐ
৭. ভারতবর্ষ—১৩৫৩ সন।
৮. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।

হাওড়া জেলা প্রাচীন কাল থেকেই সারস্বত সাধনায় কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। হাওড়া-হুগলী সীমান্তে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরিশ্রেষ্ঠ নামে একটি সামন্তরাজ্য ছিল। সেই ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যটিই আজকের ভূরশুট গ্রাম নামে পরিচিত। ট্রেন পথের চাইতেও আজকাল অতি সহজেই হাওড়া বাস টার্মিনাস থেকে ভূরশুট ভায়া গড়ভবানীপুর এল. বাসে চড়ে ঐ গ্রামে যাওয়া যায়। এই ভূরশুট আবার দুই অংশে বিভক্ত যেমন ডিহি ভূরশুট ও পার ভূরশুট। এই ডিহি ভূরশুটই হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত। এই গ্রামটি দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে ব্রাহ্মণদের বসবাসের একটি উপযুক্ত স্থান ছিল। ভূরিশ্রেষ্ঠী নাম যদিও শ্রেষ্ঠী বা বণিকদের অধ্যুষিত অঞ্চলই বোঝায়—তথাপি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের যে যুগপৎ সমান প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের লেখক বিনয় ঘোষ তাই লিখেছেন—'রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের আদি বাসস্থান ও বিদ্যাস্থানের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান হল দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরশুট। প্রচুর শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল বলে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরশুট নাম হলেও, গ্রামে আধিপত্য ছিল ভূরিকর্মা বা তপোবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের। দশম শতাব্দীতে এই রাজ্যে শ্রীধরাচার্য নামে এক প্রসিদ্ধ শ্রীধরস্বামী দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরই রচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'ন্যায়কন্দলী'।' শ্রীধরাচার্য নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বৃহস্পতিকে নিজ পিতামহ বলে উল্লেখ করেছেন। শ্লোকটি হচ্ছে—

অম্ভোরাশেরিবৈত স্মাৎ বভুব ক্ষিতি চন্দ্রমাঃ।
জগদানন্দ কৃদ্‌বন্দ্যো বৃহস্পতিরিতি দ্বিজঃ॥[১]

অর্থাৎ সমুদ্র থেকে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছিল, তেমনি এই ভূরিসৃষ্টি গ্রাম থেকে জগদানন্দকারী ভূমণ্ডলের চন্দ্র সদৃশ বন্দ্য-ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি উদ্ভব হয়েছিলেন। এই বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন আবার কীর্তিমান। আর তাঁরই ছেলে হল শ্রীধরাচার্য। বিনয় ঘোষ আরও লিখেছেন 'শ্রীধরের কাল যদি দশম শতাব্দীর শেষ দিক হয়, তা হলে বৃহস্পতির জন্মকাল নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হওয়াই সম্ভবপর। এই বৃহস্পতির জন্মকালেই দেখা যায় ভূরি শ্রেষ্ঠ বহু রত্নের কেন্দ্র ও জনবহুল গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়েছিল। বৃহস্পতির হঠাৎ অভ্যুদয় কোন তেপান্তরের মাঠে নিশ্চয়ই হয়নি।...অন্তত শতাধিক বছর গড়ে উঠতে লাগলেও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভূরি শ্রেষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় শ্রীধরে উক্তি থেকে। পাল রাজাদের অভ্যুদয়কাল থেকে কিংবা তার আগে থেকেই ভূরিশ্রেষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।'

এই রাজ্যের রাজা সে সময় কে ছিলেন তা নিয়েও বিভিন্ন মত আছে। তবে শ্রীধরাচার্যের সময় ভুরিশ্রেষ্ঠী যে কায়স্থরাজ পাণ্ডু দাসের শাসনাধীন ছিল তা বিনয় ঘোষও মনে করেন। পরে বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহের রাজত্ব কালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) গড় ভবানীপুর-বাসী মুখটি বংশীয় চতুরানন মহানেউকী (নিয়োগী) ভূরশুট দখল করেন। 'চতুরাননের দৌহিত্র ফুলিয়ার মুখটি বংশীয় কৃষ্ণ রায় হলেন ভূরশুট রাজ্যের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা।'[২] রাজা কৃষ্ণ রায় ১৫৮৩-৮৪ খ্রীঃ ভূরশুটে যে রাজত্ব করছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইতিহাসের দিক থেকে সময়টা হল আকবর বাদশাহের রাজত্ব কাল।[৩] এই বংশের নাম করা রাজা ছিলেন প্রতাপ নারায়ণ। তাঁরই সভাসদ্ ছিলেন জাতিতে বদ্যি ভরত মল্লিক। 'চন্দ্রপ্রভা' (১৬৭৬ খ্রীঃ) ও 'রত্নপ্রভা' (১৬৮০ খ্রীঃ) রচনা করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রতাপ নারায়ণের পুত্র শিব নারায়ণ এবং তাঁর পুত্র হলেন নরনারায়ণ। এই নর নারায়ণের সময়ই ১১১৯ সনে বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্র ভূরশুট দখল করেন।[৪]

বিজিত নর নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে কীর্তিপুত্র চিত্রসেন বহু দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরায় দান করেন। এই লক্ষ্মী নারায়ণের পুত্ররাই গড়ভবানীপুর ছেড়ে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। ভূরশুটের গড়ভবানীপুরের গড়ের পরই উল্লেখযোগ্য গড় হল এই পাণ্ডুয়া গড় বা পেঁড়ো গ্রাম। রাজা কৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বসন্ত রায়ের নামেই বসন্তপুর।[৫] এই রাজ বংশেরই এক অধস্তন শাখা এখানে রাজত্ব করতেন। সেই বংশেই জন্মেছিলেন ভারতচন্দ্র মুখজ্যা অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়। উপাধি রায়গুণাকর। পিতার নাম নরেন্দ্র নারারণ এবং মাতার নাম ভবানী। জন্ম-১১১৯ সাল।[৬] বালক বয়সে ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে (হুগলীর দেবানন্দপুরে) থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা করেন। কিন্তু বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের চক্রান্তে তাঁকে রাজ্য ছেড়ে উড়িষ্যায় গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়।

সেখানে কিছুকাল থেকে ভারতচন্দ্র আবার ফিরে আসেন নিজ গ্রামে। কিন্তু রোজগারের অভাব হওয়ায় তিনি তাঁর বন্ধু ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর (ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান) সহায়তায় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভায় সভাকবি পদে নিযুক্ত হন। মাহিনা চল্লিশ টাকা।[৭] রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উত্তর ২৪ পরগনার মূলাজোড় (শ্যামনগর) গ্রামটি ইজারা দেন। এই গ্রামেই বাংলা সাল ১১৬৭ (১৭৬০ খ্রীঃ) কবি ভারত চন্দ্র মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মারা যান।[৮] তাই কবি জীবনের তিনটি স্থানই ছিল বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। হাওড়া পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো ছিল তাঁর শৈশবের শিশু শয্যা, নদীয়ার কৃষ্ণনগর ছিল যৌবনের উপবন আর উত্তর চব্বিশ পরগনার মূলাজোড় ছিল বার্ধক্যের বারাণসী।

কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কবি প্রতিভার প্রথম নিদর্শন দেখান 'সত্যপীরের কথা'র

মাধ্যমে (১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ)। আর তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অন্নদা মঙ্গল' কাব্য রচিত হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরই নির্দেশে। রচনা কাল ১৭৫২ খ্রীঃ। ডঃ মদন মোহন গোস্বামীর মতে—'এই কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ড-অন্নদা মাহাত্ম্য, দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর, তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনীর পর অন্নদা মঙ্গল গ্রন্থ সাঙ্গ হইয়াছিল।'

এই তিনটি খণ্ডই মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশ করেন সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। সময় কাল ১৮১৬ খ্রীঃ। এর পর যে খণ্ডটি ছাপানো হল তা সম্পাদনা করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭, ১৮৫৩ খ্রীঃ। উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকুরী ছেড়ে সহকর্মী বন্ধু মদন মোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে এক প্রেস স্থাপন করেন। সেই প্রেস থেকেই প্রথম যে বইটি ছাপা হয় তা হচ্ছে ভারত চন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। বলা বাহুল্য, এতে বাণিজ্য খুব ভালই হয়েছিল।

ভারতচন্দ্র যে কত বড় কবি ছিলেন এবং বঙ্গ ভাষা যে তাঁর দ্বারা কত সমৃদ্ধ হয়েছিল তা ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন—ভারতচন্দ্র যেমন যুগ সৃষ্ট ছিলেন তেমনি তিনি যুগ স্রষ্টাও ছিলেন।......এই যুগন্ধর কবির রচনা-বলীকে আশ্রয় করিয়াই সমগ্র একটি যুগের ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে।......বাঙ্গালীর স্বাধীনতার অন্তিম কবি জয়দেব, মুসলমান শাসনের দুর্দিনের কবি বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস, মুসলমান আমলের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি ভারতচন্দ্র।'

প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্র ছিলেন বঙ্গ সাহিত্যে রথ ও পথ। শুধু সাহিত্যেই নয়—তাঁর কাব্যরস বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রতিষ্ঠার কাজে দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে রস সঞ্চারে অপরিহার্য বলে সেদিন বিবেচিত হয়েছিল। উৎসাহী পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ১৭৯৫ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর বাংলা নাট্যশালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশবাসী। নাট্য-শালাটি স্থাপিত হয়েছিল ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীট)।[৯] নাটকটি ছিল 'The Disguise' এর বঙ্গানুবাদ।[১০] নাটক ও নাট্যমঞ্চের বিষয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল নিম্নরূপ—

Mr. Lebedeff's New Theatre in the Doomtullah Decorated in the Bengalee Style will be opened very shortly with a play called, 'The Disguise.'

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হল এইজন্য যে এই নাটকের আবহসঙ্গীতসহ সব দৃশ্যে যে সুর সংযোজনা করা হয়েছিল তাও কবি ভারতচন্দ্রের কবিতা ও গানের সুর দিয়ে নাটকটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে তাই লেখা হয়েছিল—

To those musical instruments which are held in esteem by the Bengalees will be added by European. The words of the much admired poet Shree Bharat Chandra Roy are set to Music.[১১] বলা

বাহুল্য, এই অভিনয় এতই সফল হয়েছিল যে ১৭৯৬ সালে ২১শে মার্চ তারিখে দ্বিতীয় অভিনয়ে লেবেডেফ তাঁর টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পাঠক জেনে হয়ত হতবাক হয়ে যাবেন যে 'অন্নদামঙ্গলের' প্রথম পুঁথিটি ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিসেই আছে। সুসাহিত্যিক শংকর তাঁর 'মানব সাগর তীরে' ভ্রমণ কাহিনীতে লিখছেন—পৃথ্বীন্দ্রবাবুর অনেক অভিজ্ঞতা, ওর কাছেই শুনলাম, ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম পুঁথি প্যারিসেই আছে। সেকালের ফরাসী পাদ্রিরা বিশ্বের নানা প্রান্ত ধর্ম প্রচারে বেরিয়ে সুযোগ পেলেই নাকি ফরাসী সম্রাটের গ্রন্থাগারের জন্য বইপত্র সংগ্রহ করতেন।'[১২]

উদয়নারায়ণপুর থানার আর একটি সারস্বত সাধনার গ্রাম ছিল রসপুর। এই গ্রামের প্রধান বাসিন্দা হচ্ছে মাহিষ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোকেরা। এই কায়স্থদের মধ্যে রায়পাড়াটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই পাড়াতেই রায় বংশে রামকৃষ্ণ রায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ। শিবায়ন কাব্যের তিনি ছিলেন প্রণেতা। বিনয় ঘোষ কবি রামকৃষ্ণ রায়ের জন্মকাল সম্বন্ধে বলেছেন—মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে জন্মেছিলেন।[১৩] তিনি আরও লিখেছেন—'কবি নিজেকে প্রায়ই 'কবিচন্দ্র' বা কবিচন্দ্র দাস' বলে পরিচয় দিয়েছেন—যেমন

কবিচন্দ্র রচিলা সঙ্গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন ॥[১৪]

তবে বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) কবিচন্দ্র নামে আর এক কবিও 'শিবায়ন' রচনা করেছিলেন। তিনি এবং রসপুরের কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি নয়। এই শিবায়ন গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৬৩৫—৪০ মধ্যে।

সাঁকরাইলের জোরহাট ছিল তপোবিদ্যার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। দ্বিজ হরিদেব 'রায়মঙ্গল' (দক্ষিণ রায়) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি (হরিদেব) 'শীতলা মঙ্গল' নামেও একটি কাব্য রচনা করেছিলেন।[১৫]

হাওড় শহরে খুরুটও মধ্য যুগে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এখানে দ্বিজ রঘুনন্দনের লেখা 'পঞ্চানন মঙ্গল' নামে একটি পুঁথি পাওয়া গেছে—তাতে রামকান্ত পণ্ডিত নামে জনৈক লিপিকারের সই দেখা যায়। এ ছাড়া রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত শিবায়ন বা শিব সংকীর্তন বা হরমঙ্গল নামে একটি পুঁথি (বাংলা সাল ১২২৩, ইংরাজি ১৮১৬) পাওয়া গেছে। তাতে তিনি নিজেকে খুরুটের অধিবাসী বলে পরিচয় দিয়েছেন।[১৬] অবশ্য গোপাল হালদার লিখেছেন—রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জন্ম হয় মেদিনীপুরে।*

বালি গ্রামও একদা সংস্কৃত চর্চার এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। মোঘল আমলে 'বালী বিদ্যাসমাজ' নামে একটি সংস্কৃত চর্চা কেন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।[১৭] বালিতে কয়েকটি সংস্কৃতজ্ঞ পরিবারের নামও পাওয়া যায়—তার মধ্যে বিশিষ্ট নৈয়ায়িক ছিলেন

* বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা—গোপাল হালদার।

'বাম্বা' প্রগলভ ভট্টাচার্য। ও'নার ছেলে গোপাল তর্কালঙ্কার বিবাহ করেন কমল নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয়ের কন্যাকে। এই তর্ক পঞ্চানন ছিলেন যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের সভা কবি। এ ছাড়া চৈতল—চট্টো পরিবারের আর এক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার। এই চন্দ্রশেখরের পৌত্র রামচন্দ্র ন্যায়লঙ্কার তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে 'চকবালি' গ্রামটি উপহার পেয়েছিলেন। তাঁরই বংশধর পরবর্তী সময়ে চক-ভট্টাচার্য নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। বালির আর একটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশ হচ্ছে ঘোষাল বংশ। বালিতে এই বংশের আদি পুরুষ ছিলেন রাজেন্দ্র ঘোষাল। চার বা পাঁচ পুরুষব্যাপী পণ্ডিতের বংশ বলে এ'রা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে এই বংশের শ্রেষ্ঠ ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন রাম শঙ্কর তর্ক পঞ্চানন। তাঁর বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল বালির বড়গাঁ ডাঙ্গায় আনুমানিক ১১৬৫-১২০৪ সাল (ইং-১৭৫৮-৯৭)।[১৯] এই শতাব্দীতে মুসলিম কবিদের মধ্যে ছিলেন গরিবুল্লা ও সৈয়দ হামজা প্রমুখ।

হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে আমতার নারিট গ্রামটিও ছিল এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। আনুমানিক ১৭১৫-২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পার্শ্ববর্তী শিয়াখালা (হুগলী) গ্রাম থেকে গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নারিটে এসে বসবাস করতে থাকেন। পরে তাঁরই বংশধররা পুরুষাণুক্রমে সংস্কৃত চর্চার জন্য টোল ও চতুষ্পাঠী তৈরি করে চলেন। এই বংশেরই বিখ্যাতপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়। তিনিই পরবর্তী কালে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মহেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কুসুমাঞ্জলির ওপর টিপ্পনী, দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদ ভাষ্যের ওপর সরস আলোচনা, প্রাকৃত কথা, হিন্দু পঞ্জিকার সংস্কারের ওপর আলোচনা ইত্যাদি। মহেশচন্দ্র 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পেয়েছিলেন ইংরেজ শাসনকর্তাদের কাছ থেকে। তারও একটি ইতিহাস আছে। সে কথা জেনে পাঠক নিশ্চয়ই মহেশচন্দ্রের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পেতে পারবেন। সেই ইতিহাসটি হচ্ছে এই —

ভিকেটারিয়ার ৫০ বছর রাজ্যশাসনপূর্ণ হওয়ার জুবিলি উপলক্ষে ১৮৮৭ সালে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দরবারে তাঁদের স্থান রাজাদের পরেই নির্দিষ্ট হয়। সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হল—**Queen-Empress of India being desirous to commemorate the event of the Jubilee of Her Majesty's Accession to the Throne has, resolved to institute a new title for oriental learning-persons upon whom the title of Mahamahopaonyaya has been conferre shall be Darbar take rank next below the titular Rajas.**[২০]

হাওড়াবাসীর পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় এই যে ঐ উপাধি প্রাপকদের তালিকায় প্রথম নামই ছিল মহেশ চন্দ্রের। এই কথা জানতে পেরে মহেশচন্দ্র হয়তো কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি তদানীন্তন ভারত সরকারের ষ্টেট সেক্রেটারী স্যার

এ্যান্টনী ম্যাকডোনালকে ধরে নিজের নাম কাটিয়ে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নাম তালিকার প্রথমে দেন।[২১] এই রকম উদার গুণসম্পন্ন নিরভিমান পণ্ডিত ছিলেন তিনি। বঙ্গদেশ থেকে যে নজনকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল এঁদের নামও গুণানুসারে সরকারী তালিকা থেকে তুলে দেওয়া হল। (১) ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন (নবদ্বীপ), (২) মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (হাওড়া), (৩) শ্রীরাম শিরোমণি (মুর্শিদাবাদ), (৪) রাখালদাস ন্যায়রত্ন (ভট্টপল্লী নিবাসী), (৫) প্রসন্ন ন্যায়রত্ন (নদীয়া বেলপুকুর), (৬) দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (হুগলী কোন্নগর), (৭) চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (মৈমনসিংহ), (৮) তারিণী চরণ শিরোমণি (ফরিদপুর)। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩৫১, কার্তিক সংখ্যা) লেখা হয়েছে—এঁদের ছাড়াও পণ্ডিত আরও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আবার নেননি। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক প্রসন্ন কুমার তর্করত্ন।

এ ছাড়া পাঁত্রাগাছি, শালিখার বামুনগাছি ও বাবুডাঙ্গাতেও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কয়েকটি বিখ্যাত টোল ছিল। আজ অবশ্য তা দেখতে পাওয়া যাবে না।

মুসলমান শাস্ত্র চর্চা কেন্দ্র হিসেবে মোকতাব ও মাদ্রাসার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র এ জেলায় পাওয়া যায় না। তবে অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—মধ্যযুগের শেষার্ধে ভুরশুট পরগনায় কয়েকটি মোকতাবের হদিস পাওয়া গিয়েছিল। আর শাঁকরাইলের টিকি পীড় (Teke pir) মসজিদেও একটি মোকতাবের হদিস পাওয়া গিয়েছিল।

আলোচনান্তে দেখা যাচ্ছে যে হাওড়া জেলার বিভিন্ন অংশেই সংস্কৃত চর্চার অনুশীলন কেন্দ্র ছিল। তাতে অনেক পণ্ডিত প্রবরেরই স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই স্মৃতিগুলির মধ্যে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িয়ে আছে হাওড়া-শালিখা নামক গ্রামের সঙ্গে। ১৮২৮ সালে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরেজি শেখাবার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসেন। আট বছরের ঈশ্বরচন্দ্র পায়ে হেঁটে পিতার সঙ্গে কলকাতায় পেঁছান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাল্য শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। শিয়াখালা হয়ে বেনারস রোড (তখন অহল্যাবাঈ রোড) ধরে শালিখার বাঁধাঘাট দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে বড়বাজারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং তাঁরই কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পুস্তকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'জয়নারায়ণ সে যুগের একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক। তাঁহার নিকট যে সকল ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের একজন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—অপরজন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নন)।" 'এই ন্যায়রত্ন মহাশয়ই হচ্ছেন

আমতা-নারিটের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়েছিলেন।'[২২]

তর্কপঞ্চানন মহাশয় বাল্যকালে পিতা হরিশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র শিখে শালিখায় আসেন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। জয়নারায়ণ কেবল ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি—তিনি শালিখায় গুরুর মৃত্যুর পর একটি চতুষ্পাঠীও স্থাপন করেছিলেন। তখনকার নিয়মানুযায়ী ঐ সব ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয়ভার গুরুমশায়কেই বহন করতে হত। তাই এই কেন্দ্রটি চালাতে জয়নারায়ণ মশায়কে ভীষণ অর্থ কষ্টে পড়তে হয়। বিদ্যাসাগরের মেজো ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাই লিখেছেন—'অনন্তর শালিখা নিবাসী কতিপয় সদাশয় লোক তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের সাহায্য করিতে লাগিলেন।'

এতক্ষণে হয়তো আমরা তর্কপঞ্চানন মশায়ের গুরুর নামটি জানবার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছি। তাঁর নাম হচ্ছে পণ্ডিত প্রবর জগম্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে 'সেকালের সংবাদপত্রের কথা'য় লিখেছেন—'১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে কলকাতার দক্ষিণে ২৪ পরগনার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে জয়নারায়ণের জন্ম হয়।...শালিখানিবাসী জগম্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৪০-১১ই আগষ্ট তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০ টাকা বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।'

আর এক বিদেশী পণ্ডিতের স্বদেশী গুরুর কথাও আমাদের জেলার ইতিহাসে সারস্বত সাধনায় এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। এদেশের বিদ্বজ্জনের কাছে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্সের নাম সদাই পরিচিত। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এদেশে তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি হয়ে আসেন। বিচারপতি হিসেবে সংস্কৃত শেখার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। কিন্তু মুস্কিল হল কিভাবে শিখবেন বা কেইবা শেখাবেন। কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণই ম্লেচ্ছ সাহেবকে দেবভাষা শেখাতে রাজী ছিলেন না। নিরুপায় হয়ে জোন্স সাহেব তাঁর বন্ধু কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্রের সাহায্য প্রার্থী হলেন। কিন্তু সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়েতে কেউ তাঁকে সংস্কৃত শেখাতে রাজী হলেন না। অবশেষে কলকাতার খুব কাছেই পাওয়া যায় এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে। বাড়ি তাঁর শালিখা গ্রামে। তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত রামলোচন কবিভূষণ। রামলোচনের সংসারে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা কেউ ছিলেন না।[২৩] সুতরাং সমাজ চ্যুতির ভয় তাঁকে মোটেই টলাতে পারে নি। তিনি ঠিক করলেন যে উৎসাহী বিচারপতিকে তিনি সংস্কৃত শেখাবেনই। জোন্স সাহেবও হাতে যেন চাঁদ পেলেন। রামলোচন কবিভূষণ জাতিতে বদ্যি কায়স্থ হলেও বৈদ্য (চিকিৎসা) বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। পল্লীর নিম্নবর্গের লোকেরা তাঁর কাছে চিকিৎসা পেয়ে ধন্য হতেন। মাসিক একশ টাকা দক্ষিণায় কবিভূষণ জোন্স সাহেবকে সংস্কৃত শেখাতে সম্মত হলেন। তবে শর্ত ছিল কয়েকটি—যেমন পাল্কী করে তাঁকে শালিখা থেকে

এসপ্লানেডে (মতান্তরে খিদিরপুর) যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। আর তাঁরই আদেশে জোন্স সাহেব একটি ঘরে নতুন করে শ্বেত পাথরের মেঝে করালেন। পড়ার ঘরে দুটি চেয়ার ও টেবিল ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না। প্রতিদিন গঙ্গাজল দিয়ে ঘরটি ধোবারও ব্যবস্থা করা হল। সংস্কৃত অধ্যয়নের আগে খালি চা ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করতেন না জোন্স সাহেব। এই করে জোন্স সাহেব একজন নিরামিষাসী হয়ে ওঠেন।[২৪] সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একজন বিদেশী যে কত ত্যাগ স্বীকার ও আত্মপীড়ন সহ্য করতে পারেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন স্যার উইলিয়ম জোন্স।

বলা বাহুল্য, এক বছরের মধ্যে জোন্স সাহেব সংস্কৃত ব্যাকরণ বেশ ভাল করেই শিখলেন। একদিন পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জোন্স সাহেব জানতে পারেন যে জার্মান সাহিত্যের মত সংস্কৃত সাহিত্যেরও নাটক আছে। পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে কবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের বইটি পড়ে ফেলেন। শুধু পড়াই নয়—ঐ বইটিকে তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ইউরোপে পাঠান। অনুদিত গ্রন্থটি জোন্স সাহেব মহাকবি 'গেঁটে'কেও পাঠিয়ে দেন। 'কবি ঐ অনুবাদ পড়ে অলৌকিক আনন্দে মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি আনন্দের মত্তভায় শকুন্তলার স্তুতিতে একটি কবিতা লিখে ফেলেন।'[২৫] স্যার উইলিয়ম জোন্স 'শকুন্তলা' প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর। ১৯৮৯ সালে ২০শে অক্টোবর কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে শকুন্তলা ইংরেজি অনুবাদের দুশ বছর পূর্তি-অনুষ্ঠানে উইলিয়ম জোন্সের গুণপনা সম্বন্ধে সকল বক্তাই ছিলেন মুখর। তারই সঙ্গে কেউই কিন্তু রামলোচন কবিভূষণের নাম করতে ভোলেন নি। স্বয়ং জোন্স সাহেবও ঐ পুস্তকের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কবিলোচনের স্মৃতিতে।*

তাই বলি হাওড়াবাসীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুর গুরু এবং স্যার উইলিয়ম জোন্সের মত বিদগ্ধ পণ্ডিতের সংস্কৃত শিক্ষকের অবস্থিতি কি কম গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়! বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালীত্ব যেমন বাঙ্গালীর গৌরব সর্বস্ব তেমনি ম্লেচ্ছবাসীকে সংস্কৃতরূপে দেবভাষা শিক্ষা দেবার জন্য রামলোচনের অনন্য সাধারণ জেদও ইতিহাসে স্মরণ করার মত। আর প্রধানত অব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এই গ্রামটিতে এঁদের আবির্ভাবও এক অবিশ্বাস্য সংবাদ। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত, রামলোচন কবিভূষণের মত প্রথিতযশা ব্যক্তিদের পাদস্পর্শে হাওড়ার ধুলোমাটি হাওড়াবাসীর কাছে তীর্থরেণুতে পরিণত হয়েছে।

হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামটিকে বলা হয় 'দক্ষিণের নবদ্বীপ'। প্রকৃতপক্ষে আন্দুল রাজাদের গুণগ্রাহীতায় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তপবিদ্যা সাধনার ফলে ঐ গ্রামস্থ সন্নিহিত অঞ্চলে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার প্রভূত প্রসার ঘটেছিল। আন্দুলের

* ঐ সভাতে লেখক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

বিদগ্ধ ও বিত্তশালী ব্যক্তি জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক ১৮৩২ সালে 'অমর কোষ' নামে একখানি বৃহৎ সংস্কৃত অর্থকোষ রচনা করে অমর হয়ে আছেন। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় (২য় খণ্ডে) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—'শ্রীযুক্তবাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক সম্প্রতি সংস্কৃত 'অমর কোষ' গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। এই মূল গ্রন্থ যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের ইহাতে মহোপকার হইবে।' 'তাঁর এই 'অমর কোষে'র বঙ্গানুবাদ ১৮৩৯ সালে 'শব্দ কল্পতরঙ্গিনী' নামে প্রকাশিত হয়।[২৬] এই অনুবাদের ভার নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত রামোদয় বিদ্যালঙ্কার নামে জনৈক পণ্ডিত। ব্রজেন্দ্রনাথ আরও লিখছেন—ঐ গ্রন্থ উক্ত বাবুর (জগন্নাথ প্রসাদ) অনুমতিতে শ্রীযুক্ত রামোদয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। অপর শ্রুত হওয়া গেল যে ঐ বাবু গ্রন্থটি বাঙ্গালাতে ভাষান্তরিত করিতেছেন। তাহা প্রস্তুত হইলেই মুদ্রাঙ্কিত করিবেন।'[২৭]

বিশিষ্ট লেখক প্রমথনাথ বিশীর মতে—১৮১৭ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মহোত্তম যুগ। উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ সেই সময়ের অনেক কিছু দেখেছেন। তাঁরা সেই যুগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন আবার সেই যুগকে প্রভাবিত করেছেন। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ও অমৃতলাল বাবুর সম্বন্ধে হাওড়াবাসীর বেশ দুর্বলতা আছে। কারণ কৃষ্ণকমলবাবু ও অমৃতলালবাবু দুজনেই হাওড়া জেলায় দীর্ঘদিন বাসও করেছিলেন। কৃষ্ণকমল বাবুর নামেতো রাস্তাই রয়েছে কালীবাবুর বাজারের পাশে। কৃষ্ণকমল বাবু বিপিন গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ'* এ নিজেই বলছেন—'১৮৬১ হতে আমি হাওড়ায় বাস করতাম।' হাওড়ায় ছিলেন প্রায় ১৮৮৩ পর্যন্ত অর্থাৎ ২২ বছর। আর অমৃত বাবুরও হাওড়া শালিখায় শ্বশুর বাড়ির কাছে থাকতেন।** এই কৃষ্ণকমল বাবুর বিদ্যামত্তার খ্যাতি সেকালে পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই শ্রদ্ধায় স্বীকার করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন।[২৮] পরে হাইকোর্টে ওকালতি—এমনকি 'টেগোর ল' লেকচারারও' হন। শেষ জীবনে রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে অবসর নেন। কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ ও ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও পুষ্ট করেছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কৃষ্ণকমলবাবুর পাণ্ডিত্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। বিপিনবিহারী গুপ্তকে ১৩১৮, ১৪ই পৌষ তারিখে এক চিঠিতে লেখেন—কৃষ্ণকমলবাবু প্রবীণ পণ্ডিত,

* বিশ্বভারতী সংস্করণ।

** যাত্রা থিয়েটার অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ আছে।

তিনি লেখেন না। এইজন্য তাঁহার মত ও স্মৃতি আপনি যেমন করিয়া আদায় করিয়াছেন তাহা না করিলে পাওয়াই যাইত না।'[২৯] এ কি কম গৌরবের কথা!

ঠিক তেমনি হাওড়া পেল বিপিনবিহারী গুপ্তকেও। শৈশব ও যৌবন কলকাতার কাটলেও তাঁর বার্ধক্যের বারাণসী কিন্তু ছিল হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের মাটি। বরিশাল কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে জীবন শুরু। পরে আমৃত্যু কলকাতায় রিপন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হতে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর আগ্রহই ছিল তাঁর প্রধান সম্বল। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে 'পুরাতন প্রসঙ্গ।' 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' তাঁর অপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ৬১ বছর বয়সে তিনি হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে ১৩৪২ সালের ১৯শে মাঘ পরলোকগমন করেন।[৩০] হাওড়ায় এখনও তাঁর বংশধররা আছেন।

কৃষ্ণকমল ও বিপিনবিহারী প্রসঙ্গের সঙ্গেই আর একজন বিখ্যাত বিদগ্ধ ব্যক্তির নাম করা হল—তিনি হচ্ছেন দ্বারিকানাথ মিত্র। খুব সম্ভবত তিনিই সর্বাপেক্ষা কম বয়সে বাঙ্গালী বিচারপতি হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে—দ্বারকানাথ মিত্রের মত সমুজ্জ্বল ধীশক্তিসম্পন্ন লোক, এমন brilliant intellect, আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই তিনি হাইকোর্টের জজ হয়েন। বিচারপতি হবার ব্যাপারে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করলেই তাঁর আইনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ধারণা হবে। তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট ছিলেন গ্রে সাহেব। তিনি একদিন দ্বারিকবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁর হাইকোর্টের জজ হতে আপত্তি আছে কিনা। উত্তরে দ্বারিকবাবু তাঁর সম্মতির কথা জানালেন। লাটসাহেব বললেন—**'Did you apply for the post?'** দ্বারিকবাবু বললেন—**'No, I thought that these appointments did not go by application.'**

বলা বাহুল্য, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বিচারপতি হলেন। প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নস-এর মৃত্যুর পর অন্যান্য সাহেব বিচারপতিদের সঙ্গে দ্বারিকবাবুর মতবিরোধ দেখা দেয়। স্যার লুইস জ্যাকসনের সঙ্গে মিত্র মশায়ের তিক্ত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু দ্বারিকাবাবুর মৃত্যুতে সেই জ্যাকসন সাহেব যে শোকপ্রস্তাব পাঠ করছিলেন তা নাকি হাইকোর্টে নজির বিহীন। আচার্য কৃষ্ণকমলবাবু বলছেন—'কিন্তু দ্বারিকবাবুর মৃত্যুতে যখন হাইকোর্ট শোক প্রকাশ করেন এই জ্যাকসন সাহেব জজদিগের তরফ থেকে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন সেরূপ প্রশংসাবাদ আর কখনও হাইকোর্টে শুনা যায় নাই।[৩১] প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক কোঁতের ভক্ত দ্বারিকবাবুর ইংরেজী সাহিত্যে এবং অঙ্ক শাস্ত্রেও ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। **Hindu law of Inheritance and Succession** সম্বন্ধে সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। এই দ্বারিকবাবু ছিলেন হাওড়া আমতা থানার আগুনসি গ্রামের সন্তান। পরিণত বয়সে 'ক্যান্সার' রোগে আক্রান্ত হলে নিজ জন্মভূমিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বলে তিনি মনে করেছিলেন।

আচার্য কৃষ্ণকমলবাবু বলছেন—দ্বারিকবাবুর সহিত শেষ সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিপথে এক প্রকার অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি আমতার নিকটবর্তী আগনুসি নামক গ্রামে প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার কালে হাইকোর্টের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণের জন্য ফেটিন গাড়িতে শয়ান অবস্থায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গাড়ির নিকটে গেলাম। আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ঘাড় একটু তুলিয়া তিনি নমস্কারসূচক হস্ত-সঞ্চালন করিলেন। সেই আমার তাঁহার সহিত শেষ দেখা। প্রায় চল্লিশ বছর অতীত হইয়াছে। এখনও বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই।[৩২] এই প্রশংসা কি হাওড়াবাসীর পক্ষে কম প্রার্থিত?

এবারে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। শরৎচন্দ্র প্রথমে বাজে শিবপুরে কয়েক বছর কাটিয়ে হাওড়া-পানিত্রাসের সামতাবেড় নামক গ্রামে বাড়ি করেন। শেষ জীবনে তিনি বালীগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডেও বাড়ি করে ছিলেন। সেই অর্থে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যজীবনের সম্পর্ক হাওড়াবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেনি বা হয়ে ওঠা সম্ভবও ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাওড়ায় অস্থায়ী অবস্থান নেহাতই সরকারী কার্যোপলক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় (তখন হাওড়াকে হাবড়া লেখা বা বলা হত) তিনবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন—যেমন ১৮৮৩, ১৮৮৫ ও শেষবার ১৮৮৭ সালে। একবার তিনি হাওড়ায় ঘরও ভাড়া নিয়ে থাকেন বর্তমান পঞ্চাননতলা রোডে। সেখানে একটি বঙ্কিমচন্দ্রের আবক্ষমূর্তি স্থাপন করে খালি জায়গাটিকে 'বঙ্কিম পার্ক' নামে নামাঙ্কিত করে স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন হাওড়া পৌরসভা। এই বাড়িটিকে ঘিরে যে ইতিহাস আছে তাও কম চমকপ্রদ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাওড়ায় থাকার সুবাদে অনেক গুণী ব্যক্তিরই আগমন ঘটত এখানে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কিশোর বয়সে এই বাড়িতে এসে বঙ্কিম সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সেদিনের সেই ইতিহাস আর কেউ না লিখলেও 'জীবন স্মৃতি'-তে বিশ্বকবি নিজেই লিখে গেছেন। কারণ এই রকম মণিকাঞ্চন যোগ খুব কমই ঘটে। তিনি লিখেছেন—অবশেষে একবার যখন হাওড়ায় তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই। বঙ্কিম সন্দর্শনে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকবার গিয়েছেন তবে সেটা হাওড়ায় নয়—কলকাতার ভবানীচরণ দত্ত স্ট্রীটের বাড়িতে।

পূর্বেই বলা হয়েছে হাওড়ার সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা আত্মিক যোগ ছিল। তিনি হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে জন্মালেও পরবর্তী কালে হাওড়া শহরে ও তারও পরেগ্রামেতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আজ তাঁর পানিত্রাস-সামতাবেড়ের বাড়িটি একটি সংরক্ষণ শালায় পরিণত হয়েছে। শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকা-কালীন (১৯২৬ সাল থেকে) তাঁর বাড়িটি একটি সাহিত্যিকদের তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। একাধারে যেমন এখানে বসে তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন অন্যধারে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে দেশের মুক্তি সাধনেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শুধু সাহিত্যিক কেন দেশ সেবায় নিবেদিত বিপ্লবীরাও গোপনে তাঁর কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য এখানে আসতেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে 'অনুশীলন সমিতি'র প্রাণপুরুষ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের কাছে শিবপুরের বাড়িতে আসতেন—উদ্দেশ্য বিপ্লবী কাজে অর্থ সাহায্য। বিপিনবাবু শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে ভাগ্নে ছিলেন। শরৎচন্দ্র কেবল মানব সেবার জন্য অর্থ দেননি পশু কল্যাণেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। একসময়ে হাওড়া পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি (C. S. P. C. A.) বা সোসাইটি ফর প্রিভেনসন অব ক্রুয়েলটি টু এ্যানিমেলস তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। হাওড়া পৌরসভার মূল ভবনের পূর্ব কোণের দোতলার বাড়িটির তলার ঘরটিই ছিল তাঁর অফিস ঘর। আজও শ্বেতপাথরের সেই ট্যাবলেটটি লাগানো আছে তবে পোষ্টারের দৌরাত্ম্যে পাঠোদ্ধার করা কষ্টকর হবে। এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল। তা থেকেই শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতি সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিকতা ফুটে উঠবে। শরৎচন্দ্রের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ঢাকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক ও অধ্যাপক হিসেবেও তাঁর বেশ নাম ডাক ছিল। একবার শরৎচন্দ্র বন্ধুর বাড়ি ঢাকায় যাবেন বলে বাড়ি থেকে রওনা হয়ে রেল স্টেশনে এলেন। কিন্তু সেদিন ১লা এপ্রিল, ১৯৩০ কলকাতা ও হাওড়ায় গাড়োয়ানরা সত্যাগ্রহ ও ধর্মঘট করায় পশুদের কি হবে তা ভেবে তিনি আর বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলেন না। শরৎচন্দ্রের চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

হাওড়া Rly. Station.
1st April, 1930

ভাই চারু,

আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আজ কলকাতায় গাড়োয়ানের দল C. S. P. C. A.-র কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করায় একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে। Sergeant-দের সঙ্গে পেটাপেটি হয়,—কেল্লা থেকে গোরা এসে গুলি চালায়। শুনছি ৪ জন মরেছে। ও তো গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাবড়া শহরেও C. S. P. C. A. আছে এবং আমি তার Chairman. আজ হাবড়ার Magistrate এবং S· P. কোনমতে হাবড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছে। কিন্তু কাল

কি ঘটে বলা যায় না। অথচ এই Department-এর কর্তা হয়ে আমার এ সময়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না। এইজন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছি।[৩৩]

ইতি—

তোমার শরৎ

শরৎচন্দ্রের পানিত্রাসের বাড়িতে একটি কুকুর ছিল। তার নাম ছিল ভেলো। ভেলো ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। 'হাওড়া বার্তার' প্রবীণ সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন—পরে ভেলোর চামড়া টান করে ঘরে স্টাফড অবস্থায় সাজিয়ে রাখতেন। কেউ গেলেই বলতেন এই দ্যাখো ভেলো বসে আছে।

বাজে শিবপুরের বাড়িতে শরৎচন্দ্র বেশ কয়েক বছর (প্রায় দশ বছর) ছিলেন। এই বাড়িতে বসে তিনি যে কটি প্রশংসনীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে 'চরিত্রহীন' ছিল অসাধারণ। কিন্তু এই বইটি লিখতে গিয়ে প্রতিবেশীদের হাতে তাঁকে ভীষণ হেনস্তা হতে হয়েছিল। সে কাহিনী শুনলে আজকের হাওড়াবাসীরা নিজেরাই লজ্জা পাবেন।

'হাওড়া বার্তার' বর্ষীয়ান সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পালের মুখের কথাই এখানে তুলে ধরা হল। 'হাওড়া শরৎচন্দ্রকে দুবার কাঁদিয়েছিল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে শিবপুরের বাড়িতে। শরৎচন্দ্র তখন 'চরিত্রহীন' লিখছেন। লেখা প্রায় শেষ। পাড়ার লোকেরা খবর পেয়ে একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ি আক্রমণ করল। তাদের দাবি ভদ্র পাড়ায় বসে 'চরিত্রহীন' নামে উপন্যাস লেখা চলবে না। সেই চরিত্রবানরা শরৎচন্দ্রের ঘরে ঢুকে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। পরে আমাদের একথা বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কান্না চাপতে পারেননি। বইটি তিনি আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নতুন করে লেখেন।[৩৪] হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকাকালীন তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেই সুবাদে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। ডাঃ পাল ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে মারা যান।

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলা যাক। এই ঘটনাটি পানিত্রাসে থাকাকালীন ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র যাঁদেরকে অন্তস্থল থেকে ভালবাসতেন তাদের মধ্যে কবি নরেন দেব ও রাধারানী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এঁদের বিয়ের প্রধান ঘটক ও পরামর্শদাতা ছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ বিবাহে আনন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। পাঠক হয়তো অবগত আছেন যে রাধারানী ছিলেন বিধবা। তের বছর আট মাস বয়সে রাধারানীর বৈধব্য দশা শরৎচন্দ্রকে পীড়িত করেছিল। তারই একটা বিহিত করতে নরেন দেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক করেন। সেই বিয়েটি হয়েছিল হাওড়া লিলুয়ার বাগানবাড়িতে। বাড়িটির নাম ছিল 'দেবালয়'। লিলুয়ার 'দেবালয়' সক্রিয় সেযুগে বাংলা দেশের সাহিত্যিক কবি প্রমুখ গুণীজনের নিয়মিত উপস্থিতিতে চাঁদের হাট বসে যেত। কবি নরেন-

দেবের বিয়ে—তাও আবার বিধবা রাধারানীর সঙ্গে। সুতরাং নামী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সবাই গিয়ে পেঁৗছেছেন বিবাহবাসর লিলুয়ার 'দেবালয়ে'।* বিয়েতে কল্লোল গ্রুপকে প্রথমে নেমন্তন্ন না করলেও তাঁরা নরেনদার বিয়ে শুনে সবাই 'দেবালয়ে' এসে হাজির। এঁদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রমুখ। ভারতী গ্রুপের প্রধান নায়ক বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ও সম্পাদক জলধর সেনও যথাসময়ে এসে হাজির। কিন্তু যাঁর বিহনে সবাই হত তিনি হচ্ছেন শরৎচন্দ্র। এ যেন শিবহীন যজ্ঞ হতে চলেছে। সত্যি সেদিন বিবাহবাসরে শরৎচন্দ্র অনুপস্থিত। আসলে শরৎচন্দ্রকে যে ছেলেটি মারফৎ চিঠি দিয়ে সব জানানো হয়েছিল সে চিঠি আর ওঁর কাছে পেঁৗছায়নি। কারণ সে ছেলেটি পথে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে সোজা তাদের গ্রামে চলে যায়। সেই নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নবদম্পতির সম্পর্ক মধুর করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সেদিনের লিলুয়ার 'দেবালয়' সাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবিদের কাছে কি রকম ছিল তা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গান থেকেই বোঝা যাবে—

বাবু, পাঁচ মিনিটের ট্রেন জানি'—
টিকিট এক আনা—
দেবদেবী দর্শন মিলে গা—
ইলিশ মুর্গী খানা—

সেই ইলিশ নিয়ে শিশির ভাদুড়ি আবৃত্তি করতে করতে ঢুকছেন—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা।[৬৫]

এর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গও এসে যায়। জোড়াসাঁকো ও হাওড়ার মধ্যে ব্যবধানের মাত্রা কেবল গঙ্গা পারাপার হলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু খুব কমই হাওড়ায় এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে তরুণ বয়সে একবার এসেছিলেন। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। আর হাওড়া টাউন হলে শরৎচন্দ্রের এক সম্বর্ধনা সভায় এসেছিলেন। যা হোক রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীকে জগৎসভায় যে উঁচু স্থানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন তা বঙ্গবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ছেলেবেলায় যিনি সাহিত্য চর্চায় আকৃষ্ট করেছিলেন এবং সাহিত্য রচনায় প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন হাওড়ার অধিবাসী। তাঁর নাম অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। অক্ষয়বাবুর জন্মস্থান ছিল দক্ষিণবঙ্গের 'নবদ্বীপ' আন্দুল গ্রামে। সেখানে বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান তিনি। পিতার নাম মিহির চৌধুরী। সে যুগে তিনি একজন নামকরা

* ষ্টেশন থেকে মিনিট দুয়েকের পথ। এটি রাধারানী দেবীর শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি ছিল।

এ্যাটর্নী ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রও পিতার ন্যায় ওকালতি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে এ্যাটর্নীর কাজ করতেন।[৩৬] গান ও কবিতা রচনায় অক্ষয়বাবুর মুন্সিয়ানা ছিল। যদিও গানের গলাটা প্রায়ই সুরে বেসুরে বেজে উঠত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন—বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুন্ন থাকিত।

অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গীত রচনা সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' লিখছেন—আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পাশে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর রচনা করিলাম অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্মা সিগারেট টানিতে টানিতে মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত তখন বুঝা যাইত যে, এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া চুরুটের টুকরাটি সম্মুখে যাহা পাইতেন, এমনকি পিয়ানোর উপরেই তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া 'হয়েছে হয়েছে' বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে শুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য কচ্চিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না।

এবার সাহিত্যের দিকটাই বলি। অক্ষয়চন্দ্র ইংরেজিতে এম. এ. দিলেন। বায়রন, শেলী ও শেক্সপীয়ারের কাব্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট ব্যৎপত্তি ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে অক্ষয়চন্দ্র বিশেষভাবে তাঁর কাব্য প্রতিভাকে উসকে দিতে এমনকি সংশোধন করে দিয়ে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন নিজেই।—সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ; অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্য বোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।[৩৭]

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে যথা বৈষ্ণব সাহিত্য, টপ্পা, কবিকঙ্কন, মুকুন্দরাম, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিয়াল রামবসু, হরুঠাকুর ও শ্রীধরের মত কথকদের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। তিনি সাহিত্যরস লেখকের মধ্যে ধরাতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাই লিখছেন—নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ পাইয়াছি। যোগ্য গুরুর এখানেই পরম সার্থকতা।' আর হাওড়াবাসী

হিসাবে এই গর্ব রাখার জায়গা কোথায় !

আসলে অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের (রবীন্দ্রনাথের দাদা) বন্ধু। সেই সুবাদেই ঠাকুর বাড়িতে তাঁর আনাগোনা ছিল ঘরের লোকের মত। রবীন্দ্রনাথও তাই সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হননি। অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম—১৮৫০, মৃত্যু—১৮৯৮ সাল।[৩৮]

সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত জীবনসায়াহ্নে বালিতে বিরাট বাড়ি কিনে বেশ কয়েক বছর বাস করেন। সেই বাড়ির অস্তিত্ব আজও আছে। তবে মালিকানা বদলে গেছে। জি. টি. রোডের ঠিক ওপরেই বাড়িটি আজ জাহাজি কোম্পানীর মেরামতি কেন্দ্র হিসেবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এই বাড়ির তখন নাম ছিল 'শোভন' উদ্যান। এই বাড়িতে বসেই অক্ষয়বাবু তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক বইটির দুটি খণ্ড শেষ করেন। ১ম খণ্ড (১৮৭০) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৩) সালে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর 'শোভন' উদ্যানে বৃক্ষ-লতাদি সম্বন্ধে গবেষণা কাজও চালাতেন। বালির এই উদ্যানটি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের পৌত্র ছন্দকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্যটি বড়ই মূল্যবান। তিনি লিখছেন—'ছোট হইলেও সেকালে কনিষ্ঠ বোটানিক্যাল নামে পরিচিত ছিল।… নানা দেশ হইতে আনীত এত বিচিত্র তরুলতার সংগ্রহ এদেশে অন্য কোন উদ্যানে ছিল না।[৩৯] পাঠক জেনে পুলকিত হবেন যে সমসাময়িক সাহিত্যিক ও সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বালির এই 'শোভন' উদ্যানটির নামকরণ করেছিলেন 'চারুপাঠ ৫ম ভাগ'। স্মরণ করা যেতে পারে যে 'চারুপাঠ ৪র্থ ভাগ' পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের সাহিত্য কীর্তি সে যুগে ঘরে ঘরে আদৃত ছিল।

কল্যাণেশ্বর তলায় মন্দির নির্মাণে তিনিই উদ্যোগী হয়ে ব্যয়ভার বহন করেন। তাঁরই পৌত্র হচ্ছেন ছন্দশ্রেষ্ঠ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সত্যেন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি ছিল শালিখায়। বিখ্যাত 'বাঙ্গালবাবু'-র (রামযতন বসু) বাড়ির জামাই ছিলেন তিনি। রামযতনের দুই ছেলে রামরতন ও রাজলোচন। রাজলোচনের পুত্র বিখ্যাত ঈশানচন্দ্র বসুর কন্যা কনকলতার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সেই সুবাদে হাওড়ার সঙ্গে কবির বেশ সৌহার্দ্য সম্পর্ক ছিল। জামাই শিবভক্ত বলে শ্বশুর নিজ বাড়িতে একটি শিব মন্দিরও তৈরি করেন। আজও বাঙ্গালবাবুর পোলের নিচে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পাশে বাড়িটি রয়েছে, রয়েছে শিব-মন্দিরটিও। আজ আর সে বাড়িতে কোন বঙ্গবাসীকে দেখতে পাওয়া যাবে না। মালিকানা পালটে গেছে।

হাওড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য (মুখোপাধ্যায়) 'হাওড়া হুগলীর কথা' ও 'রায়বাঘিনী' লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁরই ছেলে বাণীকুমার (আসল নাম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়) কলকাতা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বজন পরিচিত। মহালয়ার দিন মহিষাসুরমর্দিনীর স্তব পাঠ করে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র যে

খ্যাতি লাভ করেছিলেন তা বাণীকুমারেরই রচিত। বীরেন্দ্র কৃষ্ণের পরলোকগমন সংবাদে (৪ঠা নভেম্বর ১৯৯১) আনন্দবাজার পত্রিকা লিখছে—বীরেন্দ্রবাবুর মহিষাসুর মর্দিনীর স্তোত্রপাঠ করার ব্যাপারটি অবশ্য একেবারেই নাটকীয় এবং কাকতালীয়। বাণীকুমার স্ক্রিপট লিখেছিলেন। পঙ্কজ মল্লিক জুড়েছিলেন গানগুলি। দশ বছর বয়স থেকে চণ্ডী মুখস্থ থাকায় বীরেনবাবু অনেকটা নিজের মনেই স্ক্রিপটটি পড়ছিলেন। সেই সময়ই এক রকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঠিক হয়ে যায়, তিনিই মূল অনুষ্ঠানে স্তোত্রপাঠ করবেন। দুর্গাদাস লাহিড়ীর নাম অনেকেই ভুলে গেছি। পুরাতন পাঠাগারে আজও তাঁর অক্ষয় কীর্তি 'পৃথিবীর ইতিহাস' খুঁজে পাওয়া যাবে। একাধিক খণ্ডে লিখিত এই বইটিতে বিশ্বের ইতিহাসের খবর পাওয়া যাবে। এজন্য তিনি একটি ছাপাখানাও স্থাপিত করেছিলেন। তার নাম ছিল Albion Press. বেদের অনুবাদ তাঁর আর এক স্মরণীয় কাজ। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস সাত খণ্ডে সমাপ্ত করেই মারা যান।

বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক ছিলেন মোহিত লাল মজুমদার। জীবনের শেষের দিকে তিনি বছর চারেক হাওড়ার বাগনান গ্রামে কাটিয়ে গেছেন। বাগনান স্টেশনের রেল লাইনের ঠিক উত্তর দিকে লাল বাড়িটিতেই তিনি ছিলেন। এটি তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি ছিল। কবি জীবনীকার দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের মতে ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়ে রুগ্ন শরীর ভাল করবার জন্য সোজা তিনি বাগনানের 'লাল বাড়িতে' এসে ওঠেন। কিন্তু কবিপুত্র মনসিজ মজুমদার 'পিতৃ ও তর্পণ' প্রবন্ধে[৪০] লেখেন—চাকুরির মেয়াদ শেষ হবার এক বছর আগেই ১৯৪৩-এ বাবা অবসর নিয়ে চলে আসেন হাওড়া জেলার বাগনানে। সেখানে মোহিত লাল ১৯৪৪-৪৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এই বছরগুলিতে তিনি সারাদিন লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বাগনানে ভাড়া বাড়িতে এসে কবি বেশ কষ্টেই পড়েন। কবি স্ত্রী তরুলতা দেবী তাঁর জবানীতে বলছেন—ঢাকা থেকে চলে আসার পর হঠাৎ টাকা পয়সার বেশ ধাক্কা খেতে হল। তবে ও আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বাগনানে থাকবার সময় ওঁর উপার্জন ছিল শুধু লেখালেখি থেকেই। বাগনানে থাকাকালীনই কবির লেখা 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৯৪৫ সাল), 'বাংলার নবযুগ' (১৯৪৬ সাল), 'জয়তু নেতাজী' (১৯৪৬ সাল), কবি শ্রীমধুসূদন (১৯৪৭ সাল) লেখেন। এর মধ্যে 'বাংলার নবযুগ' প্রবন্ধের বইটি আজ দুষ্প্রাপ্য হলেও যে কোন শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিকে ইহা নাড়া দেবে। বাগনানের পর তিনি বড়িষায় চলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কবি জীবনের সঙ্গে হাওড়ার সম্পর্ক এখানেই শেষ হয়। কিন্তু কবির প্রথম জীবন সংগ্রাম যে এই জেলারই একটি অংশে শুরু হয়েছিল সেকথা, কিন্তু খুব কম পাঠকই জানেন। তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে সেই স্বল্প জানিত ঘটনাটির একটু বিবরণ দেওয়া হল। কবিবন্ধু কবি শেখর কালিদাস রায় 'চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল' প্রবন্ধে[৪১] লিখছেন—কবির যৌবন কালটাও স্বচ্ছল অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটেনি।

ছাত্র জীবনে অনেক সুবিধা সুযোগ পাননি। ছাত্রব্রত উদ্‌যাপনের আগেই চাকরি নিতে হয়েছিল। মাস্টারি করতে হয়েছে অনেক দিন।' এই মাস্টারিই শুরু করেন প্রথম হাওড়ার 'শালিখা হিন্দু স্কুলে'। সদ্য বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে (তখনকার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন) কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেই ১৯০৮ সালে এই স্কুলে যোগদান করেন একেবারেই সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে। সেই সময় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অচ্যুত দত্ত। এই অচ্যুতদত্তই পরবর্তী কালে এক প্রসিদ্ধ ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যক্ষ পদে আসীন হন। হিন্দু স্কুলে ঢোকার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯০৯ সালে মোহিত লালের বিবাহ হয়। বছর দেড়েক মোহিত লাল এই স্কুলে ছিলেন। তারপরই কমিটির সঙ্গে ছুটি জনিত দিনে মাইনে কাটা নিয়ে মনোমালিন্য হলে চাকরি ছেড়ে চলে যান।* এই মোহিত লাল সম্পর্কেই এ যুগের বিখ্যাত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত An Autobiography of an unknown Indian (1951) গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠায় 'মাষ্টার মশাই' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন—I remember him as something more than one of my teachers, for as Mohit Lal Mazumdar the distinguished contemporary poet and critic, he exerted a very strong and beneficial influence on my later life. He introduced me to the literary society of Calcutta and made a writer of me almost by main force.
একজন যোগ্য শিক্ষকের পক্ষে এহেন কৃতবিদ্য ছাত্রের লেখনী থেকে আর বেশি কি প্রশংসা পাওয়ার আছে!
বিংশ শতাব্দীর আর দুই জ্যোতিষ্ক ছিলেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও কালিদাস নাগ। একজন ভারত তথা বিশ্বখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অপরজন ইতিহাস-বিদ্‌। এঁদের উভয়েরই জন্মস্থান ছিল হাওড়ায়। শুধু জন্মস্থানই নয়—সুনীতি কুমারের জীবনের সঙ্গে হাওড়ার একটা নিবিড় যোগ ছিল। কারণ শিবপুর ছিল তাঁর মাতুলালয়। সুনীতিবাবু নিজের 'জীবন কথা'-য় লিখছেন—'১৮৯০, ২৬শে নভেম্বর ভাগীরথী বা গঙ্গার তীরে কলকাতার উপনগর হাওড়ার অধীনস্ত শিবপুর পল্লীতে মামার বাড়িতে আমি ভূমিষ্ঠ হই। শিবপুর এখন আমার এই ৮৬ বছর বয়সে সর্বগ্রাসী ক্রমবর্দ্ধমান। এখনকার কালে অতি নোংরা হাওড়া শহরের কবলে পড়েছে। কিন্তু আমার জন্মের সময় আর ছেলেবেলায় বহু বৎসর ধরে, যৌবনকাল পর্যন্ত শিবপুর ছিল কলকাতার পাশে অবস্থিত চমৎকার একটি

* মোহিত লালের জীবনের এই অনাস্বাদিত তথ্যটি আমাকে দিয়ে সহায়তা করেছেন উক্ত স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক পরেশ মিত্র মশায়। তিনি আরও জানান যে সে সময়ে বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন শালিখার বিশিষ্ট ধনাঢ্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি রাসবিহারী ঘোষাল। রাসবিহারীবাবু স্কুলের কোন এক অনুষ্ঠানে এই গল্পটি করেছিলেন। আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন ঐ স্কুলের অন্যতম প্রধান শিক্ষক কালীপদ গাঙ্গুলী। পরেশবাবু ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং পরে করণিক থেকে যোগ্যতা বলে শিক্ষক পদে উন্নীত হন। সুতরাং ঘটনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

পল্লী অঞ্চল।' সুনীতিবাবুর পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত। সুতরাং আর কোন বিশেষণ তাঁর পরিচয় দানে নিষ্প্রয়োজন। সুনীতিবাবুর পিত্রালয়ও ছিল উদয়-নারায়ণ পুরের সিংটী শিবপুর গ্রামে। ডঃ কালিদাস নাগও শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯১ সালে। ভারতে ইতিহাস গবেষণায় তাঁর অবদান স্বীকৃত। তাঁর রচিত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক এককালে স্কুলে ও উচ্চশিক্ষায় খ্যাতিলাভ করেছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণ সঙ্গী হওয়ার সুযোগ এবং রোমাঁ রলাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনের পরম সম্পদরূপে গণ্য হয়।

হাওড়ার বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ যে কেবল সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ রচনা করেই সে যুগে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তা নয়। ইংরাজিতে গ্রন্থ রচনায়ও কেউ কেউ খুবই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছিলেন। এই রকম একজন কবি ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। হাওড়া জেলার ইতিহাস-এর লেখক অচল ভট্টাচার্য লিখছেন—'হাফ-ওল্ড-বাঙ্গাল নামে অভিহিত কাশীপ্রসাদ ছিলেন খাঁটি ঘটি, পৈত্রিক নিবাস হাওড়া জেলার পৈতাল গ্রামে। শ্রীযুক্ত ঘোষের কবিতাটির নাম ছিল **Boatmen's Song to Ganga.** এই কবিতাটির প্রশংসায় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপেটন রিচার্ডসন* তাঁর উন্নাসিক দেশবাসী সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন— 'যে সব সংকীর্ণমনা ইংরাজ ভারতের নেটিভদের ছোট করে দেখেন, তাঁরা মন দিয়ে এই কবিতাটি পড়ুন। নিজেদের প্রশ্ন করুন—বিদেশী ভাষা দূরে থাক, নিজেদের মাতৃভাষাতেও কি তাঁরা এমন কবিতা লিখতে পারেন?'[৪২] ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ থিওডোর ডগলাস 'দি বেঙ্গলী বুক অব ইংলিশ ভার্স' নামে বাঙ্গালী কবিদের একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে সতের জন কবির কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতাটি সর্বপ্রথম ছাপা হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে লংম্যানস্ গ্রীণ এণ্ড কোম্পানীর প্রকাশিত এই বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর একজন হাওড়াবাসী অভয় চরণ দাস (শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ দাসের পিতা) **Indian Ryot—Land Tax, permanent Settlement and Famine** নামে একখানি বই লিখে সেকালে ইংরেজের চক্ষুঃশূল হয়ে গিয়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে কিভাবে এদেশে রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে হিংসাত্মক সম্পর্ক তৈরি করে খুনখারাবি ও হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়েছিল তার এক কঠোর সমালোচনা পূর্ণ আলোচনা এই বইটিতে আছে। বইটি ছাপা হয়েছিল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এই বইটি সে সময় এতই রাজনীতি ও অর্থনীতিবিদদের কাছে সমাদর লাভ করেছিল যে সুদূর লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত ভারত বিশেষজ্ঞ রুশ পণ্ডিত মিনায়েভ—সংগ্রহের মধ্যে আজও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হিসেবে রক্ষিত আছে। 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী

* তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর সর্বজন প্রশংসিত পুস্তক ছিল **Selection from English Poets** এবং **Literary Leaves.**

ভারতীয় বিপ্লবী গ্রন্থে' চিন্মোহন সেহানবীশ লিখছেন—বঙ্কিমচন্দ্র মিনায়েভকে তাঁর যে বইগুলি তাঁর নাম স্বাক্ষর করে উপহার দেন সেগুলিও সযত্নে রক্ষিত হয়েছে ঐ মিনায়েভ-সংগ্রহে। বইটিতে বিখ্যাত ভারত হিতৈষী রেভারেন্ড জেমস্ লঙের একটি স্বাক্ষরও আছে বলে চিন্মোহনবাবু উল্লেখ করেছেন। বইটি হয়তো মিনায়েভকে লঙ সাহেবই উপহার দিয়েছিলেন। এই অনুমানের স্বপক্ষে ঐ বইটিতেই তিনি আরও লিখছেন—'...রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর (লঙ সাহেবের) সম্পর্ক বহুদিনের। আয়ারল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম হলেও তাঁর শৈশব ও বাল্য কেটেছিল রাশিয়ায়। তিনি যখন পাকাপাকি ভাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে দেশে ফিরে যান তখনও তিনি তৃতীয়বার ভ্রমণ করেন রাশিয়ায়।' অভয়বাবু হাওড়া শহরে থাকলেও আদি নিবাস ছিল মাজু গ্রামে।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ও উপন্যাসে শংকরের (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়) নাম আজ পাঠক মনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর বহু উপন্যাস পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীগুলি পাঠকের মনকে নতুন নতুন খবরে ও সাহিত্যরসে আপ্লুত করে। এই শংকর সাহিত্যকে পেশা হিসাবে না নিলেও নেশা হিসেবেই বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তিনি আশৈশব থেকে আজও পর্যন্ত হাওড়া—শিবপুরের বাসিন্দাই রয়ে গেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে প্রায়শই কিশোর জীবনের বিদ্যালয়ের মধুর স্মৃতি ও তাঁদের বাড়ি কাসুন্দিয়া অঞ্চলের স্মৃতিগুলি যেন বার বারই ফিরে এসেছে! জন্মভূমি হাওড়াকে তিনি যেন মাতৃসমা বলে মনে রেখেছেন। তাঁর 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের কথা সাহিত্য পিপাসু মানুষই অবগত আছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চেয়ারের প্রথম প্রফেসার হচ্ছেন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক, প্রবন্ধকার ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৮ খণ্ডে) তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাংলা সাহিত্যে প্রাদেশিক, বিদেশী, এমনকি আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব যে কিভাবে সমন্বয়ী অন্বয়ের মত কাজ করেছে তা বিশ্লেষণে তিনিই একমাত্র নজির হয়ে আছেন। কর্মক্ষেত্রে অবসর নিলেও মাতৃভাষা চর্চায় এখনও তিনি সমান তালে সাহিত্য একাডেমীর পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলের চেয়ারম্যান হয়ে যৌবনোচিত উপায়ে কাজ করে যাচ্ছেন। স্কুল জীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বাংলা পরীক্ষায় তিনি কোনদিন দ্বিতীয় হননি। হাওড়ার বাসিন্দা হিসেবে নিজে গর্ব বোধ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী' প্রফেসার হলেন হাওড়ার (ওলাবিবি তলার) শংকরী প্রসাদ বসু। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সারদা মা পরিমণ্ডল নিয়ে গবেষণা ও আলোচনায় মেরী লুইস বার্ক-র (গার্গী) পরই তাঁর স্থান। রমনীয় ক্রিকেট থেকে তিনি গুরুগম্ভীর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে তাঁদের আলোতে নিজেকেও পাঠক মহলে উদ্ভাসিত করে তুললেন। ১৯৮৬ সালে বিবেকানন্দ বিষয়ক মৌলিক গবেষণার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকে

শংকরীবাবুকে 'বিবেকানন্দ পুরস্কারে' ভূষিত করা হয়। উল্লেখ্য, মেরী লুইস বার্ক-র পর শ্রীবসুই প্রথম এই পুরস্কার পেলেন। বৈষ্ণব রস সাহিত্যে মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

হাওড়া জেলা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদে ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ই অদ্যাবধি একমাত্র উদাহরণ যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য বিভাগের প্রথম সচিব হন। স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ও নাটকে লৌকিক ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতি প্রভাব বিষয়ক গবেষণা করে পণ্ডিত সমাজে নিজ আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ব্যাপারে কানাডা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করে এসেছেন। শিবপুরের বাসিন্দা হিসেবে জীবন কাটাচ্ছেন।

অপর এক ঐতিহাসিক হচ্ছেন ডঃ ননীগোপাল চৌধুরী। গ্রিফিথ পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীচৌধুরী শিবপুরের প্রাচীন বাসিন্দাদের অন্যতম। ব্রিটিশ রিলেশন্স উইথ হায়দারাবাদ ও কার্টিয়ার গভর্ণর অব বেঙ্গল দুটি ইংরেজি পুস্তকই পণ্ডিত সমাজে আদৃত। 'সাহেনসা আকবর' বাংলা বইটি বহুল প্রশংসিত। শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

এবারে চারজন উপাচার্যের নাম করা হচ্ছে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সারস্বত প্রাঙ্গণে স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে সুনামের সঙ্গে কাজ চালিয়ে জেলার খ্যাতি বৃদ্ধি করেছেন। এঁরা হচ্ছেন ভাণ্ডারগাছি গ্রামের ডঃ মণি চক্রবর্তী, আমতা জয়পুরের বাসিন্দা ডঃ অরবিন্দ বসু, হাওড়া শহরের ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণপুরের প্রাচীন বাসিন্দা ডঃ নিমাই সাধন বসু।

তৈল বিশেষজ্ঞ গবেষক ডঃ চক্রবর্তী কল্যাণী বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে দীর্ঘদিন আসীন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাজ্য-রাজনীতি ও শিক্ষক সংস্থার সক্রিয় দায়িত্ব নিয়ে সমানভাবে কাজ চালিয়ে গেছেন।

খাদ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ডঃ অরবিন্দ বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাজ করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। ভারতে বেশ কয়েকটি এগ্রো কালচার প্রোজেক্ট তাঁর পরিচালনায় চলছে।

আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায় (মৃত) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুরেন্দ্রনাথ চেয়ার অধ্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর কতিপয় পুস্তক পণ্ডিত জনের দ্বারা সমাদৃত।

ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিকরূপে ডঃ নিমাই সাধন বসু সবার আলোচিত নাম। কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে আসীন হয়ে সেই নাম আরও সুনামে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস বিষয়ক বক্তৃতাদানে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ তাঁর বিদ্যামত্তার স্বীকৃতি প্রমাণ করে। জেলার ইতিহাস রচনার কাজে তারাপদ সাঁতরা (বাগনান) একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারে ও সংরক্ষণে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। হাওড়া ছাড়া অন্য জেলা সম্বন্ধেও ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

হাওড়া সাঁত্রাগাছি নিবাসী ডঃ কানাই লাল ভট্টাচার্য রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি. ফিল উপাধি পান। কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্র হয়েও দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামেই নিজেকে নিয়োজিত করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে ফরওয়ার্ড ব্লকের কাজে ব্রতী হন। একাধিকবার রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে কাজ করেছেন। সাপের বিষ প্রতিরোধে তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধের নাম 'ডঃ ভট্টাচার্য'স মালটিপল ভেনস'।

আর এক সাহিত্যের গবেষক হচ্ছেন অধ্যক্ষ সন্তোষ রায়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক গবেষণায় তিনি খ্যাতি লাভ করেন। আমতার—খরিয়প নিবাসী বিখ্যাত অর্থ-নীতিবিদ ডঃ সরোজ কুমার বসুর নামও এখানে উল্লেখ্য। তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হত। বালির এক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক হিসেবে খুব নাম ছিল। তাঁর লেখা এক কালে নিয়মিত প্রকাশ হত বসুমতী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর 'দুই কবি—অরবিন্দ ও রবীন্দ্র' উল্লেখ-যোগ্য বই। কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সুধাংশু বাবুকে দিয়ে তাঁর 'বিচারক' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ করে পেপার ব্যাক বই ছেপে ছিলেন। কারো কারো মতে তারাশঙ্কর বাবু নাকি ঐ বইটির ইংরেজী সংস্করণ নোবেল প্রাইজের বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বইটি এককপি বালির নিশিকান্ত চ্যাটার্জীর কাছে দেখতে পাওয়া যাবে।

এবারে জেলার কয়েকজন কবির নাম করা যাক। প্রথমেই প্রখ্যাত প্রবীণ কবি ও শিল্পানুরাগী বিষ্ণু দের কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলা ও ইংরেজীতে অনেক পদ্য গদ্য লিখেছেন। সাহিত্য কীর্তির জন্য 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার 'রুশতী পঞ্চশতীর' জন্য সোভিয়েট ল্যাণ্ড পুরস্কার পেয়েছেন। হাওড়ার পাতিহাল গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রামবাসীরা তাঁর স্মৃতিতে বিষ্ণু দে মঞ্চ স্থাপন করেছেন।

হাওড়া জেলার তিরিশের দশকের নামী কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন দিনেশ দাস। ১৯৩৮ সালে 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হলে পাঠক সমাজে তিনি 'কাস্তে কবি' নামেই সমধিক পরিচিত হন। প্রথম জীবনে দেউলি হাইস্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু—মাঝখানে সাংবাদিকতা করলেও জীবন শেষ করেন চেতলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে। 'রাম গেছে বনবাসে' বইটির জন্য ১৯৮৩ সালে বারীন্দ্র পুরস্কার পান। আমতায় আনুলিয়া গ্রামে কবির জন্ম।

এছাড়া জেলার উল্লেখযোগ্য আধুনিক কবিদের মধ্যে আছেন অপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (নারিট), বটকৃষ্ণ দাস (হাওড়া), সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় (শিবপুর), গোবিন্দ পদ মুখোপাধ্যায় (শিবপুর), শিবেন চট্টোপাধ্যায় (শিবপুর), অজিত

বাইরী (উদয়নারায়ণ পুর), ডঃ নীরেন্দু হাজরা (উদয়নারায়ণপুর), শঙ্করক্ষিত (শিবপুর), নিমাই মান্না (আমতা চাকপোতা), অশোক চট্টোপাধ্যায় (শালিখা), সুনীল হাজরা (হাওড়া), সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (শালকিয়া, বর্তমানে ইউরোপে)।

গল্প উপন্যাসের নাম করা লেখকদের সংখ্যাও হাওড়ায় কম নেই। শরৎ সাহিত্য বিষয়ক লেখক গোপাল রায় এই জেলারই আমতা রামচন্দ্রপুর গ্রামের মানুষ। বিনীতা বন্দোপাধ্যায় (সুকন্যা, সাঁত্রাগাছি) বাংলা দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির অন্যতমা পথিকৃৎ। তাঁর নুরজাহান, ক্লিওপেট্রা, কুমারী রানী এলিজাবেথ ও নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতি উপন্যাসের কথা এখনও পাঠকের মনে আছে। আধুনিক দুই বিশিষ্ট গল্প লেখক হচ্ছেন হাওড়া নলপুরের রতন ভট্টাচার্য ও (অধ্যাপিকা) বাণী বসু (শালকিয়া)। মমের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প অনুবাদ দিয়ে শুরু করলেও আজ তাঁর গল্প সাহিত্যিক মহলে সারা ফেলেছে। তাঁর অন্তর্ঘাত বইটির জন্য ১৯৯১ সালে 'তারাশংকর স্মৃতি পুরস্কার' প্রথম তিনিই লাভ করেন। এক্ষেত্রে শিবপুরের 'নিরক্ষর' উপন্যাস খ্যাত চরণদাস ঘোষ ও ঐ অঞ্চলেরই কল্লোল যুগের কবি সন্ন্যাসী সাধুখাঁর নাম সাহিত্যের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। এছাড়া শিবপুরের রামপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে উপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে পাঠক সমাজে বেশ পরিচিত। অপর চার গবেষক ও প্রবন্ধকার হাওড়ার তথা বাংলার সারস্বত প্রাঙ্গনেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন ডঃ দুর্গা শংকর মুখোপাধ্যায় সাঁত্রাগাছি, ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত (রামকৃষ্ণপুর), ডঃ সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় (রামরাজাতলা) ও অধ্যক্ষ ডঃ অশোক কুণ্ডু (পুরানো শ্যামপুর)। গল্পকার শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাওড়ার আধিবাসী ছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শালকিয়ায় এক প্রসিদ্ধ নাট্যকারের জন্ম হয়েছিল। তাঁর নাম আজ স্মৃতির অন্তরালেই প্রায় চলে গেছে। তিনি হচ্ছেন হরিশ চন্দ্র মিত্র। জন্ম ১৮৩৮-৩৯ সাল। সাংবাদিকতা ও বহু সাহিত্য পত্রিকা নিজ হাতে পরিচালনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু তাঁর নাটকগুলি একদা দর্শক সমাজে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক ছিল—হাস্যরস তরঙ্গিণী, ম্যাও ধরবে কে ? ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে, কীচক বধ-কাব্য, নির্বাসিতা সীতা, বিধবা বঙ্গাঙ্গনা ও হতভাগ্য শিক্ষক প্রভৃতি।

শিশু সাহিত্য সৃষ্টিতেও হাওড়া জেলার মানুষ পেছিয়ে থাকে নি। 'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন'—এর কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নাম সুবিদিত। তাঁর টুকটুকে রামায়ণ সে কালে কে না পড়েছে। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রশংসা করেন। বঙ্কিম চন্দ্রও নবকৃষ্ণের কবি প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে ভোলেন নি। নবকৃষ্ণবাবুর 'শিশু রামায়ণ' কবিতার বইটি পড়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র বলেছিলেন—'ছোটদের কাছে

বিদেশের গল্প বলার আগে নিজের দেশের গল্প বলা উচিত। এই বই সুন্দর হয়েছে। দেশের ছেলেদের খুবই উপকার হবে, তারা আনন্দ পাবে।' নবকৃষ্ণ বাবু আমৃত্যু আমতা নারিটের বাসিন্দা ছিলেন। পিতা রাজনারায়ণ তর্কবাচস্পতিও সে যুগের নাম করা পণ্ডিত ছিলেন। আর এক প্রবীণ শিশু সাহিত্যিক ছিলেন যামিনী কান্ত সোম। শিশু ও কিশোরদের জন্য অনেক কবিতা গল্প ও জীবনী গ্রন্থ লিখে গেছেন। বিশ্ব কবির জীবিতকালে 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' নামে কবির প্রথম ছোটদের জীবনী তিনিই লেখেন। এই বইটি হিন্দী ও উর্দুতে পর্যন্ত অনুদিত হয়।[৪৩] মেটারলিংকের 'ব্লুবার্ড' অবলম্বনে তাঁর লেখা 'নীলপাখী' এককালে কিশোরদের মনে সাড়া জাগানো বই ছিল। এই যামিনীবাবু মেদিনীপুরে জন্মালেও অবসর জীবনে বহু বছর রামকৃষ্ণপুরে থেকেই মৃত্যুবরণ করেন।

ছোটদের জগতে 'বিষ্ণু শর্মা' নামটি খুবই পরিচিত নাম। তাঁর শিকারের কাহিনী, গোয়েন্দা কাহিনী ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ শিশু ও কিশোরদের অতি প্রিয় ছিল। আসল নাম ছিল বিশু মুখোপাধ্যায়। বসুমতী পত্রিকায় ছোটদের পাতার তিনি ছিলেন পরিচালক। বিশুবাবু ছিলেন হাওড়া চন্দ্রভাগা গ্রামের অধিবাসী। তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায়।

'অরুণ বরুণ কিরণমালার'-র নাম শিশু সাহিত্য দরদী মাত্রই জানেন। ছোটদের মনের মতো করে লিখতে শৈলেন ঘোষ সিদ্ধ হস্ত। শিশুদের নাটক রচনা ও নির্দেশনায়ও তাঁর মুন্সিয়ানা আজ শিশু রঙ্গমঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত। মণিমেলা মহাসম্মেলনে 'রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে' ১৯৬৪ সালে মণিভাই বোনেরা 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' নাটকটি অভিনয় করল তাঁরই নির্দেশনায়। এই নাটকটির জন্যই ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমী থেকে শৈলেনবাবু রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। শৈলেনবাবু তাঁর শিশু সাহিত্যের স্বীকৃতি রূপে 'মৌমাছি ট্রাস্ট' প্রদত্ত 'মৌমাছি পুরস্কার'ও লাভ করেন। স্মরণ রাখা যেতে পারে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক মণিমেলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতে শিশু ও কিশোর আন্দোলনের ভগীরথ 'মৌমাছি'-র (বিমল ঘোষ) নামে প্রতি বছর সেরা শিশু সাহিত্যিককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই শৈলেন ঘোষ হাওড়া-শালিখায় কিশোর ও যৌবন কাটিয়ে প্রৌঢ়ত্বে বাসা বেঁধেছেন বেহালায়। হাওড়ার আর এক খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক হচ্ছেন ভবানী প্রসাদ মজুমদার।

পরিশেষে বিজ্ঞান গবেষণায় হাওড়ার মনীষার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান জগতে হাওড়ার যিনি খ্যাতি ছড়িয়ে ছিলেন দেশে বিদেশে তিনি হচ্ছেন স্মরণীয় ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সেদিনের সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি আজ এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বীক্ষণাগারে বসেই বিজ্ঞানী সি. ভি. রমণ তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য আন্তর্জাতিক 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। বিশ্ব বিজ্ঞানে ভারতীয়দের অবদান

প্রতিষ্ঠিত করেন। ডাঃ সরকার নিজে একজন প্রখ্যাত এলোপ্যাথ চিকিৎসক হয়েও তিনি পরবর্তীকালে হোমিও চিকিৎসাতেই জীবন শেষ করেন। এজন্য তাঁকে অ্যালোপেথিক চিকিৎসক সমিতি থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে আমৃত্যু হোমিও চিকিৎসা করে যান। তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান স্বরূপ। তাঁরই হাতের স্নেহস্পর্শে গড়ে উঠেছিল কলকাতার ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনি অন্যতম চিকিৎসক ছিলেন। এই মহেন্দ্রনাথ ছিলেন হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত পাইক পাড়া গ্রামের অধিবাসী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ চর্চা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়ে গেছেন।

হাওড়া শহরের প্রখ্যাত চিকিৎসকের সংখ্যাও নগন্য নয়। বালির অধিবাসী ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জীর নাম দেশ-বিদেশে খ্যাত। শল্য চিকিৎসক হিসেবে তিনি এক সময় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। শল্য বিদ্যায় তাঁর অশেষ খ্যাতি থাকলেও প্যাথলজি ও এনাটমিতেও তিনি সব্যসাচীর মত কাজ করে গেছেন। হাওড়ার শিবানন্দ বাটীতে জন্ম হলেও মধ্য হাওড়ার কালী প্রসাদ ব্যানার্জী লেনে দীর্ঘদিন বাস করতেন। আর এক দিকপাল চিকিৎসক ডাঃ মণি দে। তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক বিজ্ঞানী। M. N. Dey, K. D. Chatterjee লিখিত প্যাথলজির বই ভারতের বাইরেও পড়ান হয়। উপরন্তু তিনি ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। এই কালী প্রসাদ ব্যানার্জী লেনের আর এক খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। ভারত বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ যজ্ঞেশ্বরবাবু ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসক-বিজ্ঞানী। হাওড়ার গড়ভবাণীপুর গ্রাম আর এক ভারত বিখ্যাত চিকিৎসকের জন্ম দিয়েছিল —তাঁর নাম ডাঃ সত্যবান রায়। চক্ষু, নাসিকা ও দাঁতের চিকিৎসক রূপে তিনি ছিলেন ভারত বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। একসময়ে তিনি লোকসভার সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। মধ্য হাওড়ার অধিবাসী ডাঃ শম্ভু মুখার্জী একজন প্রখ্যাত রেডিওলজিস্ট ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও কোর্স চালু করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী হাওড়া-মাকড়দহের বাসিন্দা ডাঃ এস. এন. ব্যানার্জী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান চিকিৎসা বিভাগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী গবেষক গিরীন্দ্র শেখর বসুর সহকর্মী ছিলেন। হাওড়ার অপর এক খ্যাতনামা ফিজিওলজির অধ্যাপক ও গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন ডাঃ চণ্ডী চরণ চ্যাটার্জী। তাঁর ফিজিওলজির বই বহুল পঠিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন চিকিৎসক-বিজ্ঞানী। বাজে শিবপুরের অধিবাসী ডাঃ তড়িৎ কুমার ঘোষ চিকিৎসা জগতে একটি সদাপ্রশংসিত নাম। ডাঃ ঘোষও ছিলেন একজন চিকিৎসক-বিজ্ঞানী। তাঁরই হাতে গঠিত হয় বাঙ্গুর ইনষ্টিটিউট অব নিউরোলজী বিভাগটি। মধ্য হাওড়ার কালী ব্যানার্জী লেনের আর এক বিশিষ্ট সমাজ দরদী সংগঠক চিকিৎসক হচ্ছেন ডাঃ দীনবন্ধু

ব্যানার্জী। চিকিৎসাক্ষেত্রে ও সমাজ কল্যাণের কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে তিনি ডঃ বিধান চন্দ্র রায় জাতীয় পুরস্কার (১৯৮০) এবং শিশু কল্যাণ নেহরু ফেলো (১৯৮৯) পুরস্কৃত হন। এখনও জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে হাওড়ার গ্রামে গঞ্জে কাজ করে চলেছেন নিরলস ভাবে। অস্থি চিকিৎসায় বালি গ্রামের বাসিন্দা ডাঃ এম. এস. ঘোষ এক সর্বভারতীয় নাম। দেশ বিদেশে তিনি আজ একজন প্রথম শ্রেণীর অস্থি চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। অপর এক চিকিৎসক গবেষক হচ্ছেন শিবপুরের বিখ্যাত বনেদী ঘরের ছেলে ডাঃ চন্দন রায় চৌধুরী। লাংস্ ফাংসানের ওপর গবেষণার নতুন তথ্য উদ্ভাবন করে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। সংগঠনেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মৃতপ্রায় এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের কথা পণ্ডিত ব্যক্তিদের দীর্ঘ দিনের সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। ডঃ রাধা গোবিন্দ কর ছিলেন হাওড়া সাঁত্রাগাছির বাসিন্দা। তিনি একসময়ে কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই নামে আজকের আর. জি. মেডিক্যাল কলেজ নামাঙ্কিত হয়েছে।

হাওড়া শালিখার আর এক বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ ননীলাল ঘোষ। যক্ষারোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ঘোষ ছিলেন হাওড়া রেডক্রশ সোসাইটির প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক এবং হাওড়া টিবারকুলেসিস এসোসিয়েশনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা অবৈতনিক সম্পাদক (১৯৫৪)। হাওড়া জেনারল হাসপাতালে চেস্ট ক্লিনিক বিভাগটি তাঁরই উদ্যোগে প্রবর্তিত হয়। মালিপাঁচঘরায় বিমল কুমার ব্যানার্জী ও নন্দরানী চেস্ট ক্লিনিক স্থাপন তাঁর এক অমর কীর্তি। যক্ষারুগীর চিকিৎসায় তিনি ছিলেন জেলার একমাত্র নিবেদিত প্রাণ, চিকিৎসক ও পরম বন্ধু।
এবার জেলার কয়েকজন খ্যাতনামা হোমিও চিকিৎসকেরও নাম করতে হয়। শুধু হাওড়ার নয়—পূর্ব ভারতের বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ গঙ্গাধর মুখার্জী। চিকিৎসা বিদ্যায় ও হৃদয়ে তিনি ছিলেন শিবতুল্য। অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে মানব দরদী চিকিৎসক রূপে জেলায় স্মরণীয় হয়ে আছেন। হাওড়ার কালী-বাবুর বাজারের কাছে তিনি থাকতেন। অপর হোমিও চিকিৎসক ছিলেন শিবপুরের ডঃ দীনবন্ধু মুখার্জী। ধন্বন্তরি চিকিৎসক বলে রুগীরা তাঁকে মনে করতেন। কাসুন্দিয়া নিবাসী হোমিও চিকিৎসক ডঃ নিতাই চরণ চক্রবর্তী হোমিও চিকিৎসা জগতে এক বিশিষ্ট নাম। তাঁরই হাতে গড়া হাওড়ার প্রথম হোমিও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য) তাঁর কীর্তির কথা ঘোষণা করছে। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হচ্ছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী। সর্বভারতীয় হোমিও চিকিৎসক জগতে নিজের যোগ্যতায় সুদৃঢ় স্থান করে নিয়েছেন। ১৯৮৩ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জইল সিং পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রথম হোমিও চিকিৎসক হিসেবে নিয়োজিত হয়ে শ্রীচক্রবর্তী হাওড়া তথা পশ্চিম

বাংলার হোমিও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নজির সৃষ্টি করেছেন। বালির হোমিও চিকিৎসক মতিবাবুর নাম এক আমলে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। সবে শেষে দুজন বিশিষ্ট কবিরাজের কথা বলেই এই অধ্যায়টি শেষ করা হবে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা ও দ্বিতীয় জন হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য ঠাকুর। শ্রীশর্মা ছিলেন ধবল ও শ্বেতী রোগের অদ্বিতীয় চিকিৎসক। হাওড়া কুষ্ঠ কুটির তাঁরই অমর স্মৃতি বহন করে চলেছে। শ্রীচৈতন্য ঠাকুর হচ্ছেন ভারতীয় বনৌষধি বিশারদ। তাই তাঁকে 'আয়ুর্বেদাচার্য' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। শিবকালী ভট্টাচার্য তাঁর 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' পুস্তকটি তাঁর নামেই উৎসর্গ করে সঙ্গত কাজই করেছেন।[৪৪]

১. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ভারতচন্দ্র—ডঃ মদন মোহন গোস্বামী।
৭. ঐ
৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড—সুকুমার সেন।
৯. বঙ্গীয় নাট্যশালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০. ঐ
১১. ঐ
১২. মানব সাগর তীরে—শংকর—আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় ১.১১.৯১।
১৩. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ।
১৪. ঐ
১৫. West Bengel Dist. Gazetteers—Howrah. Amiya K. Banerjee.
১৬. ঐ
১৭. ঐ
১৮. ঐ
১৯. ঐ
২০. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস (১ম খণ্ড) —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২১. ঐ
২২. West Bengal Dist. Gazetteers—Howrah. Amiya K. Banerjee.
২৩. প্রচলিত হিন্দী—মহাবীর প্রসাদ ত্রিবেদী।
২৪. ঐ
২৫. ঐ
২৬. ঊনবিংশ শতাব্দীর নব চেতনায় হাওড়ার ভূমিকা—অচল ভট্টাচার্য।
২৭. সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৮. পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিন বিহারী গুপ্ত।
২৯. ঐ

৩০. বিপিন বিহারী গুপ্তর জীবন কথা—পুরাতন প্রসঙ্গ।
৩১. ঐ
৩২. ঐ
৩৩. শরৎ স্মৃতি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবাসী কার্তিক সংখ্যা।
৩৪. যুগান্তর—চরিত্রহীন—এর পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলেছিল পাড়ার লোকেরা ১০.৯.৮৯.
৩৫. শরৎচন্দ্র—মানুষ ও শিল্প—রাধারানী দেবী।
৩৬. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।
৩৭. জীবন স্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩৮. হাওড়ার গৌরব কাহিনী—সলিল মিত্র।
৩৯. বালী সাধারণী সভা—শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৯৮১।
৪০. দেশ ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৯।
৪১. শনিবারের চিঠি—ভাদ্র ১৩৫৯।
৪২. উন বিংশ শতাব্দীর নব চেতনায় হাওড়ার ভূমিকা—অচল ভট্টাচার্য।
৪৩. সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান—সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলিবসু।
৪৪. হাওড়ার খ্যাতিমান কিছু চিকিৎসক—ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—Souvenir 13th Annual State Conference Howrah 1984 [S. T. E. A.]।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি হাওড়া জেলার দুটি স্থান ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। তার মধ্যে দক্ষিণে ছিল বিখ্যাত বেতড় বন্দর আর উত্তরে ছিল ঘুষুড়ি অঞ্চল। ইতিপূর্বে বেতড় বন্দরের গুরুত্ব বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমানে ইংরেজদের যে আটত্রিশটি গ্রাম দান করা হয়েছিল তাতে বাট্টার (বেতড়) বন্দরের রাজস্ব অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশ বেশি ছিল। এতেই বোঝা যায় যে এই বন্দরের গুরুত্ব সে সময় কেমন ছিল। ১৯৫১ সালের ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সাস্ হ্যাণ্ডবুকে 'হাওড়া' সম্বন্ধে এ. মিত্র. লিখেছেন—**Betor was well-known as the place of anchorage of large sea-going vessels, particularly of the Portuguese, furthest up the river.**[১]

ইংরেজ শাসনের পূর্বে এদেশের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। হাওড়া জেলা বিভিন্ন গ্রামে যে সব উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য ছিল তা দুটি স্থানের মাধ্যমে কেনাবেচা হত—এমনকি বাইরেও রপ্তানি হত। কেন্দ্র দুটি ছিল বেতড় ও ঘুষুড়ি। অমিয় ভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'হাওড়া' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—**Betor in the South and Ghusuri in the North, inside the present city of Howrah were such important markets before the end of the 15th century.** বঙ্গদেশের উর্বর পলিমাটিতে যে প্রচুর ফসল হত তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এসব জায়গার বাণিজ্যিক গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে এদেশের শিল্প বাণিজ্যের ধারা স্বাভাবিক কারণেই পাল্টে যায়। সংগঠিত মূলধনের প্রভাবে যান্ত্রিক শিল্পের প্রবর্তনে স্থাপিত হয় বড় বড় কলকারখানা ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র যার ছোঁয়াচ হাওড়ার গায়ে ভালভাবেই লেগেছিল।

ইউরোপীয় বণিকরা বিশেষ করে ইংরেজরাই কলকাতায় প্রথম বসতি স্থাপন করে এসেছে। রাতারাতি শিল্প কারখানা সৃষ্টিতে ও খনিজ সম্পদ উদ্ধারে প্রথমে তারা তেমন আগ্রহ দেখায় নি। তবে আগ্রহ প্রকাশ করল কলকাতার আশেপাশে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি কেন্দ্র স্থাপনে। কারণ দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রা করে এদেশে জাহাজ পৌঁছলে স্বাভাবিক কারণেই তার মেরামতি ও যন্ত্রপাতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজন হয়ে পড়তো। তাই কলকাতা শহরের বিপরীত দিক নগর হাওড়া অঞ্চলেই জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির জন্য উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই স্থান নির্বাচনে আর একটি ভৌগোলিক কারণ ছিল—এই তীরে প্রাকৃতিক উপায়ে গঠিত দীর্ঘ নালা ও পলিমাটি গঠিত নদীর প্রশস্ত তীর। প্রকৃতপক্ষে, কলকাতা শহরকে সচল ও সবল রাখবার জন্য অপর তীর হাওড়াকে কলকাতার 'ওয়ার্কসপ' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই চিন্তাধারার আজও ছেদ পড়েনি।

ইউরোপীয়দের উদ্যোগে শালিখায়ই প্রথম এ বঙ্গে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। হাওড়া ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারের-এর লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'১৭০৬ সালে হাওড়ার তীরে জাহাজ মেরামতি ও তলা পাল্টানোর ব্যাপারে এক বিশেষ সমীক্ষা করা হয়। তারও অনেক পরে ১৭৯৬ সালে 'অরফিউস' (orpheus) নামে একটি ফ্রিগেট জাহাজকে শালকিয়ার ডকে ভেড়ান হয় মেরামত করার জন্য। এই ডকইয়ার্ডটি জনৈক ইউরোপীয় মিঃ বেকন (Mr. Bacon) সাহেবের নামে ছিল।'

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ডক তৈরির কাজে আরও জোর দেওয়া হল। কারণ দক্ষিণ ভারতে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। জাহাজে করে সেখানে তাড়াতাড়ি মাল পাঠানোর তাগিদে শালকিয়া অঞ্চলে আরও ডকইয়ার্ড তৈরি হতে শুরু করল। সে যুগের নাম করা ডক ছিল গোলাবাড়ির কাছে জেমস্ ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ডক। এটি তৈরি হয়েছিল ১৮০০ সালে।[২]

পরের বছরই তিনি আরও একটি ডক তৈরি করলেন। প্রাচীনরা আজও এই স্থানটিকে 'জোড়াডক' (Union Dock) বলে' থাকেন। গোলাবাড়ি থানার পেছনে ম্যাকেঞ্জি লেনের অবস্থিতি তার কথা আজও স্মরণ করিয়ে দেয়। আর ম্যাকেঞ্জি সাহেবের প্রাসাদতুল্য গঙ্গার ধারে বাড়িটিতে (গোলাবাড়ি থানার পেছনে) আজ শালিখার পুরাতন অ-বঙ্গবাসী বাসিন্দা জালান পরিবারের লোকেরা বাস করছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ডক ও জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায়ে ইউরোপীয়রা প্রচুর অর্থোপার্জন করতে থাকলে কতিপয় দুঃসাহসিক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীও ঐ পথে ঝুঁকি নিতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতার তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।* তারকনাথবাবু কলকাতার বাসিন্দা হলেও তাঁর ডক ইয়াডটি ছিল শালকিয়ার গোলাবাড়ি অঞ্চলে। আগে এটি ডক ছিল না। ১৮১০ সালে বিচ্ক্যাম্প (Beauchamp) নামে জনৈক সাহেব একটি 'নকসা জাহাজ' (Patent ship) কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করেন। পরে তিনি এটি তারকবাবুর কাছে বিক্রী করে দিয়ে দেশে যান। তারকবাবু সেটিকে পরে 'ডকে' রূপান্তরিত করেন। এই ডকটির নামকরণ করা হয় 'ক্যালিডনিয়ন ডক'। ১৮১৫ সালে গোলাবাড়ি অঞ্চলে জর্জ ওয়াকার (George Walker) নামে এক সাহেব 'কমার্সিয়াল ডক' নামে আরেকটি ডক তৈরী করেন। এটি পরে খুরুটের ব্যবসায়ী রাধামোহন প্রামাণিক কিনে নেন। এতদিন পর্যন্ত কলকাতার পাশে অর্থাৎ ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলেও ডক ছিল। তাই শালকিয়া অঞ্চলে ডকের ঘনত্ব কম ছিল। কিন্তু ১৮২৩ সাল নাগাদ স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরী হবার ফলেই ঐ ডকগুলিকে পাততাড়ি গোটাতে হয়। কিন্তু তাঁরা ব্যবসা তুলে দিলেন না। ডকগুলি স্থানান্তরিত হয়ে পাড়া গাড়লো হাওড়ার

* এই তারকনাথবাবু ছিলেন হাওড়া খুরুটের অধিবাসী—দ্রঃ নগর হাওড়া—অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়।

উপকূলে শিবপুর থেকে ঘুষুড়ি পর্যন্ত। তারক প্রামাণিকের দেখাদেখি রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডু (উভয়ে মধ্য-হাওড়ার অধিবাসী) ডক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বাঙ্গালী অংশীদারী কারবারের যে দশা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। যোগনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩৮০, ২৫শে শ্রাবণ সংখ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় লিখেছেন 'সালকিয়ায় ১৮৪৯ সালে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ডক' নির্মাণে করেন রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডু (মধ্য হাওড়ার)। কিন্তু অংশীদারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ১৮৬৫ সালে ঐ ডক বন্ধ হয়ে যায়।' এইভাবে ১৮৭২ সালের মধ্যে হাওড়া থেকে ঘুষুড়ির মধ্যে আটটি ডক গড়ে ওঠে।* ১৮৪৭ সালে আলবিয়ান ডক নামে একটি ডক তৈরি করেন হাওড়ার পীতাম্বর মুখার্জী রবার্টস ও গ্ল্যাডস্টোনকে অংশীদার করে।
১৮৪২ সালে কলকাতার রাধানাথ মল্লিকের উদ্যোগে ও জনৈক রিড (Reid) সাহেবের সহযোগিতায় শালকিয়ায় হুগলী ডক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর পুত্র জয়গোপাল মল্লিক ঐ ডকের মালিক হন।

মোট কথা বঙ্গদেশের জাহাজ তৈরি ও মেরামতি কেন্দ্র প্রথম গড়ে ওঠে এই হাওড়া-শালিখায়। তারক প্রামাণিক মহাশয় যে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন তার প্রধান উৎস ছিল এই শালিখায় ডক ব্যবসা। তাঁর প্রধান কাজ ছিল জাহাজ সারানো ও জাহাজের পুরনো পেতল ও তামার চাদর পাল্টানো। শুধু কি তাই ? জলের ওপরে জাহাজ সারিয়ে যেমন লাভ হত তেমনি জলের তলায় মাটি বিক্রী করেও বেশ লাভ হত। এভাবে তারকবাবু যে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ এই শালকিয়ার মাটি থেকে রোজগার করেছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থের 'প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক' পুস্তকে। তিনি লিখেছেন—'এই ডকের কার্যে তারকনাথের বিপুল ধনাগম হইত। কোন কোন সময় ইহাতে অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লব্ধ হইত। ডকের তলভাগস্থ মাটিতে বহু পিতল ও তাম্রের পেরেক প্রভৃতি পতিত হইত। উক্ত মাটি বিক্রয় করিয়াও মালিকগণ কিছু কিছু মুদ্রা লাভ করিতেন।'
এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত থেকে তদানীন্তন হাওড়া-শালিখার বিশিষ্ট নাগরিক অতুল কৃষ্ণ ঘোষও এই অঞ্চলের একজন নামী ধনবান ও বিদ্যোৎসাহী নাগরিক বলে পরিচিত হয়েছিলেন। জাহাজে কুলির কনট্রাকট পেয়ে বিপুল অর্থের অধিকারী হয় আর এক শালিখাবাসী—তাঁর নাম মাধবচন্দ্র ঘোষ। যাঁর নামে মাধব স্মৃতি পাঠাগার। পরে তিনি গঙ্গা পারাপারের জন্য স্টীমার সার্ভিসও চালু করেন।
শালিখায় জাহাজ মেরামত ও নির্মাণকেন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বেশ গড়ে উঠলো। প্রচুর লোক গ্রাম থেকে এসে এই অঞ্চলে ভিড় করল রোজগারের আশায়। স্বভাবতই নগর হাওড়া লোকের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠলো। তাই হাওড়া

* এই জমিতে ১৭৯০ সালে গিলমোর কোম্পানীর ডক ছিল। দ্রঃ শালিখার ইতিবৃত্ত—লেখক।

শহরকে ১৮৮১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে ইংলণ্ডের মিডলসেক্সের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জাহাজ মেরামতির কাজই বেশি হত। তাই দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুদশক তেমন নতুন জাহাজ নির্মাণের খবর নেই। ফলে নগর হাওড়া অঞ্চলে বেশ কয়েক বছর আবার বেকারী বেড়ে গেল। বললে অত্যুক্তি হবে না যে তদানীন্তনকালে এই অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিদের অর্থোপার্জনের প্রধান উৎসই ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই জাহাজী ব্যবসা। তাই হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের নগর হাওড়াকে O'Malley and M. Chakravorty বলেছেন—Howrah is inhabitated chiefly by persons connected with docks and shipping.' 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'গ্রন্থে (১ম খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন—'২৯শে জুলাই ১৮২৬—১৫ই শ্রাবণ ১২৩৩ সন শালিখায় জাহাজ ভাসান—বহু দিবসাবধি এ প্রদেশে জাহাজ ভাসান রহিত হইয়াছিল। এ প্রযুক্ত এতদ্দেশস্থ অনেক কারিগরদিগের কর্মাভাব হইয়াছিল।'

তারপরই তিনি আবার উল্লেখ করেছেন—'কিন্তু সম্প্রতি এদেশেও জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কারিগর লোক সকলে নিজকর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইদানীন্তন মোং শালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পানীর কারখানায় এক সুন্দর চারিশতটনঅর্থাৎ দশহাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া গত ২২শে জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভাসিয়াছে। এই জাহাজ ভাসিবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনার্থে আসিয়া এক হইয়াছিলেন। জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম 'উইলেম' রাখিলেন—কারণ ঐ নামে একব্যক্তি ঐ সাহেবদিগের কারখানায় প্রধান ছিলেন—দর্শনাগত সাহেব লোকদিগের মধ্যে প্রধান সাহেব লোককে কিঞ্চিৎ উত্তম দ্রব্যাদি ভোজনদ্বারা সন্তোষপূর্বক বিদায় করিলেন।'

এই জাহাজী ব্যবসায় প্রচুর অর্থ লাভের আশায় হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের ই. সি. বি. ও শালিখার রামলাল মুখার্জী এণ্ড সন্স নামে দুটি প্রতিষ্ঠান সে যুগে গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এই দুই পরিবারের আর্থিক উন্নতির মূলেই ছিল সেই ব্যবসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষোক্ত কোম্পানিটি আজ আর নেই। তাঁদের ঐশ্বর্যও আজ ঘাটতির খাতায়। অপরপক্ষে আনন্দের বিষয় যে, রামকৃষ্ণপুরের বিখ্যাত বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত আই. ই. সি. বোস অ্যাণ্ড কোং আজও সমান গতিতে চলেছে। সিপিং স্টিভেডার কোম্পানি হিসেবে আজ সারা ভারতে এটি একটি পরিচিত নাম। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঈশানচন্দ্র বসু। প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৫১ সাল। ঈশানবাবুর বংশধররা আজও যোগ্যতার সঙ্গে সেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটিকে পত্রপুষ্পে আরও সুশোভিত করে তুলেছেন—যাঁদের মধ্যে দেবসাধন বসুর নামটি সকলের আগেই উল্লেখ করতে হয়। এই বংশেরই অন্যতম উত্তরাধিকারী হিসেবে ডঃ নিমাইসাধন বসু সারস্বত জগতে নিজ প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়েছেন।

শালিখার পিপলস্ ইঞ্জিনীয়ারিং এ্যাণ্ড মোটর ওয়ার্কস্ লিমিটেডের নাম এখানে

একটু উল্লেখ করা দরকার। প্রাচীনত্বে ও বিরাটত্বে এটা তেমন না হ'লেও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এর প্রতিষ্ঠা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পিপলস্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীটি প্রথম গঠিত হয় ১৯২১ সালে। এই সালটির রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথা পাঠক মাত্রই জ্ঞাত আছেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতে তখন স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন চলছে। সেই সময়ে কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বদেশ প্রেমিক যুবক পূর্ববঙ্গে মোটরলঞ্চ সার্ভিস চালু করেন। কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতেই ১৯২৩ সালে ঢাকার 'শাঁখারিটোলার পোষ্টমাষ্টার হত্যার' মামলায় পুলিশের অভিযোগমতে পিপলস্ ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারখানাটি ভেঙ্গে তচনছ করা হয়। পুলিশের মতে উদ্যোক্তারা ব্যবসার আড়ালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন। দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে প্রকাশ্যে 'স্বদেশী ঘাটাল স্টীমার কোম্পানী' নামে একটি কোম্পানী তৈরি করা হ'ল। লঞ্চ সার্ভিস চালু হ'ল ঘাটাল থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত। এতে স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয় জনসাধারণের মনে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হ'ল। ফলে বিদেশী হোরমীলার স্টীমার কোম্পানী তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। উক্ত কোম্পানীটি তখন যাত্রীদের টানবার জন্য বিনা পয়সায় সিগারেটও দিতে লাগল। এমনকি লঞ্চের ভাড়াও কিছু কমিয়ে দিল—এখানেই তারা থেমে রইলো না—স্বদেশী কোম্পানীকে বিপাকে ফেলবার জন্য তদানীন্তন বি. এন. আর. রেলকর্তৃপক্ষ যাতে ঐ স্বদেশী কোম্পানীকে কোলাঘাটের লঞ্চ মেরামত ও তীরে ভেড়বার জায়গা না দেয় তারও চেষ্টা করল। তখনকার দিনে প্রতিটি জাহাজ প্রতিবৎসর ইন্সপেকসন করার নিয়ম ছিল। অফিসার ছিলেন সবই প্রায় ইউরোপীয়। তাই নানা অছিলায় এই স্বদেশী কোম্পানীটির জাহাজ যাতে পরিদর্শন না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকি উক্ত কোম্পানীর জাহাজ যাতে কেউ না সারায়, তার জন্যও বিদেশী সরকার নানাভাবে চেষ্টা করতেও পিছপা হননি। ফলে কোম্পানী নিজেই একটি ওয়ার্কসপ শালকিয়ায় প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতীয় কারিগরদের সাহায্যে প্রথম স্টীমার 'শীলাবতী' তৈরি করা হ'ল। কিন্তু ওটিকে পরীক্ষা করে ভাসাবার অনুমতি দিতে অনেক সময় অতিবাহিত করা হ'ল। ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানীর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। কলকাতা কর্পোরেশনের 'থিয়ো' নামে একটি জলযানের মেরামতী কাজ করার জন্য এই স্বদেশী কোম্পানীটি টেণ্ডার দিল। সর্বনিম্ন দর দেওয়া সত্ত্বেও এই কোম্পানীকে সারাবার কাজ না দিয়ে মেসার্স জন কিং কোম্পানীকে দেওয়া হ'ল—কারণ তাদের একাজে সুনাম আছে এই যুক্তিতে। এবার কিন্তু পিপলস্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ পৌর কর্তৃপক্ষকে সহজে ছাড়লেন না। বিখ্যাত তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই স্বদেশী ও বিদেশীর পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করলেন। ফলে উক্ত কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত এই স্বদেশী কোম্পানীকেই জলযানটি সারাতে দিতে

হয়। বলা বাহুল্য, এই কাজে লাভ ও সুনাম দুইই কোম্পানীর হয়।
এরপরই দেখা দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বেশী সংখ্যায় জাহাজ মেরামতি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই স্বদেশী কোম্পানীটি সরকারী তালিকাভুক্ত হয়েও পুলিশী রিপোর্ট বিরূপ হওয়ায় কোন সরকারী কাজ পায় না। কিন্তু অচিরেই স্বায়ত্তশাসন ও বাংলা সরকারের সাধারণ কাজের জন্য জাহাজ মেরামতি ভীষণভাবে প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল। বাধ্য হ'য়ে তখন তাদের এই স্বদেশী কোম্পানীটির কাছে কাজ নিয়ে হাজির হ'তে হয়।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের মুসলমান কর্মীরা (তারাই এই কাজে তখন একচেটিয়া ছিল) বেশীর ভাগই পূর্ব পাকিস্তানে অপসৃত দিয়ে চলে যায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের জলযান পরিচালনার ব্যাপারে এক ভীষণ সংকট দেখা দেয়। পিপলস্ ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী ১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাসে 'মেরিন স্কুল' প্রতিষ্ঠা ক'রে দু'মাসের এক স্বল্পকালীন 'ইনটেনসিভকোর্স' চালু ক'রে দেড়শ' যুবককে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কাজে মোটামুটিভাবে উপযুক্ত ক'রে তোলেন। এভাবে ১৯৫০ সালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে প্রায় চারশ কর্মী প্রশিক্ষণ লাভ ক'রে জলযানে নিযুক্ত হন। তবে এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটির কৃতিত্বের জন্য বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রকুমার মজুমদার ও ত্রিগুণাচরণ সরকারের কর্মপ্রচেষ্টাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা দেশ বিভাগের আগে থেকেই শালিখার বাসিন্দা হিসেবে এখানে ছিলেন। বাঁধাঘাট ও আহিরীটোলার মধ্যে লঞ্চ পারাপারের যে ফেরী সার্ভিস আছে তা এই কোম্পানীর পরিচালকরা ঘাটাল নেভিগেশন কোম্পানীর নামে প্রথম প্রবর্তন করেন। পিপলস্ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাটি আজ অবশ্য বন্ধ।

দড়ির কারখানা—জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের কাজে হাওড়া যেমন বঙ্গদেশের মধ্যে অগ্রণী ছিল তার চাইতেও পুরানো শিল্প ছিল দড়ির কারখানা। **Upjohn's Survey Map of Calcutta** (১৭৯২-৯৩) ঘুষুড়িকে দড়ির কারখানার স্থান ব'লে চিহ্নিতও করেছে। তাতে দু'টি লেনকে 'রোপ ওয়াক' (**Rope Walk**) ব'লে উল্লেখও করা হয়েছে। এই কারখানা দু'টি স্থাপিত হয়েছিল স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে। জেলার দু'টি স্থানে বিশেষ করে ঘুষুড়ি ও শালিমারে (শিবপুর) দড়ির কারখানা গড়ে ওঠার পিছনেও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। শালিখায় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র বা ডকইয়ার্ড প্রথম গড়ে ওঠায় মোটা দড়ি বা কাছির প্রয়োজন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হয়। তেমনি 'বেতর' বন্দর হিসেবে থাকায় তারও কাছাকাছি অঞ্চল শালিমারে দড়ির বা কাছির কারখানা স্বাভাবিক কারণেই গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে দড়ির কারখানাদুটি গড়ে উঠেছিল **Mr. W. Stalkart** এবং **Mr. J. Stalkart** নামে দু'ভায়ের উদ্যোগে। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু না জানা গেলেও এঁরা ছিলেন এই অঞ্চলে বিদেশীদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দা। ইংল্যান্ড থেকে এসে এঁরা শালিখায় বসবাস ক'রে

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দড়ির কারখানা পত্তন করেন। এই কারখানা ক'রেই যে তাঁরা এ অঞ্চলে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ব'লে সমাজে পরিগণিত হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়ও এ অঞ্চলের সামাজিক এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে খুবই তৎপর ছিলেন। তারও হদিশ মেলে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা মাধ্যমে। ১৮৬১ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ড যাঁদের নিয়ে প্রথম গঠিত হয়েছিল তাঁদের এগার জনের মধ্যে ছিলেন এই স্টলকার্ট ভ্রাতৃদ্বয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী এই দড়ির কারখানা চালানোর পর ১৮০১ সালে উক্ত কারখানা দু'টি মেসার্স ক্লার্কস এণ্ড কোম্পানী (M/S. Clarks & Co.) কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। এর পরে আরও কয়েকটি বড় দড়ির কারখানাও গড়ে ওঠে যেমন ডাব্লু এইচ. হার্টন এণ্ড কোম্পানী (W. H. Harton & Co.) এবং বামুনগাছিতে গঙ্গাধর ব্যানার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি। এছাড়া হাওড়ায় ১৮১৫ খ্রীঃ আমুথি এণ্ড কোম্পানিও একটি দড়ির কারখানা খোলেন।

সুতোকল—ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮১৮ সালে ভারতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছিল হাওড়ার ঘুষুড়িতে। এর প্রায় তিন দশক পরে অর্থাৎ ১৮৫০ সালে বোম্বাই এবং আমেদাবাদে কাপড়ের কল গড়ে ওঠে। অবশ্য বস্ত্রবয়নে ইংরেজ আমলের আগে থেকেই হাওড়া জেলার খ্যাতি ছিল। ১৭৯৬ সালে জনৈক স্যামুয়েল ক্লার্ক নামে এক ইংরেজ এখানে নিয়োজিত হয়েছিলেন ইংলণ্ডে সুতোর গাঁট ও তুলোর গাঁট পাঠাবার জন্য। আবার ১৭৯৭ সালে বামুনগাছির কালীপ্রসাদ লহরী নামে জনৈক ব্যক্তি জেমস্ ফেরীস্হার্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে সুতোর গাঁট বিদেশে চালানের প্রতিনিধিত্ব করতেন।[৩] এর পরেই ১৮১৭ সালে ব্রাইটম্যান এবং মিঃ হগও হুগলী নদীর তীরে তুলোর গাঁটের কারবার করেছিলেন। এই অঞ্চলে তুলো যে এক সময়ে প্রচুর উৎপাদিত হ'ত ওপরের আলোচনা তাই প্রমাণ করে। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেন 'A cotton screw for packing and screwing cotton which used to grow in abundance in this region, was known to have existed in Salkia in 1797'. প্রকৃতপক্ষেই শালিখার গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে এই ধরনের শিল্প প্রচুর পরিমাণে গড়ে উঠেছিল। গঙ্গার ঘাটে ঘাটেই এই সুতোর গাঁট তৈরি করার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। অমিয়বাবু আবার লিখেছেন—One such screw became well-known in Salkia and the "ghat" there was known as the cotton screw ghat. এই ঘাটটির নাম তিনি উল্লেখ না করলেও সম্ভবতঃ 'বাঁধাঘাট'কেই বোঝান হয়েছে। আজও বাঁধাঘাটের কাছাকাছি অঞ্চলে এই তুলোর গুদাম, সুতোকল, তুলোর গাঁট ও প্রেসার মিলগুলি সারিবদ্ধভাবে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

পাট শিল্প—রেশম শিল্প ও বস্ত্রবয়ন শিল্পের মত অত প্রাচীন না হ'লেও পাটশিল্প বঙ্গদেশের একটি পুরণো শিল্প। হাওড়া জেলায় প্রথম জুটমিল ১৮৭০ সালে বাউড়িয়ায় ফোর্ট গ্লস্টার মিল স্থাপিত হ'লেও তারও আগে পাটের গাঁট ইংলণ্ডে চালান যেত এই ঘুষুড়ির কারখানা থেকেই। এই কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।[8] ১৮৫৬ সালে S. Misser কর্তৃক অঙ্কিত Survey Map of India-য় বর্তমান হাওড়া স্টেশন এলাকার গুডস্ ইয়ার্ড-এর পেছনের জায়গাটিতে জুটস স্ক্রাস-এর স্থান ছিল ব'লে দেখান হয়েছে।[৫] ঐ সময়েই শালকিয়া ডবসন্ রোড, কুলেন প্রেস ও রোজমারি লেনেতেও জুট প্রেস স্থাপনের নজির আছে। ঘুষুড়ি ও শালকিয়াতে আজও কয়েকটি জুট মিল ও অনেক জুট প্রেস অতীত গৌরবের কথাই মনে করিয়ে দেয়। শালকিয়া ও ঘুষুড়ি অঞ্চলে স্থানীয় লোকেদের তুলনায় ভিনদেশী লোকের সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণই হচ্ছে এই পাট কলের অবস্থান।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণপুর ও শিবপুরেও বেশ কয়েকটি পাটকল গড়ে ওঠে। ১৮৭৪ সালে গড়ে ওঠে শিবপুরে হাওড়া জুট মিল। ১৮৭৫ সালে শিবপুরে গ্যাঞ্জেস জুট মিল স্থাপিত হয়। আর রামকৃষ্ণপুরে ১৮৭৬ সালে গড়ে ওঠে রামকৃষ্ণপুর জুট মিল। এইভাবে সাঁকরাইল থেকে ঘুষুড়ি পর্যন্ত গঙ্গার ধারে জুট মিলের মেলা বসে যায়। আজ অবশ্য সেই রমরমাভাব আর নেই।

তেলকল—সরষের তেলের কল জেসপ কোম্পানী ১৮৩০ সালে হাওড়ায় প্রথম স্থাপন করে। ঐ জায়গাটির নাম হচ্ছে বর্তমান তেলকল ঘাট। কিন্তু এরও আগে থেকে শালিখায় ও সাঁত্রাগাছিতে ছোট ছোট দিশী তেলের কল ছিল। এই দশকের পর থেকেই শালকিয়া ও ঘুষুড়িতে তেলের কল ক্রমশই বাড়তে থাকে। শালকিয়ায় এ ব্যবসায় সাধুখাঁদের একাধিপত্য সর্বজনবিদিত। হরগঞ্জ রোড ও বেনারস রোড এই ব্যবসার জন্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে এই ব্যবসায়ে শালকিয়ার প্রাধান্যও অস্বীকার করা যায় না। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—In 1925, four out of a total of seven oil mills were in the Haraganj—Bauaras Road area, the other three were in the Ramkrishnapur—Sibpur localty.' আজও কয়েকটি বড় বড় তেলকল শালকিয়ায় দেখতে পাওয়া যাবে।

অপরপক্ষে 'নগর হাওড়ার লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—কোলিন সাহেবের (E. W. Collin) মতে হাওড়ায় তেলকলগুলির মধ্যে রামকৃষ্ণপুরের কলটি ছিল খুব বড়। ব্যাটরার নটবর পাল ও শালকিয়ার সাধুখাঁরা এই ব্যবসায়ে একাধিপত্য লাভ করেছিলেন। তিলি সম্প্রদায়ের এটি আদি ব্যবসা। আগে ঘানিতে তেল পেষাই হত। শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী তাঁর বাংলার পারিবারিক ইতিহাসে (২য় খণ্ড) লিখেছেন—সালিখার দিগম্বর খাঁ পুত্র উমাচরণ খাঁই

প্রথম তেল তৈরির জন্যে বাষ্পচালিত লোহার পেষণ ব্যবহার করেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যবসায়েই তাঁর দুই পুত্র কানাইলাল সাধুখাঁ ও বলাইচরণ সাধুখাঁ প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। সমাজ কল্যাণে তাঁদের দানও কম ছিল না। এক কালে তাঁরা 'তেলের রাজা' (Oil King) বলে পরিচিত ছিলেন।

চাল ব্যবসা—হাওড়ায় চাল ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল রামকৃষ্ণপুরে। এই ব্যবসায়ও আবার প্রধানত আধিপত্য ছিল খাঁ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের। পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে চাল এনে এঁরা রামকৃষ্ণপুর ঘাটের গুদামে জমা করতেন। শালকিয়াও এরকম একটি ঘাট ছিল। চালের ব্যবসাই এই ঘাটে হত বলে তার নাম হয়ে যায় চাল পট্টির ঘাট (চেলু পট্টি ঘাট)। হুগলী ডকের পাশেই ঘাটটি রয়েছে। মধ্য হাওড়ার কিশোরী খাঁ, সাধুচরণ খাঁ, বিহারী লাল খাঁ ও রামকৃষ্ণপুরের খাঁয়েরাও এই ব্যবসায়ে প্রচুর নাম ও অর্থোপার্জন করেন।
চিনি শিল্প—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ চিনিকল শালিখা অঞ্চলে গড়ে ওঠে। সে সময় শালিখার কাছাকাছি অঞ্চলে আখের যে চাষ হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আখের কলের অবস্থানই তা বলে দেয়। আর সেই আখের কল থেকেই এখানে গড়ে ওঠেছিল মদের ব্যবসা। আখের রস মদ তৈরির একটি আবশ্যকীয় উপাদান। লেভেট (Levat) নামে জনৈক সাহেব হাওড়াতে যে বিস্তীর্ণ জমি লীজ নিয়েছিলেন (হাওড়া কোর্ট অঞ্চলে) তাতে তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ মদের ভাঁটি তৈরি করেছিলেন। বর্তমান হাওড়া কালেকটারেটের বাড়িটি লেভেট সাহেবেরই বাড়ি ছিল বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ বাড়িটি তিনি তিনটি কাজে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। একাংশে কলকাতার শুল্ক বিভাগের অফিস হত, দ্বিতীয়াংশে ২৪ পরগনা জেলা শাসকের অফিস ছিল এবং তৃতীয়াংশে প্রসিদ্ধ বিশপ কলেজের জনৈক পাদ্রী থাকতেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে বিশপ কলেজ আজ কলকাতায় হলেও এর প্রথম পত্তন হয়েছিল হাওড়া শহরে বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে—যার অন্যতম ছাত্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁর অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ পরগনা জেলার বিচারালয় যে একদা শালিখার এই অঞ্চলে ছিল তারও সাক্ষ্য পাওয়া যাবে ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন '১৮৩৫ সনে ২৪ পরগনা জেলা শাসকের আদালতে মামলা জিতে কৃষ্ণমোহন (রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর পত্নী বিন্দুবাসিনী দেবীকে তাঁর পিত্রালয় শালিখা* থেকে নিয়ে এলেন। এক রকম উদ্ধার করলেই বলা যায়। হাওড়ার শালিখা তখন ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিন্দুবাসিনী একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে ছিলেন বলেই কৃষ্ণমোহনকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল।'

* বিন্দুবাসিনীর পিতৃগৃহ ছিল বর্তমান সীতানাথ বসু লেন। দ্রঃ শালিখার ইতিবৃত্ত -লেখক।

আবার চিনি শিল্প প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই অঞ্চলে মদ শিল্প তৈরির মূলে ছিল জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি কেন্দ্র থাকায়। কারণ বিদেশী নাবিকদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা খুবই ছিল। পরবর্তীকালে এদেশীয় নাবিক ও মাঝি-মাল্লারাও এতে বেশ আসক্ত হয়ে পড়ে। আজও সেই ট্র্যাডিসন সমানে চলেছে।

এসব শিল্প ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই যে শিল্প হাওড়াকে বঙ্গদেশের তথা ভারতের শিল্পজগতে পরিচিত করে দিল তা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ঢালাই শিল্প। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। হাওড়ার বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারখানা ছিল বার্ন এণ্ড কোম্পানী, আলবিয়ান কোম্পানী, হাওড়া ফাউণ্ড্রি ও জনকিং কোম্পানী প্রভৃতি। এ ছাড়া লিলুয়ার রেলের কারখানাও খুব পুরানো। এর মধ্যে আবার লোহার শিল্প প্রতিষ্ঠান আলবিয়ন মিলস-ই সম্ভবত প্রাচীনতম। এটি ১৮১১ সালে শিবপুরে উইলিয়ম জোন্সের পরিচালনায় তৈরি হয়।[৬] হাওড়ার বার্ন কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নাম। এটি প্রথমে কিন্তু তৈরি হয় কলকাতায় ১৭৭১ সালে। তারপর অনেক বছর কেটে যায়। ব্যবসায়ে চলে উত্থান পতন। প্রায় একশ বছর পর তাদের সুদিন আসে। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী থেকে প্রচুর অর্ডার পেলে বড় কারখানার জন্য হাওড়ায় তাঁরা জমি কেনেন ১৮৪৮ সাল নাগাদ।* এইভাবে কারখানার কাছ শুরু হয়। ১৯২৭ সালে এই বার্ন কোম্পানীর নাম পাল্টে হল মার্টিন বার্ন এণ্ড কোম্পানী।[৭] বঙ্গদেশে যে সব বৃহৎ বৃহৎ ইমারতী কাজ তদানীন্তন সময়ে হয়েছিল তার প্রায় সব কাজেই এই কোম্পানীর হাত ছিল। আজও এদেশে বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে এরা সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। নগর হাওড়ার লেখক অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন—এই শিল্পের (ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফাউণ্ড্রি) ক্রমশ উন্নতি ঘটার ফলে ১৯০৮ সালে দেখা যায় যে বাংলার মোট ৫৬টি কারখানার মধ্যে ৪৪টি অবস্থিত এই হাওড়ায়। সুতরাং এ থেকে সেই সময়ে শিল্পে হাওড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

বৃহৎ শিল্প ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠাও হাওড়াকে করে তুলেছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এসবও শুরু করেছিল ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। ক্ষুদ্র শিল্পে হাওড়া শহর এক সময় বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এমন সব সুদক্ষ মেশিনের কাজ করতে সক্ষম হল তা বিদেশী কারিগরদেরও তাক লাগিয়ে দেয়। হাওড়ার বেলিলিয়াস অঞ্চলে ঘরে ঘরে আধুনিক মেসিন পত্র নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠল। যার জন্য একদা এর নাম হয়েছিল 'সেফিল্ড অব বেঙ্গল'। ইংরেজ ব্যবসাদারদের দেখাদেখি বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরাও কারখানা স্থাপনে এগিয়ে এলেন। এই ব্যাপারে প্রথমেই নাম করতে হয় শিবপুরের কিশোরী লাল মুখার্জীর কথা। তিনি প্রথম লোহার কারখানা তৈরি করলেন হাওড়ার শিবপুরে। সালটি ছিল ১৮৬৭। এরপর অবশ্য

* মতান্তরে ১৭৭৪। বার্ন স্ট্যাণ্ডার্ড—বিশেষ প্রতিনিধি—আঃ বাজার পত্রিকা ৩১।৫।৮২।

শালকিয়ায়ও তাঁরা কারখানা করেন। বেলিলিয়াস রোড়ের কারখানা মালিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশান চন্দ্র কুণ্ডু, ফকির চাঁদ দাস, রামচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ। বেলিলিয়াস অঞ্চলে এইভাবে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক লোহার যন্ত্রপাতি উৎপাদন শুরু হয়ে গেল। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম আখ মড়াইয়ের মেশিন তৈরি করেন কেশব ব্যানার্জী, রামচন্দ্র ব্যানার্জীর পুত্র। অলোকবাবুর এই মন্তব্যটি সঠিক নয়। বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ 'কলের শহর কলকাতা' গ্রন্থে লিখেছেন—১৮৮৯-এ ব্যাটরার ফকির চন্দ্র দাস তাঁর উদ্ভাবিত সুগার কেন মিল-এর উন্নত সংস্করণের জন্য দুটি পেটেন্ট পেয়েছিলেন (৪১ ও ৪২ সংখ্যা)। 'দি বেঙ্গল টাইমস' এই সংবাদ জানিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—**We have rarely ever seen so encouraging an announcement.**

'আখ পিষে রস বের করার জন্য কাঠের বদলে লোহার পেষণ যন্ত্র তৈরি করে ১৯০৯ সালে হাওড়ার রাম নারায়ণ ব্যানার্জী এণ্ড সন্স।' সুতরাং ফকির চাঁদই এই যন্ত্রের আবিষ্কারক। ভারতে প্রথম ঢালাই লোহার কড়াই তৈরি করেন হাওড়া-ব্যাটরার অধিবাসী যোগেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী।[৮] ঢালাইয়ের বাটখারা তৈরির কাজে উল্লেখযোগ্য কাজ শুরু করেন হাওড়া-ব্যাটরার রাজা রাম দাস। তিনি এই কাজ শুরু করেন ১৮৬৭ সালে। ঢালাই কারখানাগুলির মধ্যে আটাজ আয়রণ ফাউণ্ড্রি, ডি. এন. সিং, আর. এম. চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স প্রভৃতি স্বাধীনোত্তর কালের ষাটের দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছে। এরপর অবশ্য আরও নতুন নতুন কয়েকটি ঢালাই কারখানা হয়েছে—তাদের মধ্যে সুরেকা ফাউণ্ড্রির নাম করার মত।

হাওড়ায় ময়দা কলও একদিন খুব নাম করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এখানে ময়দার কল তৈরি হতে থাকে। এ ব্যাপারে ইংরেজ মালিকরাই প্রথম উদ্যোগী ছিল। ১৮৫৮ সালে বিখ্যাত জেসপ কোম্পানীর পক্ষ থেকে হাওড়া কোর্টের কাছেই ময়দার একটি বড় কল বসানো হয়। আজও কয়েকটি ময়দার কল হাওড়ায় দেখতে পাওয়া যাবে গঙ্গার ধারে। যদিও তার মধ্যে কয়েকটি আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন হতে পারে হাওড়া শহরে কোন ব্যক্তি একাই ব্যাঙ্ক ব্যবসা, মেসিনারী কোম্পানী, জুটমিল, কটন মিল, ওষুধ তৈরির কারখানা, বীমা কোম্পানী ও স্টীমার কোম্পানী করেছিলেন? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে কর্মবীর আলামোহন দাস। পিতৃহীন অসহায় কিশোর মায়ের ভাজা মুড়ি কলকাতার রাস্তায় বিক্রী করে যে এত বড় হবে এটা কি কেউ ভেবেছিল? সেই অভাবনীয় ব্যাপারেই চরম সাফল্য দেখিয়ে ছিলেন উদয়নারায়ণপুর থানার খিলা গ্রামের ছেলে আলামোহন। যাঁর হাতে তৈরি 'দাস নগর'। আলামোহনের সাংগঠনিক প্রতিভা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার মুন্সিয়ানা দেখেই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁকে 'কর্মবীর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আচার্যরায় দাস নগর দেখে বলেছিলেন—দাস নগর

মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর তীর্থ ক্ষেত্র। আলামোহন কেবল হাওড়াবাসীর গৌরব নয় বঙ্গবাসীরও গৌরব।

হাওড়া শালিখার আর এক শিল্প সংগঠকের নাম করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন অবনী দত্ত। একজন সাধারণ নিঃস্ব কারিগর থেকে friends electric co. তৈরি করে তিনি অমর হয়ে আছেন। প্যারিসে ইণ্টারন্যাশানাল চেম্বার অব্ কমার্সের একমাত্র সদস্য হয়ে জেলার গৌরব বাড়িয়েছিলেন।

হাওড়ায় আর এক শিল্প সংগঠক হচ্ছেন রামচন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মস্থান শিবপুর। পুলিশ বিভাগের উচ্চ পদ থেকে অবসর নিয়ে দেশের যুবকদের কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ১৯৪৫ সালে হাওড়া হোমস প্রতিষ্ঠা করেন। নার্সেস ট্রেনিং এবং মানসিক প্রতিবন্দীদের শিক্ষাকেন্দ্রও তিনি গড়ে দিয়ে গেছেন। সাহসিকতার জন্য তিনি ইংরেজ আমলে কিংস পুলিশ মেডেল পান।

হাওড়ার কলকারখানার ব্যাপারে গুরু জোন্স-এর কথা উল্লেখ না করলে অধ্যায়টি খুবই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে। এই জোন্স সাহেব কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েন নি। কোন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং তকমাও ছিল না। নিজের মেধা খাটিয়ে তিনি যে প্রযুক্তির অধিকারী হয়েছিলেন তার জন্য তাঁকে সকলে 'গুরু' বলে সম্বোধন করত। বাস্তবিক তিনি ছিলেন একজন স্বয়ম্ভু ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর জীবন সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি কলকাতায় আসেন ১৮০০ সালে।[৯] সামান্য একজন কারিগরের পদে কাজ করার পর তিনি হাওড়ায় এসে একটি ক্যানভাসের কারখানা তৈরি করেন। একটি ছোট্ট কাগজের কারখানাও তৈরি করেছিলেন। এই কারখানায় প্রস্তুত কাগজ ১৮১১-তে জাভা অভিযানের আগে সরকারী সেনাবাহিনীকে কার্তুজের জন্য কাগজ সরবরাহ করা হইয়াছিল।[১০]

শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরীকেই আমরা কলে তৈরি কাগজের জনক বলে জানি। ১৮৬৫ পর্যন্ত শ্রীরামপুরই ছিল কলের কাগজের একমাত্র উৎপাদন কেন্দ্র। তাই হয়তো দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন—

> সর্বঅগ্রে ছাপাখানা এই স্থানে হয়,
> মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ পরিচয়।
> কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার,
> জন্মিছে কাগজ তাই বিবিধ প্রকার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে .....হাওড়ার 'গুরু জোন্স' সাহেব কেরী সাহেবের অনেক আগেই কাগজ শিল্প প্রচলন করেছিলেন।

হাওড়ার 'গুরু জোন্সের' মহত্তম কীর্তি হচ্ছে ভারতীয় কয়লা খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কয়লা উৎপাদন। ভারতীয় কয়লা খনি শিল্পের জনক হিসেবেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত। রাণীগঞ্জ কয়লাখনির পত্তন তাঁরই হাতে।[১১] এই 'গুরু' জোন্স বিদেশী হলেও হাওড়ায় বসবাস করে তিনি হাওড়াবাসী বলেই তদানীন্তন হাওড়াবাসীর কাছে সমাদর পেতেন। সিদ্ধার্থ ঘোষ আরও লিখছেন—

জোন্স সাহেব অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন। এটাই কি প্রমাণ করে না তিনি এখানকার মানুষের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন ?

আজকাল শহরের রাস্তায় তিন চাকার মোটর (ভ্যান) গাড়ী দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের এক প্রকার সাইকেল প্রাচীন কলকাতায়ও দেখতে পাওয়া যেত। শুনলে হাসি পাবে যে, ঐ তিন চাকার সাইকেলে চড়ে রাস্তায় ঘুরতে বের হতেন তদানীন্তন কলকাতার বনেদী ঘরের ধনী ও মানী ব্যক্তিরা। ঐ সব আরোহীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সে যুগের যানবাহন' প্রবন্ধে * বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ লিখেছেন—সৌখিন বাঙালি সমাজে প্রথম যাঁরা তিন চাকার পা গাড়ি ব্যবহার আরম্ভ করেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ অন্যতম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন পার্ক স্ট্রীটের একটি বাড়িতে থাকতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ রোজ সকালে জোড়াসাঁকো থেকে ট্রাই সাইকেলে চৌরঙ্গী পেরিয়ে সেখানে আসতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন গড়ের মাঠের পাশ দিয়া গাড়িতে যাইতেন তখন তাঁহার শ্মশ্রুরাজি অবাধে উড়িতে থাকিত।' পাঠক জেনে হয়তো আনন্দ লাভ করবেন যে এই দেশে ট্রাই সাইকেলের আবিষ্কারক হচ্ছেন হাওড়া সাঁত্রাগাছির জনৈক ভদ্রলোক। তাঁর নাম প্রসন্নকুমার ঘোষ।

এ সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল মেটাবার জন্য তদানীন্তন 'সুলভ সমাচারের' সংবাদ ছাপিয়ে দেওয়া হল। '১৮৭৯, ১৫ই অগ্রহায়ণ 'সুলভ সমাচার' খবর প্রকাশ করে ......সম্প্রতি সাঁতরাগাছিতে একজন কর্মকার বুদ্ধি খাটাইয়া একখানি সেই রকম (ট্রাই সাইকেল) গাড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে অগ্রে একজন এবং পশ্চাতে দুইজন পা দিয়া চাকা ঘুরাইতে থাকে। আমাদের দেশের লোকে যদি একটু চেষ্টা করে তবে তাহারা কত কল অনায়াসে গড়িতে পারে।' প্রথম সংবাদে আবিষ্কারকের নাম সুলভ সমাচার দিতে না পারলেও তাঁরা যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় গৌরব প্রকাশে উদগ্রীব ছিলেন তা পরবর্তী সংবাদ থেকেই প্রকাশ পায়। সপ্তাহ কয়েক পরে ৬ই পৌষ সংখ্যায় 'সুলভ সমাচার' লিখেছে 'আমরা যে লিখিয়াছিলাম একজন সাঁতরাগাছির কামার একখানি নূতন রকমের গাড়ি নির্মাণ করিয়াছেন, শুনা গেল যে বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন।'

আর একজন গ্রাম্য কর্মকারের কথা বলা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন ডোমজুরের দফরপুর গ্রামের সুসন্তান রামকৃষ্ণ কর্মকার। পিতা মাধবচন্দ্র কর্মকার। গ্রামের একজন সাধারণ কর্মকারের কাজ করে ছেলে রামকৃষ্ণের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে ততটা নজর দিয়ে উঠতে পারেন না। তাই অল্প বয়সেই রোজগারের জন্য রামকৃষ্ণকে শহরে এসে বিভিন্ন কলে কারখানায়, জাহাজী কোম্পানী, কলকাতা মিণ্ট এমনকি দমদমের বুলেট ফ্যাকট্রীতে পর্যন্ত কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। সিমলা পাহাড়ের কাছে কশৌলীতে ষ্টীম ইঞ্জিন বসিয়ে ও বয়লার বসিয়ে ময়দা ও পাউরুটির কল

* মাসিক বসুমতী—৮৭০—৮৭২ পাতা

তৈরি করেন। তারপর নেপালে চলে যান রাজার আহ্বানে ১৮৬৯ সালে। নেপালের টাঁকশালে তিনি যন্ত্রের সাহায্যে প্রথম মুদ্রা তৈরির প্রথা চালু করেন। এমনকি সামরিক অস্ত্র তৈরিরও ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। কয়েক বছর পর আবার কাবুলে গিয়ে তিনটি অস্ত্র কারখানা তৈরি করে দিয়ে আসেন। নেপালে দ্বিতীয়বারে ডাক আসে ১৮৮৪ সালে। সেখানেও গোলাগুলি তৈরির কারখানা তৈরি করে দিয়ে আসেন। গুণমুগ্ধ নেপালের রাজা রামকৃষ্ণবাবুকে 'ক্যাপ্টেন' উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে দফরপুরের রামকৃষ্ণ কর্মকার হন 'ক্যাপ্টেন রামকৃষ্ণ'। কোন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল কলেজে না পড়েও নিজ মনীষার বলে শিল্প জগতে হাওড়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয় করে তিনি ক্যাপ্টেনের ভূমিকাই পালন করে গেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পে হাওড়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধেই আলোচনা হল। এবারে কুটির শিল্পেও হাওড়ার যে একটি বিশেষ ভূমিকা আজও বর্তমান সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। এই সব কুটির শিল্পের মধ্যে আছে দেউলপুরের পোলোবল, জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়ার তালা, ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুরের চিকনের সূচী শিল্প, দক্ষিণ কলোড়া, ধুলোগড়, পাঁচলা দেউলপুর ও জালালসির জরীর কাজ, উলুবেড়িয়া বাণীবনের ব্যাটমিণ্টন খেলার শাটেল কক্স, পাঁচলার চড়া, কুলাই ও বিকি হাকোলা গ্রামের পরচুলা প্রভৃতি কুটির শিল্পের কারিগররা আজও ভারত তথা বিশ্বের বাজারে প্রশংসা লাভ করে চলেছে।

প্রথমে পোলো বলেরই কথা বলি। কারণ ইংরেজ আমলে এই বলের কারবার খুব চলতো।

সাহেবরা তখন সারা ভারতেই পোলো খুব খেলতো। বাঁশের গুঁড়ি বা গুঁপো থেকে এই বল তৈরি হয়। এই বলের একচেটিয়া কারবার করে ধুলোগাড়ির কাছে দেউলপুর গ্রামের কয়েক ঘর কারিগর। এই বল তৈরি করে আজও বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সাহায্য করে ঐ গ্রামের কারিগররা। সুদূর আমেরিকাতেও এই বল রপ্তানি হয়। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর থেকে এই কারবারেরও ভাঁটা পড়েছে। চাহিদা না থাকায় গ্রামের কিছু কিছু পরিবার এই ব্যবসা তুলেই দিয়েছে। বর্তমানে গ্রামের কোলে, দাস, হাজরা ও বাগ পরিবারের লোকেরাই চাষের সঙ্গে এখনও এই কুটির শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

জগৎবল্লভপুরের বিভিন্ন গ্রামে চিকনের কাজ ভারত বিখ্যাত। গ্রামের ঘরে ঘরে মুসলমান রমণীরা মসলিন বা মিহি কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের কাজ করে হাওড়া হাট ও কলকাতার বড়বাজারে বিক্রী করে। আগে এটা সম্পূর্ণ হাতে করলেও দেশ স্বাধীন হবার পর জার্মানীর 'মাণ্ডলস' (Mundlos) মেশিন পায়ে চালিয়ে একাজ করা হচ্ছে।

দামী শাড়িতে সোনা বা রুপোর জরি বসানোর কাজেও এই জেলার কুটির শিল্পীরা

অনন্য। মুসলমান মহিলাদের এই জরির কাজ বা চুমকি বসানের পারদর্শিতা পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। এর প্রধান ক্রেতা হচ্ছে বড়বাজারের মহাজনরা। তাঁরাই কারিগরদের উপকরণ যোগান দেন।
পরচুলোর ব্যবসাটাও পাঁচলায় বিভিন্ন গ্রামেই চলে। দেশ-বিদেশে এই শিল্পীদের পরচুলোর আদর আছে। সিনেমা, যাত্রা প্রভৃতিতে এর চাহিদা আছে। আজকালতো সাধারণ মানুষও মাথার টাক ঢাকার জন্য পরচুলা বেশ ব্যবহার করছে। সাধারণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সাহায্যে এই কুটির শিল্পটি চলে। বৈদেশিক মুদ্রাও এর দ্বারা অর্জিত হয়। কিন্তু সরকারী সহায়তা আরও আন্তরিক হলে এই শিল্পের ক্ষেত্রে হাওড়ার কারিগররা তাদের কৃতিত্ব আরও দেখাতে সক্ষম হবে। হাওড়ার ডোমজুর থানার অধিবাসীরা হীরে কাটার পারদর্শিতার জন্য বোম্বাইতে হিরে-জহরতের বাজারে খুবই আদৃত কারিগর।

---

১. Howrah Dist. Gazetteers – Amiya K. Banerjee
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. নগর হাওড়া—অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়।
৭. নগর হাওড়া—অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়।
৮. Howrah Manufacturers' Assooiation Annual Brochure 1970.
৯. কলের শহর কলকাতা—সিদ্ধার্থ ঘোষ।
১০. ঐ
১১. ঐ

হাওড়ার বেশির ভাগ দেবদেবীই অনার্য দেবদেবী। যেমন ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন ঠাকুর, শীতলা ঠাকুর, মনসা ঠাকুর প্রভৃতি। ভাগীরথীর পশ্চিমকুল রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই রাঢ় অঞ্চলের প্রধান দেবতাই হচ্ছেন ধর্মঠাকুর। তবে এই ধর্মঠাকুর অবশ্য আর্য ও অনার্যের মধ্যে এক কমন ফ্যাক্টর। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়—"আর্যদেবতা ধর্মঠাকুরের যেমন রথারোহী সূর্য ও বরুণরূপ আছে তেমনি অনার্য-দেবতা ধর্মঠাকুরের রূপ কূর্মাবতার, তাম্রধাতু ও বৃক্ষদেবতা বটে"।[১] কিন্তু পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরকে অবশ্য বৌদ্ধ দেবতা বলে মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমতকে ভ্রান্ত মত বলে আখ্যা দিয়েছেন। ডঃ সেনের মতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের প্রভাব বিস্তার হলেও হিন্দুধর্মের লোকনাথ ও বৌদ্ধধর্মের 'ধর্ম' অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি এই মতও প্রকাশ করেন যে, 'ধর্ম' কথাটি কোন 'অস্ট্রিক' শব্দের সংস্কৃত রূপও হতে পারে। তবে ধর্মঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে যে 'শূন্য' বলা হয়েছে তার সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানের শূন্যের কোন মিল নেই। এই শূন্য মানে শুভ্র। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ 'ধর্ম' দেবতা'র বাহন হচ্ছে সাদা পেঁচা ও সাদা কাক। কিন্তু যোদ্ধা বেশে ধর্মঠাকুরের বাহন হচ্ছে সাদা ঘোড়া। ধর্মপুজোর মন্ত্রে সূর্যকে 'শূন্যদেহ' বলে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

রাঢ় অঞ্চলের ডোমেরাই ধর্মঠাকুরের পূজারী। ধর্মঠাকুরের প্রতীক কূর্মাকৃতি শিলাখণ্ডের উপরে একটি পাদুকা চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই পাদুকাই ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক। তাই পুরোহিত ডোমেরা ঐ পাদুকা বুকে ঝুলিয়ে রাখত। পরবর্তী সময়ে কৈবর্ত, বাগ্দী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর পূজারী হয়। ধর্মঠাকুরের পুজোর আঙ্গিক হিসেবে মদ ও মাংস ব্যবহার হতো। এমন কি শুয়োর বলি দিয়েও পুজো হোত। বর্তমানে হাঁস ও পায়রা এবং পাঁঠা দিয়ে পুজো হয়।

ধর্মঠাকুরের পুজোর একটি প্রধান অংশ হচ্ছে চড়ক পুজো। চড়ক হচ্ছে সূর্য পুজোরই একটি অংশ। চড়ক গাছের ওপর শূন্যে চক্রাকারে যে আবর্তন করতে দেখা যায় তা সূর্যেরই পরিক্রমণের রূপক মাত্র।[২] শিব পুজোর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। যদিও হিন্দুধর্মের প্রভাবে এই পুজোর সঙ্গে শিবের গাজনের (চৈত্র মাসে) একাকার হয়ে গেছে।

আসলে ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা বা পুজো অনুষ্ঠিত হয় বেশির ভাগ জায়গায়ই বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে। এই পুজোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত ভূমিপৃষ্ঠের রুক্ষতায় বৃষ্টি সিঞ্চন করে জমির উর্বরতাকে ফিরিয়ে

আনা। আর একটি উদ্দেশ্যেও এই পুজোর প্রবর্তন হয়েছিল তা হচ্ছে বন্ধ্যানারীর পুত্র-সন্তান লাভ। কথিত আছে, রাজা গৌড়েশ্বর বঙ্গদেশে প্রথম এই ধর্মঠাকুরের পুজো প্রবর্তন করেন এবং তাঁর রানী রঞ্জাবতী শালে ভর করে ধর্মঠাকুরের কৃপায় দুটি পুত্রলাভ করেন—যার একজনের নাম ইতিহাসে লাউসেন নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গের এমন জেলা কদাচ দেখা যাবে যেখানে এক বা একাধিক স্থান ধর্মতলা নামে নামাঙ্কিত হয়নি। আমাদের হাওড়াতে ধর্মতলা নামে একাধিক স্থান রয়েছে যেমন—ঘুষুড়ি ধর্মতলা, শালিখা ধর্মতলা, বেলুড় ষ্টেশনে ধর্মতলা, বামুনগাছি ধর্মতলা ও শিবপুর ধর্মতলা ইত্যাদি তবে এর মধ্যে সালিখার ধর্মতলার নামই সর্বাপেক্ষা প্রচারিত। তার কারণও আছে—

কিংবদন্তী আছে, রাজা গৌড়েশ্বর একবার স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, তাঁকে ধর্মঠাকুরের পুজো প্রচলন করতে হবে। স্বপ্নে তিনি এও আদিষ্ট হলেন যে, শালিখা গ্রামে চার বিখ্যাত পণ্ডিত যথা সেতাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত, রামাই পণ্ডিত ও নবাই পণ্ডিত আছেন। সেখানেই এই ঠাকুরের পুজোর প্রকৃষ্ট স্থান। উল্লেখ্য, এই পণ্ডিত চতুষ্টয় সকলেই পৌণ্ড্র বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।

রাজার আদেশে শেওড়াফুলির জমিদার দীনেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত হাজার বিঘা জমির ওপর শালিখার এই ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান ধর্মতলার আশেপাশে এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে ডোম, কেওরা, বাগদী ও পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের বাসই এই বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমানে ধর্ম ঠাকুরের নামে দেবোত্তর সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ৩৮ বিঘা ৬ কাঠা জমি। বর্তমান সেবায়িতরা যথা, ভদ্রেশ্বর, প্রশান্ত ও বিমল পণ্ডিতত্রয় নবাই পাণ্ডতেরই বংশধর বলে দাবি করেন। ধর্মঠাকুরের পুজারিদের পণ্ডিত নামেই আখ্যা দেওয়া হয়। এই চারজনের মধ্যে সীতাই পণ্ডিত ও কংসাই বা কাঁসাই পণ্ডিতদের সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতে পারা যায় না। কিন্তু রামাই পণ্ডিত খুব সম্ভবতঃ হাওড়ার লোক ছিলেন না। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের লেখক বিনয় ঘোষ তাতে লিখছেন ঃ ময়নাপুর পৌঁছে (বাঁকুড়া) সবই দেখলাম—লাউসেনের রাজধানী ও 'শূন্য পুরাণ' রচয়িতার বাসস্থান (রামাই পণ্ডিত) হতে হলে যে সব ঐতিহাসিক স্মৃতির নিদর্শন থাকা দরকার তার প্রায় সবই ময়নাপুরে আছে। তবে নবাই পণ্ডিত যে শালিখারই অধিবাসী ছিলেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এমনকি তিনি যে ১১১১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তারও নিদর্শন পাওয়া যায় মন্দিরের বিপরীতদিকে ধর্মতলা রোডের ওপর স্থাপিত পঞ্চানন্দ শিবজী মন্দিরের স্মৃতি ফলক থেকে। শ্বেত পাথরের স্মৃতি ফলকে লেখা আছে ঃ

শ্রীশ্রী৺পঞ্চানন্দ শিবজী

সন ১১১১ সাল

সেবাইৎ—নবাই চন্দ্র পণ্ডিত, শালকিয়া ধর্মতলা।

এই স্মৃতিফলকটি নির্মাণেও এক ঘটনা জড়িত আছে। কলকাতার ইন্দ্রচাঁদ রাজ-

গড়িয়াদের (যাঁদের নামে বাবুলাল রাজগড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়) কিছু সম্পত্তি শালিখায় ছিল। এই অঞ্চলে একটি সম্পত্তির মোকদ্দমার রায় দানের দিন তিনি ঐ পঞ্চানন্দ শিবের পুজো দিয়ে কোর্টে যান এবং মোকদ্দমায় রাজগড়িয়াদের জয় হয়। তাই তিনি বাবার মন্দিরটিকে বিনা ছাদ এঁটে (ঠাকুরের নিষেধ ছিল) চারদিক বাঁধিয়ে দিলেন। ইংরাজিতে লেখা আছে ঃ

Constructed by

Inder Chand Rajgarhia, 1931

12. Syed Sally Lane. Calcutta.

আজ অবশ্য এই স্মৃতি ফলকটিকে খুঁজে পেতে খুবই অসুবিধা হবে কারণ, সেখানে জনৈক কারিগর তার পেট চালানোর জন্য একটি ছোট ঝালাইয়ের দোকান করে বসেছেন।

আজও বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শালিখার ধর্মতলার ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বারোদিনব্যাপী এই উৎসবের সূচনা হয় নাট মন্দিরে ঘট স্থাপনের মাধ্যমে। ঐ তিথি থেকে দশদিনের দিন অধিবাস হয়। এগারদিনের দিন গঙ্গায় স্নানযাত্রায় বের হন আজও ধর্মঠাকুর। তবে অতীতের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা বের হত তার বর্ণনাও অত্যন্ত চমকপ্রদ ছিল।

ধামা ভর্তি চালের মধ্যে ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি তাম্রশিলা সিংহাসনে সাজিয়ে শালিখায় বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে গঙ্গায় স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হত। সেই স্থানে ঢাকঢোল, সঙ, লাঠিখেলা, কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা হত। সন্ধ্যা সমাগমে জ্বলে উঠত অগণিত মশাল। 'নাগোয়া সম্প্রদায়ের' সুসজ্জিত যোদ্ধাবেশধারী লোকরা ছিল শোভাযাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। শোনা যায়, একবার ঐ নাগোয়া যোদ্ধাবেশধারী শোভাযাত্রীরা আসতে দেরী করায় স্নানের জন্য ধর্মঠাকুরের সামান্য ওজনের তাম্রশিলাকে ধামায় তুলতে কেউ সমর্থ হন না। পরে তাঁরা এসে উপস্থিত হয়ে যখন শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে নৃত্য শুরু করলেন তখন সহজেই সেটিকে তোলা সম্ভব হল। ঐ শোভাযাত্রার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো তার ব্যয় ভার ঐ শ্রেণীর ধনবান লোকেরাই বহন করত। অবশ্য শালিখা থেকে কেওরা সম্প্রদায়ের অবলুপ্তিতে ঐ শোভাযাত্রারও ইতি ঘটে। কিন্তু আজও তার আসল পুজোর অঙ্গ হিসেবে ঠাকুরের স্নান পর্ব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বারোদিনব্যাপী মেলা বসে—বিভিন্ন ধরনের দোকানপত্র বসে, বসে নাগরদোলা ইত্যাদি। এরই মধ্যে আছে ধর্মঠাকুরের লীলা কীর্তন, গান, যাত্রা ও কবির লড়াই। শেষের দিন চড়ক দোলা ও ঝাঁপ দেওয়া। পাঁঠা বলি আজও হয়। এখনও নবাই পণ্ডিতের বংশধরগণ সেবায়িতের কাজ পালাক্রমে চালিয়ে যাচ্ছেন। সেবায়িত ভদ্রেশ্বর পণ্ডিতের মতে শালিখা ধর্ম মন্দিরের গুরুত্ব প্রচুর। কারণ বলতে গিয়ে তিনি দেখালেন যে, কলকাতা ধর্মতলার ধর্মঠাকুর তো এই মন্দিরে এসে স্থান নিয়েছেন,

যেহেতু নগরীশ্রেষ্ঠ কলকাতা তৈরি হ'লে তাঁর আর সেখানে ঠাঁই হল না। ধর্মতলার ধর্মঠাকুরের নাম হ'ল দর্পনারায়ণ আর শালিখার ধর্মঠাকুরের নাম হ'ল স্বরূপ-নারায়ণ। তৃতীয় ঠাকুরটির নাম জানা যায় না।
একই মন্দিরে যে স্থানচ্যুত ধর্মঠাকুরের আশ্রয়স্থল হয় তাও অবাস্তব নয়। শহর ও লোকালয় গড়ে ওঠার ফলশ্রুতি হিসেবেই তা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছিল। বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে বলছেন ঃ গোবিন্দপুর, নরহরিপুর, জয়ন্তীপুর (মেদিনীপুরে) প্রভৃতি পাড়ায় এখন একত্র কটি মন্দিরের মধ্যে দলবদ্ধ-ভাবে ধর্মঠাকুর বিরাজ করেন। অর্থাৎ বিভিন্ন পাড়া থেকে উদ্বাস্তু ধর্মঠাকুররা ক্রমে আশ্রয় অভাবে একই মন্দিরের মধ্যে এসে বাস করছেন।
ধর্মঠাকুরের সঙ্গে আর একটি নারী দেবতা থাকেন তাঁর নাম হচ্ছে কামিন্যাদেবী। এই মন্দিরে সেই নারী দেবীকেও দেখতে পাওয়া যাবে। গ্রামে গ্রামে কামিন্যা থেকে কালী দেবতা প্রচলিত হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন। কারণ, রাঢ়বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেই কালীর সেবায়িত হচ্ছে ডোম, হাড়ী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ। পূর্বেই বলা হয়েছে, ধর্মঠাকুর রাঢ় দেশের অন্যতম গ্রাম্য দেবতা। যদিও চৈত্রের শিবের গাজন উৎসব ধর্মঠাকুরের গাজনোৎসব এক নয়, তথাপি ধর্মঠাকুরের এই গাজনোৎসব কালক্রমে হিন্দুদের শিবের গাজন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

রাঢ়বঙ্গের আর এক অনার্য দেবতা হচ্ছেন পঞ্চানন ঠাকুর। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত হাওড়া জেলাতেও পঞ্চানন ঠাকুরের নামে একাধিক অঞ্চল নামাঙ্কিত হ'য়ে আছে। মধ্য হাওড়ার পঞ্চাননতলার ঠাকুরের প্রসিদ্ধি বহুজন পরিচিত। বালি শালিখা ঘুষুড়ি অঞ্চলেও পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির আছে। পঞ্চানন ঠাকুর হচ্ছেন সন্তান প্রাপ্তির ঠাকুর। বন্ধ্যানারীরা উক্ত পঞ্চানন ঠাকুরের কাছে মানত ক'রে পুত্র-সন্তান লাভ করেন ব'লেই তাদের নাম রাখা হয় পঞ্চানন, পাঁচু ও পঞ্চু ইত্যাদি। পঞ্চানন ঠাকুরের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সন্তান যাতে পাঁচ বছর পর্যন্ত নীরোগ থাকে। অনেকের মতে এই পঞ্চানন ঠাকুর শিবপুত্র পার্বতীর গর্ভে জন্মাননি। এক নীচ শূদ্রানারীর গর্ভে এঁর জন্ম ব'লে তাঁকে লোকে পুজো ক'রত না। যাতে মর্তে তাঁর পুজো হয় তার জন্য পঞ্চানন ঠাকুরকে দুরারোগ্য ব্যাধির দেবতা ব'লে আখ্যা দেওয়া হল। সেই থেকেই রাঢ়বঙ্গে এই ঠাকুরের পুজো প্রচলিত হয়।

মনসাপুজো বাংলাদেশের প্রায় জেলাতেই হয়। এই পুজোর জৌলুস পূর্ব ও উত্তর বাংলায়ই বেশী। তবে এই পুজো বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যেখানে বর্ষা আগাম হয় সেখানে আষাঢ় মাসে এই পুজো হয়—আর যে অঞ্চলে বিলম্বিত বর্ষা দেখা যায় সেখানে ভাদ্র মাসে মনসার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মনসা আসলে সাপের পুজো। এই সময় বর্ষা আগমনে গর্তে

জল ঢোকার ফলে সাপেরা বেরিয়ে আসে—তার দংশন থেকে রেহাই পাবার জন্যই মা মনসার পুজো। এই আষাঢ়ের আর একটি গ্রামীণ উৎসব হচ্ছে অম্বুবাচী। সাধারণের ধারণা অম্বুবাচীর আম দুধ কলা খেলে নাকি সে বছর সাপে কাটতে পারবে না। অনার্য দেবী মনসার পুজো এদেশে প্রচলন করা নিয়ে যে ইতিহাস আছে তা পাঠকদের অনেকেরই জানা। অনার্য নারী দেবতার পুজো করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় চাঁদ-সওদাগরের যে কি বৈষয়িক ক্ষতি হয়েছিল তাও কারো অজ্ঞাত নয়। পরম শিবভক্ত চাঁদসওদাগর একদা দম্ভে বলেছিলেন—

যে হাতে পুজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পুজিব আমি চ্যাংমুড়ি কানী॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশ্রদ্ধায় হ'লেও তাঁর পুজো পেয়েই এই দেশে মনসা পুজো প্রচলিত হ'ল। শালিখা সীতানাথ বসু লেনস্থ বাগদীপাড়ায় মনসা মন্দির, উত্তর ব্যাটরার মনসাতলা খুবই প্রসিদ্ধ। আর হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে যে অনেক মনসামন্দির ও মনসাতলা আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে রসপুরের গড় চণ্ডীপুরের প্রাচীন মনসা মন্দির খুবই প্রসিদ্ধ। গড়চণ্ডীপুরের মনসামূর্তিটি একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি। এ ধরনের মনসা মূর্তি খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। 'দামোদরের চড়া থেকে প্রাপ্ত সেন আমলের এ মূর্তিটি উচ্চতায় ৯½" এবং প্রস্থে ৫"।[৩] এছাড়া কানুপাট, উদয়নারায়ণপুরের জোকা, বাগনানের দেউলি প্রভৃতি গ্রামে মনসার নিত্যপুজা হয়।

শালিখায় লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে শীতলা মায়ের প্রভাব সর্বাধিক। পল্লী বাংলার পালপার্বণের মধ্যে শীতলার নাম সামান্য উল্লেখ থাকলেও শালিখায় এই পুজোর কোন উল্লেখ কোন গ্রন্থে চোখে পড়েনি। এর কারণ মনে হয়, এই পুজোর গুরুত্ব বাংলাদেশের অন্যত্র তেমন লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উৎসব শালিখার এক উল্লেখযোগ্য উৎসব। প্রাচীনদের মতে শালকিয়ায় অতীতে ধর্মঠাকুরের স্নানযাত্রা উৎসব যে জাঁকজমকের সঙ্গে হ'ত তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা সে উৎসবের রূপ নিয়েছে—যদিও তার ব্যাপকতা ও আড়ম্বর আরও স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বসন্ত রোগের দেবী শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা সমগ্র উত্তর হাওড়ার এক বিশেষ আঞ্চলিক উৎসব। এই উৎসবে যেমন জাতির গণ্ডি নেই তেমনি ধর্মেরও কোন বাধা নিষেধ নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ, চীনা এমন কি মুসলমানেরাও এই দেবীর কৃপালাভের জন্য মিলিত হয়। কলকাতার পরেশনাথের মিছিলের সঙ্গেই এই স্নানযাত্রার আড়ম্বরকে তুলনা করা যেতে পারে।

মাঘী পূর্ণিমার দিনে উত্তর হাওড়ার সমস্ত রাস্তাঘাটে দুপুর থেকে রাত প্রায় ৮টা অবধি যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়েই যায়। বিভিন্ন শীতলা মন্দির থেকে দেবীরা বের হন গঙ্গায় স্নান করার জন্য। শীতলা অনার্য দেবী হ'লেও এই

দেবীর পুজো অতি প্রাচীন। প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারতেও এই পুজোর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বিরাট রাজার রাজ্যে একবার বসন্ত দেখা দিলে বিরাট রাজা পর্যন্ত শীতলা পুজো ক'রে রেহাই পান। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় চৈত্র মাসের রাম নবমীতে শীতলার স্নান হ'লেও একমাত্র শালিখায়ই মাঘী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কবে, কে এই অঞ্চলে এই পুজোর প্রচলন করেছিল তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শোনা যায়, বহুপূর্বে একজন কর্তব্যরত পুলিশ বাঁধাঘাটে মাঘ মাসে পূর্ণিমার গভীর রাতে সাতজন মহিলাকে গঙ্গায় স্নান ক'রতে দেখে। এই দৃশ্যের কথা সে অন্য সকলকে বলায় সে মারা যায়। তারপর থেকেই নাকি এই অঞ্চলে শীতলা মায়ের স্নানযাত্রার প্রচলন।
শীতলা গুটিদানা জনিত (হাম, বসন্ত ইত্যাদি) রোগের দেবী। বসন্ত ঋতুতে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। ভক্তদের বিশ্বাস এই সময়ে দেবী নিজে গঙ্গায় স্নান ক'রে যেমন নিজ দেহ শীতল করেন তেমনি এ দেশের মাটিকেও শীতল করেন। শীতলাদেবী আবার পরিচ্ছন্নতারও দেবী। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে, অপরিচ্ছন্ন বাড়িতেও ঐ রোগ হলে প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হ'য়েই তাঁরা বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে। শীতলার রূপ বর্ণনাতেও বলা হয়েছে ঃ

নমস্তে শীতলাং দেবীং
রাসভস্থাং দিগম্বরীং
মার্জনীকলসোপেতানাং
সূর্পালিঙ্কৃতাং মস্তকাম্।

গর্দভ পিঠে উলঙ্গ শীতলাদেবী হাতে ঝাঁটা ও কলসী এবং মস্তকে কুলো নিয়ে অধিষ্ঠিতা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শালিখার সবকটি শীতলা দেবীই আবক্ষ—কিন্তু অন্যত্র পূর্ণাবয়ব শীতলা দেবীই দেখতে পাওয়া যায়। শীতলা দেবীর মণ্ডে পঞ্চানন ঠাকুর ও জ্বরাসুর দেবতারও পুজো হয়। পঞ্চানন সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। 'শীতলা মঙ্গল কাব্যের মতে জ্বরাসুর হচ্ছে জ্বরের দেবতা। হাম ও বসন্ত ইত্যাদি হবার আগে যে জ্বর হয় এই জ্বরাসুর তারই দেবতা। জ্বরাসুরের রূপ হচ্ছে—তিন মাথা, ছয় চোখ, ছয় হাত কিন্তু তিন পা। এই তিন পায়ের ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া যায়নি। শালকিয়ার যে শীতলা দেবীরা (সাতবোন) আছেন তাঁরা কেউ দারুনির্মিত, কেউ মাটির হাঁড়িতে অঙ্কিত। কেবলমাত্র শালিখা কয়েল বাগানের কয়েলেশ্বরী শীতলা মা হচ্ছেন পাথরের মূর্তি। হরগঞ্জ বাজারের বড়শীতলা মা ও কয়েলেশ্বরী শীতলা মা স্বয়ংভূ দেবী ব'লে জানা যায়। এই শীতলা দেবীরা সাতবোন। এর মধ্যে উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেনের শীতলা মা কখনও স্নানে বের হন না। তাই অন্যান্য বোনেরা তাঁর মন্দিরের কাছ দিয়ে ঘুরে যান।
হিন্দুরা যেমন বসন্তের দেবীকে বলেন শীতলা, বৌদ্ধরা বলেন হারীটি, চীনারা বলেন উষা, আর মুসলমানরা বলেন বুড়াবুবু। শীতলা দেবী অতি অল্পে সন্তুষ্ট হন।

সামানা বাতাসা, এক ঘটি জল ঢেলে রাস্তা ও মন্দির পরিষ্কার করে পুজো দিলেই তিনি ভক্তের ওপর প্রীত থাকেন। ধর্মের ও বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিলেও এই স্নানযাত্রা উৎসব যে বিভিন্ন ধর্মের জাতের এক মিলন তীর্থে পরিণত হয় তাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও প্রাদেশিকতার দুষ্টব্রণের ক্ষত থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে এক নবভারতের মিলন তীর্থ গঠনের কাজে তা সহায়ক হ'য়ে উঠবে।

দশমহাবিদ্যা—পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর পুজোকে কেন্দ্র ক'রেই মেলার সমধিক উৎপত্তি। তেমনি এই অঞ্চলে দশমহাবিদ্যা-পুজোকে কেন্দ্র ক'রে পনেরোদিনব্যাপী পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় শালিখা জটাধারী পার্কে। দুর্গাপুজোর পরে শ্যামা পুজো বা কালীপুজো হয়। দশমহাবিদ্যার পুজো বাংলাদেশে খুব কমই দেখতে পাওয়া যাবে। তবে সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে কোথাও কোথাও এই পুজো হবার সংবাদ সংবাদপত্রেও চোখে পড়বে। কিন্তু শালিখায় যে সময় এই বিরাট পুজোর পরিকল্পনা ও রূপায়ণ হয় তখন হয়তো এই পুজোই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিল। এ. মিত্র. আই. সি. এস. তাঁর Fairs and Festivals in West Bengal গ্রন্থে এই পুজোটির কথা উল্লেখ করেছেন।

১৯৩৬-৩৭ সাল হবে। শালিখিয়া ব্যায়াম সমিতির কয়েকজন যুবক উদ্যোক্তা যথা পূর্ণচন্দ্র মিত্র, উমাপদ চ্যাটার্জী, কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও কালীধন চক্রবর্তী ঠিক করলেন যে সাধারণ কালী পুজোর বদলে দশমহাবিদ্যার পুজো করবেন। এই পুজো উপলক্ষে যে মেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যই ছিল গ্রামীণ কুটীর শিল্পের প্রচার ও প্রসার। দশমহাবিদ্যা পুজোয় মূর্তি রয়েছে কালী, তারা, ষোড়সী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী ও কমলা। এই পুজোর উপাখ্যানটি পৌরাণিক। রাজা দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ ক'রতে চাইলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণু অর্থাৎ সৃষ্টির উপাসক। শৈবতন্ত্রে তাঁর ভীষণ অনীহা কারণ শিব সংহারের প্রতীক। উপরন্তু নিজ কন্যা সতী আবার স্বয়ম্বর প্রথায় শিবকে পতিরূপে বরণ করায় দক্ষ শিবের প্রতি আরও রুষ্ট হয়েছিলেন। তাই তিনি নিজ কন্যা সতীকে পর্যন্ত যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করলেন না। অপরপক্ষে শিবকে ভীষণভাবে অপমানিত করার জন্য যজ্ঞের ঈশান কোণে শিবের আসনে নানাপ্রকার অস্থি, পুরীষ ও মলমূত্রাদি রেখে অপবিত্র করা হল। সতীকে বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যেতে শিব বারণ করলেন। কিন্তু সতীও নাছোড়বান্দা তিনি পিত্রালয়ে যাবেনই। যখন শিব কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না তখন সতী দশটি মূর্তির আকার ধারণ ক'রে মহামায়ার শক্তি মহিমা প্রকাশ করলেন। ঐ দশটি মূর্তি উপরে উল্লিখিত দেবীদের নাম। উক্ত দেবীদের পুজোই হচ্ছে দশমহাবিদ্যার পুজো। এই দেবীদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পতি আছে—কেবল নেই ধূমাবতীর। কথিত আছে, ক্ষণিকের জন্য স্বয়ং শিবকে হত্যা ক'রে ধূমাবতী বৈধব্য দশা লাভ করেন। পরে ধোঁয়া আকারে লোমকূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসেন। সতী পিতৃগৃহে এসে পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেন। সংবাদ পেয়ে শিব বীরভদ্র ও ভূতানুচরদের নিয়ে দক্ষের যজ্ঞালয়ে

হাজির হয়ে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলেন। শিব সতীকে কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করলেন। বিষ্ণু সৃষ্টি রক্ষার্থে সুদর্শন চক্র ঘুরিয়ে সতীর দেহকে একান্ন খণ্ডে ছিন্ন ক'রে দেন। যে যে স্থানে সেই খণ্ডগুলি পড়েছিল ঐ স্থানগুলিই পীঠস্থান ব'লে পরিচিত হ'য়ে আসছে।
মেলার ক'দিন এই জায়গাটি হয়ে ওঠে নানান জাতির, নানা বর্ণের ও ধর্মের এক মিলনক্ষেত্র। কয়েক বছর হয় সেখানে পুজো বন্ধ হয়ে গেছে।

পীরঠাকুর—এই অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, শালিখা হচ্ছে একটি কস্‌মোপলিটন অঞ্চল। এখানে হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের দেবালয় ও শ্মশান এবং গোরস্থান সবই আছে পাশাপাশি। ঘুষুড়ি, বামুনগাছি ও শালিখার চৌরাস্তায়, ক্ষেত্রমিত্র-লেনে, পিলখানায় পীরবাবাদের সমাধি থাকলেও ক্ষেত্রমিত্র লেনেব পীরবাবার স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। আরও আশ্চর্যের কথা যে, এখানে মুসলমান ভক্তের চাইতে হিন্দু ভক্ত নরনারীরই সমাগম বেশী হয়। জাঁকজমকের সঙ্গে আজও এখানে মুসলমান পরবের দিনগুলি পালিত হয়। এতে হিন্দুদের সাহায্য ও সহানুভূতি অত্যন্ত বেশী।
কল্যাণপুরের স্বয়ম্ভূ কালঞ্জয় শিব মন্দির প্রাঙ্গণে একপাশে একটি সান বাঁধানো স্থানে এক পীরঠাকুর আছে। হিন্দু ও মুসলমানদের ভজনাস্থদের সহাবস্থানের এটি একটি উজ্জ্বল নজির। ঐ গ্রামেই 'বুড়ো সাহেব'-এর পীর একটি বিখ্যাত পীরতলা। পীরবাবার আসল নাম সৈয়দ করমাতুল্লাহ। বীরভূম থেকে এখানে আসেন। বর্ধমানের মহারাজা তার অলৌকিক ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে এই জমি পীরের জমিরূপে দান করেন। উলুবেড়িয়ার বাণীবনে জঙ্গল বিলাস পীরের স্থানও খুব বিখ্যাত। আসল নাম ছিল আব্বাসউদ্দিন শাহ। ইসলাম ধর্মপ্রচার করতে আরব থেকে এখানে আসেন। জনশ্রুতি আছে যে পীরের কবরস্থানের কাছে যে বড় দীঘিটি আজও আছে তাতে নাকি তিনি বাঘ ও ছাগলকে এক ঘাটে জল খাওয়াতেন। বহু অলৌকিক ক্ষমতার তিনিও অধিকারী ছিলেন। আর এক বিখ্যাত পীর আছেন গড়চুম্বকে। পীরের নাম শাহ সুজন পীর। সুজন দীঘির ধারের এই পীরের কবর। পীর সাহেব অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।
নারিট গাজিপুর গ্রাম পীর গাজি সাহেবের নামই ঐ গ্রামেরও অনুরূপ নাম হয়েছে।
এই অঞ্চলের আর এক লৌকিক দেবতা হচ্ছেন শনি ঠাকুর। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে এই বারের ঠাকুরের পুজো বেশ ভক্তসমাবেশের মধ্যে হ'তে দেখা যায়। আর আছে প্রতি ঘাটে ঘাটে উৎকল পুরোহিতদের পূজিত জগন্নাথ ঠাকুর।

এতক্ষণ যে সব দেবদেবীর প্রসিদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হল তা নিতান্তই ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা। কিন্তু এবারে যে স্থানটির প্রসিদ্ধি নিয়ে অবতারণা করা হচ্ছে

তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেবস্থান হলেও এর পেছনে আছে রাজনীতির পাশাখেলা। সে খেলায় হারজিতের মীমাংসার পথ হিসেবেই ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। মন্দিরটি হচ্ছে ঘুষুড়ির ভোটবাগানের মঠ। এ মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে যে প্রাচীন ইতিহাস আছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় সকলের ভাল লাগবে।

কুচবিহার বর্তমানে বঙ্গদেশের একটি উত্তর সীমান্তবর্তী জেলা। ডুয়ার্স অঞ্চলে জলপাইগুড়ি হ'তে ২৫-২৬ মাইল দূরে মরাঘাট নামক স্থানের সীমানা নিয়ে ভুটান রাজার সঙ্গে কুচবিহাররাজের বিরোধ চলছিল। ঐ সময়ে কুচবিহার রাজ-পরিবারের মধ্যে পারিবারিক মনোমালিন্য চলার সুযোগই হয়তো ভুটানরাজ ওটিকে নিতে চেয়েছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানরাজ একদল সৈন্য পাঠিয়ে সীমান্ত থেকে কুচবিহারের মহারাজ ধীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ভাইকে বন্দী ক'রে নিয়ে যান। কুচবিহার রাজের নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রিল, মতান্তরে ১৭৭২, ডিসেম্বর।[8] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ফলে ইংরেজরা এক সেনাবাহিনী সেখানে পাঠিয়ে ভুটান-রাজকে পরাজিত ক'রে মহারাজা ও তাঁর ভাইকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই যুদ্ধের পরেও দু'দেশের মধ্যে মরাঘাট ও চামুরচি অঞ্চল নিয়ে সংঘর্ষ চলতেই থাকে। অবশেষে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডেভিড স্কট সীমান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য রাজা রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসু নামে এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে ভুটানে দূতরূপে পাঠালেন।

ভুটানে রামমোহনের দৌত্য-কাজে যাওয়ার বহু আগে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত প্রশ্নে মীমাংসার জন্য ইংরেজ কর্মচারী জর্জ বোগল (Bogle) ও ক্যাপ্টেন টার্ণারকে শান্তি মিশনে তিব্বতে পাঠান। এই মিশন দুটির কথা ১৮৯০ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের প্রথম ভাগের প্রথম সংখ্যায় এবং বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেট, হাওড়ার ১৯০৯ সালের অষ্টদশ সংখ্যায় উল্লেখ আছে।

ভুটানের পক্ষ থেকে তিব্বতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ টিসু লামাকে ঠিক করা হয়েছিল মধ্যস্থতায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। টিসু লামা আবার ভারতের পুরাণ গিরি মারফৎ ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসকে এক বিশেষ পত্র দেন। গিরি মশায় ভারতীয় হ'লেও তিনি তিব্বতে ভ্রমণ করতে গিয়ে টিসু লামার বিশেষ আস্থাভাজন হ'য়ে ওঠেন। পুরাণ গিরি মারফৎ ঐ পত্র পেয়েই বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস মিঃ বোগল ও টার্ণারকে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন। পুরাণ গিরি এই দুটি মিশনকে তিব্বতের টিসু লামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। সেই সময় টিসু লামা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, ভাগীরথীর তীরে তিব্বতী সাধুদের সাধনভজনের জন্য বেশ একখণ্ড জমি ইংরেজ সরকার দান করেন এবং মন্দিরটি যেন বঙ্গদেশের মন্দিরের মতই তৈরি হয়। ইংরেজ বড়লাট টিসুলামার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে ঐতিহাসিক ভোটবাগান মঠ। ভোট কথার অর্থ হচ্ছে

তিব্বত। তিব্বতী সাধুদের জন্য এই মঠ তৈরি হয়েছে ব'লে এর নাম ভোটবাগান মঠ।

দেড়শো বিঘার ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল ভোটবাগান মঠ। ১৭৭৮ সালে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস টিসু লামার ইচ্ছানুসারে পুরাণ গিরিকে ঘুষুড়িতে একশ' বিঘা জমি দান করলেন। এই জমিতে মন্দির ও উদ্যান রচনা করার প্রস্তাব ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির লেখক বিনয় ঘোষ বলছেন: ১৫০ বিঘা জমির উপর ভোটবাগান।...মৌজা ঘুষুড়ি পরগণা পাইকানে মঠ মন্দির ও উদ্যান রচনার জন্য জমি দান করা হ'ল। বাকি ৫০ বিঘা মহারাজা নবকৃষ্ণ (শোভাবাজার), রাজচন্দ্র রায় (আন্দুল রাজবংশের) জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে উল্লেখ আছে। চারখানি সনদে এই জমি দান করা হয়। ৩ ও ৪ নং সনদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীল আছে দেওয়ান হিসাবে। সঙ্গে আছে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বাক্ষর।

ভোটবাগানের মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধমন্দির হ'লেও এর গঠন পদ্ধতি হিন্দু শিব-মন্দিরের অনুরূপ। মঠের মধ্যে আছে আর্য তারা, মহাকাল ভৈরব ও পদ্মপাণি প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবী। ধাতুনির্মিত মহাকালের মূর্তিটি স্বয়ং টিসু লামা তিব্বত থেকে পাঠিয়েছিলেন। দুঃখের কথা ১৭৯৩ সালে মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা পুরাণ গিরি একদল ডাকাতের হাতে ঐ মন্দিরেই নিহত হন। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই এর পরিচালনভার ছিল দশনামীসম্প্রদায়ভুক্ত শঙ্করাচার্যের গিরি সম্প্রদায়ের সাধুদের হাতে। তারকেশ্বরের সতীশ গিরির দেহরক্ষার পর থেকে ঐ মঠের ভার দণ্ডী মহারাজের হাতে আসে।

এই মঠ নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হ'য়েছে। আজ আর মঠের অধীনে অত জমি নেই। সবই প্রায় বেহাত হ'য়ে গেছে। মন্দিরের অবস্থাও সঙ্গীন। অর্থাভাবে মন্দিরের সংস্কার আর তেমন হয় না। নেহাৎ ইতিহাসের স্বাক্ষর হিসেবেই আজ ভোটবাগান মঠ রয়েছে। তবে এই মঠ স্থাপনে যে নেহাত ধর্মভাবই ছিল তা নয়। বরং এর পেছনে রাজনৈতিক কাজ হাসিল করার জন্যই ধর্মের ছদ্মবেশ পরা হয়েছিল। সেটা উল্লেখ না করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। তাই সংক্ষেপেই উল্লিখিত হল।

আগেই বলা হয়েছে, রাজা রামমোহন রায় ও কৃষ্ণকান্ত বসুকে ভুটান রাজার কাছে দৌত্য কাজে পাঠানো হয়েছিল। শীতকালে ভীষণ ঠাণ্ডা সহ্য ক'রেও ভুটানের রাজধানী পুনাখে তাঁদের উপস্থিত হ'তে হয়। রামমোহন অবশ্য কৃষ্ণকান্তের আগেই ১৮১৫ সালের শেষাশেষি আবার রংপুরে ফিরে এসে জেলা ম্যাজিস্টেট মিঃ স্কটকে বিস্তারিত সংবাদ জানান। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে মিঃ বোগল ও টার্ণারের মিশন যাওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ রামমোহনকে কেন ভুটানে পাঠিয়েছিলেন। সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসাই যে এর উদ্দেশ্য ছিল তা নয়—আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

লেখা 'রামমোহন রায়' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,—তখন ইংরেজ সরকারের সহিত নেপালের যুদ্ধ চলিতেছিল। ভোটরাজ নেপালের সহিত যোগ দিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ সংবাদ ইংরেজের কানে পৌঁছিয়াছিল। এ অবস্থায় গোপনে ভুটান অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার সন্ধান লওয়া এবং কৌশলে ভুটানরাজ দেবরাজকে নিরস্ত করাই রামমোহন দৌত্যের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে জেলায় চার্চ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটু আলোচনা না করলে হয়তো ধর্মের সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট উদাহরণের অঙ্গহানি ঘটবে। একথা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, ইউরোপীয় বণিকগণ এদেশে ব্যবসা করার জন্য এলেও সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী সাহেবরাও পেছিয়ে ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাদ্রীরাও জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য ক'রে এদেশে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন। সারা দেশের মত এ জেলাতেও চার্চ স্থাপনের প্রতিযোগিতা শুরু হয় এ্যাংলিকান ও ক্যাথলিকদের মধ্যে। সম্প্রতি হাওড়ায় ক্যাথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠার দেড়শ বছরের উৎসব পালিত হয়েছে। তাতে Howrah Parish (1831-1981) নামে একটি পুস্তিকা আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। সেখানে St. Aloysius Church-কেই হাওড়ার প্রথম চার্চ ব'লে দাবী করা হয়েছে। এই চার্চটি ১৮৩১ সালে হাওড়া স্টেশন এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই চার্চটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ফাদার পল. ডি. গ্রাডোলি (Paul Do Gradoli)। কিন্তু এই ক্যাথলিক চার্চের আগেই হাওড়ায় প্রথম চার্চ প্রতিষ্ঠা হয়। আর সেটিও হয়েছিল বর্তমান হাওড়া পুল এলাকায় ১৮২১ সালে মিঃ স্ট্যাথাম নামে জনৈক ব্যাপটিষ্ট মিশনারীর উদ্যোগে। সে চার্চটিও শালকিয়ার সীমানায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সেই চার্চটি স্থানান্তরিত হ'য়ে আসে ডবসন রোড (বর্তমান আবুল কালাম আজাদ রোড) ও কিংস রোডের মুখে। আজও সে নিজ অবস্থিতি এখানে সগর্বে ঘোষণা করছে। হাওড়া জেলার পুরা-কীর্তির লেখক তারাপদ সাঁতরা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—হাওড়া পৌর এলাকায় প্রাচীনতম গির্জাটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কুলেন প্লেসে (বর্তমান মুখরাম কানোড়িয়া রোড) প্রতিষ্ঠা করেন জনৈক ব্যাপটিষ্ট রেসিডেন্ট মিশনারী মিঃ স্ট্যাথাম। পরবর্তী কালে হাওড়ার রেললাইন স্থাপনের স্থান সংকুলানের জন্য গির্জাটিকে ডবসন লেন (রোড হবে) ও কিংস লেনের (রোড হবে) সংযোগস্থলে স্থানান্তরিত ক'রে ১৮৬৫ খ্রীঃ গথিক স্থাপত্য অনুসরণে একটি নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয়। উক্ত পুস্তকে তিনি আরও লিখছেন— "এছাড়া কলকাতার ধনী পর্তুগীজদের অর্থানুকুল্যে এবং রেভারেন্ড ফাদার পল ডি গ্রাডোলির উদ্যোগে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮৩২ খ্রীঃ কুলেন প্লেসে 'আয়োনিক শৈলীতে' আরও একটি বৃহদায়তন রোমান ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয়।'' সম্প্রতি হাওড়ায় ক্যাথলিক চার্চের দেড়'শ বছর উপলক্ষ্যে Howrah Parish (1831-1981) নামে যে বুকলেট St. Aloysius Church প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে উক্ত চার্চটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩১ সালে (১৮৩২

নয়) ১০ই সেপ্টেম্বর এবং এর উদ্বোধন হয় ১৮৩৪ সালের ১০ই এপ্রিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ফাদার পল ডি গ্রাডোলিই। তিনি একজন ইটালিয়ান মিশনারী ছিলেন। এই চার্চটি তৈরির পিছনেও একটি ইতিহাস আছে। ফিলিপিন নাবিকরা এদেশে আসবার সময় সামুদ্রিক ঝড়ে পড়লে বিপদ থেকে রক্ষা পেলে তারা চার্চ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিল। তাই সত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে ১২৭ ফিট লম্বা ও ৬৮ ফিট চওড়া এই চার্চটি তৈরী হয়।[৫]

এছাড়া উল্লেখযোগ্য লৌকিক দেবদেবী হচ্ছেন আমতার মেলাইচণ্ডী, মেল্লকের মদন গোপাল জীউ, সুলতানপুরের খটিয়াল শিব, খড়িয়পের খড়েগশ্বর শিব, জয়পুরের মতিলাল ধর্মরাজ ও জলেশ্বরের শিবমন্দির। গড়ভবানীপুরের বিখ্যাত মণিনাথ শিব, ঝিকিরার শ্যামসুন্দর জীউ ও রাউতাড়া গ্রামের মানিক পীরের দরগা, রামরাজাতলার রামঠাকুর, মধ্য হাওড়ার হাজার হাত কালীতলা এবং ওলাবিবিতলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভক্তজনের বহুল সমাগম ঘটে এইসব দেবালয়গুলিতে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে হাওড়ায় মাটিতে পদচরণা করেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রী সারদা মা, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, দীন দুঃখী লালবাবা ও বিখ্যাত তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে হলেও তিনি বালির রাস্তায় হাঁটতেন, ভক্তের গৃহে ঈশ্বর আলোচনায় রত থাকতেন আবার কখনও কল্যাণেশ্বর তলায় শিবের মাথায় জলও দিতেন। রামকৃষ্ণ পুঁথিতে লেখা হয়েছে—

(বালি) হরিসভা দেখিবারে মহা উল্লাসভারি।
কোথা বালি, কোথা কালাচাঁদ মুখুজ্যে বাড়ি।

আবার 'সাধু প্রসঙ্গে' স্বামী বিজ্ঞানানন্দ লিখেছেন—(কল্যাণেশ্বর) মন্দিরে একবার শিবের মাথায় ফুল চাপিয়ে হৃদয়কে ইসারা করিলেন—দ্যাখ শিবের মাথা নড়ছে—যেই বলা অমনি ফুল পড়ে গেল—তারপরই সমাহিত।

ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য নরেন্দ্রনাথও বেলুড় মঠ তৈরি করার অনেক আগে তাঁর বন্ধু কালিপ্রসন্নের সঙ্গে বারেন্দ্র পাড়ায় শশী সান্যালের বাড়িতে প্রায়ই ধর্মালোচনায় রত থাকতেন। এই কালি প্রসন্নই কালে স্বামী অভেদানন্দ ও শশী সান্যাল সাধুজগতে স্বামী যোগাত্রয়ানন্দ নামে সমধিক পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ সালে গঙ্গাবক্ষে নৌকো করে এসে রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে ঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। সেই থেকে ঐ বাড়িতে নিত্য পুজো হয়ে আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তরা যে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করেন তা স্বামীজী রচনা করেন সেদিন ঐ বাড়িতে পুজোর সময়। মন্ত্রটি হচ্ছে—

স্থাপকায়চ ধর্মস্য
সর্বধর্ম স্বরূপিণে
অবতার বরিষ্ঠায়
রামকৃষ্ণায়তে নমঃ।

বেলুড়ে স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় আজ পৃথিবীর ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে এক দর্শনীয় স্থান রূপে চিহ্নিত হয়েছে। সে ইতিহাস বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রীশ্রীসারদা মায়ের স্মৃতির সঙ্গে হাওড়া বিশেষ করে বেলুড়ের নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগান বাড়ির ইতিহাসও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। নরেন্দ্রনাথের বেলুড়ে স্থান নির্বাচনে সারদা মা সর্বদাই তাঁর রুচির গুণগান করতেন। বেলুড়ের সংলগ্ন এলাকা ঘুষুড়ির সঙ্গে সারদা মায়ের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেটি এখানে উল্লেখ করার মত। স্বামীজী ভারত পরিভ্রমণে বের হবার আগে মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে ঘুষুড়ির এক বাড়িতে সারদামণির কাছে আসেন। ঘটনাটি ছিল এই রকম। ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ। ঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বসু দেহ রেখেছেন। মাকে তখন ঘুষুড়ির এক বাড়িতে এসে থাকতে হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে লিখছেন—'জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমাকে বেলুড়ের ঘুষুড়ি অঞ্চলে শ্মশানের কাছে একখানি ভাড়া বাড়িতে আনিয়া রাখা হয়। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে বিবেকানন্দ স্বামী পরিব্রাজকের ভূমিকায় ভারত ভ্রমণের আগে শ্রীমায়ের অনুমতি লইবার জন্য ঐ বাড়িতে আসিয়া ছিলেন।' সুতরাং বেলুড়মঠ যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও সারদামণির স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যস্থানে পরিণত হয়েছে তেমনি ঘুষুড়ির ঐ বাড়িটিও শ্রীমা ও স্বামীজীর পদধূলিতে পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়ে আছে।

বেলুড় মঠের পাশেই রয়েছে গঙ্গাতীরে উত্তর প্রদেশীয় উদাসী নামকপন্থী দীন দুঃখী লালবাবার আশ্রম। সাধুজনের সাধনার স্থল এটি।
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বাবার পদধূলিও শালিখার বাবুডাঙ্গা অঞ্চলে পড়েছিল। তারই নামে জটাধারী পার্কের পেছনে সৎসঙ্গের একটি আশ্রম আজও ভক্তজনের আশ্রয়স্থল হয়ে আছে। যোগীশ্রেষ্ঠ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শ্বশুরবাড়ি ছিল এই জেলার বালিতে। তন্ত্রাচার্য কেশবচন্দ্র বিদ্যাধরের জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে হলেও তিনি শিবপুরে এসে শেষ জীবনে আশ্রম করেছিলেন। তাঁরই আয়োজিত শালকিয়া চালপট্টিঘাটে পঞ্চদুর্গার পুজোতে তন্ত্রসাধক জাষ্টিস উডরফ সাহেবও এখানে এসে পুজোয় যোগ দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম আচার্য ও প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন বালিতে বিবাহ করে-ছিলেন। সেই সুবাদে হাওড়াতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। হাওড়াতে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন আমতা জয়পুরের দানবীর ব্যবসায়ী ফকির দাস রায়। ১৮৮০ খ্রীঃ আমতা 'অমরাগড়ি' গ্রামে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের একটি উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের স্থাপত্য কলকাতার কেশব সেন স্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের অনুরূপ। তাই বলি হাওড়া জেলা হচ্ছে মন্দির, মসজিদ, গির্জাসহ

নানা লোক দেবতা ও পীর সাহেবদের সমাধিতে পূর্ণ। এমন ধর্মের সহাবস্থান অন্যত্র কদাচিৎ দেখা যাবে।

১. ধর্মঠাকুরের স্বরূপ—ডঃ সুকুমার সেন।
২. পল্লী বাংলার পাল-পার্বণ—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রবিবাসর ১৯৬৯ সন।
৩. হাওড়া জেলা পুরাকীর্তি—তারাপদ সাঁতরা।
৪. চা শিল্পে বাঙ্গালীর উত্থান ও পতন—মানস দাশগুপ্ত 'দেশ' ২১শে জানুঃ ১৯৮০।
৫. Howrah Parish (1831—1981) Booklet.